সখা

প্রমদাচরণ সেন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

শ্রীঅন্ন—

প্রক।

THE CHILD IS THE FATHER

কলিকাতা

৩৩নং মুসলমানপাড়া লেন, "সখা"-যন্ত্রে, শ্রীললিতমোহন দাস কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

সূচী-পত্র।

সূচীপত্র।

সখা

প্রমদাচরণ সেন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

শ্রীঅন্ন—

প্রক।

THE CHILD IS THE FATHER

কলিকাতা
৩৩নং মুসলমানপাড়া লেন, "সখা"-যন্ত্রে, শ্রীললিতমোহন দাস কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

সূচী-পত্র।

সূচীপত্র।

সখা
নবম ভাগ। ১ম সংখ্যা।

জানুয়ারী, ১৮৯১।

নবমবর্ষ।

সখা বিধাতার কৃপায় অষ্টমবর্ষ অতিক্রম করিয়া নবমবর্ষে পা দিয়াছে। আমাদের সখা পিতৃহীন, সকলেই জানেন। এই পিতৃহীন বালককে ৮ বৎসর কাল পর্য্যন্ত যিনি নানা প্রকার বিঘ্ন বাধার মধ্যে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, আমরা সর্ব্বাগ্রে সেই করুণাময় পুরুষকে সর্ব্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা প্রদান করি।

পিতা মাতারা ছেলে মেয়েদের জন্মতিথি উপলক্ষে কত আনন্দ করেন, প্রতিবেশী ও হিতাকাঙ্ক্ষীদিগকে এই শুভানুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করেন; তাঁহারা আসিয়া সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করেন। 'সখা' গরিবের ছেলে, তাহাতে আবার পিতৃহীন; আমাদের মত অযোগ্য লোকের হাতে ইহার প্রতিপালনের গুরু-ভার। পিতা মাতা না হইলে কি সন্তানের লালন পালন অন্যের দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়? সখাকে বোধ হয় অনেক সময় আমরা শরীর-পোষণোপযোগী অন্নপানই দিতে পারি নাই। তথাপি যাঁহারা ইহার শরীরের ধূলি ময়লা ঝাড়িয়া ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা নববর্ষের প্রথমে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই।

আজ সেই উৎসাহবীর প্রমদাচরণের কথা বার বার মনে পড়িতেছে। তিনি আজ কোথায়? সখার জন্য তিনি অনাহারে অনিদ্রায় দেহপাত করিয়াছেন। প্রমদাচরণ, তোমার আড়াই বৎসরের সখা আজ আট বৎসর অতিক্রম করিয়া নবমবর্ষে পা দিয়াছে। বেঁচে থাকৃলে আজ তোমার না জানি কতই আনন্দ হইত। তুমি স্বর্গে গিয়াছ, স্বর্গ হইতে আশীর্ব্বাদ কর, তোমার সখা দীর্ঘজীবী হইয়া নিজ উদ্দেশ্য সাধনে যেন সর্ব্বদা রত থাকিতে পারে।

সখার জন্য অনেকে সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য হইয়া প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আজ আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। যদি কখন অজ্ঞাতসারে অনবধানতাবশতঃ কাহারও নিকট আমাদের কোন ক্রটী হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের স্বাভাবিক ঔদার্য্য গুণে, আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া সখার প্রতি স্নেহ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বড়ই বাধিত হইব।

সখা বালক বালিকাদিগের পত্রিকা। তাই বালক বালিকাদিগের উপযোগী বিষয়ের অবতারণা এবং আলোচনার জন্য কতকটা স্থান দেওয়া যাইবে। সখাতে কোন বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য কেহ প্রশ্ন বা প্রবন্ধ পাঠাইলে, প্রকাশযোগ্য হইলে আমরা আদরের সহিত তাহা প্রকাশ করিব।

নববর্ষ।

এ নব বরষে বোন্ কি সুখ আবার,
পেয়েছি আমরা দেখা নূতন সখার।
এস আজি ভাই-বোনে, খেলি এ সখার সনে,
হৃদয়ের ভালবাসা দিই উপহার।

আমাদের সনে দেখা করিবার তরে সখা
মাসে মাসে আসে নিয়ে কত সমাচার ;
এ সুখ স্বপন প্রায় ঘটে কার করুণায়,
ভেবে কি আমরা তাহা দেখি একবার ?

এ সখার সখা যিনি, সকলের সখা তিনি,
এস তাঁরে প্রীতি-ভরে করি নমস্কার ;
তাঁহার করুণা পেয়ে, তাঁহারি মহিমা গেয়ে,
সুখে যেন নববর্ষ কাটে সবাকার।

বিবিধ।

স্ত্রী-সৈন্য।—অষ্ট্রিয়াতে একদল স্ত্রীলোক সৈন্য-দলে প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ব্রহ্ম-রাজ থিবোরও কতকগুলি স্ত্রী-সৈন্য ছিল।

* *
*

অদ্ভুত ব্যোমজান।—সখার পাঠক পাঠিকাগণ ব্যোমজান সম্বন্ধে অনেক কথা সখায় পড়িয়াছেন। দুই জন ফরাসী ব্যোমজানে চড়িয়া উত্তর কেন্দ্র পার হইবেন, মনস্থ করিয়াছেন। ইহার পরিধি ৯০ ফিট। এই বৃহৎ ব্যোমজানের সঙ্গে ছোট ছোট ব্যোমজান থাকিবে; আবশুক হইলে সেই ছোট ছোট ব্যোমজান দ্বারা সংবাদ পাঠান হইবে।

* *
*

মার্কিন ইফেল প্রাসাদ।—ফ্রান্সের ইফেল প্রাসাদের বিষয় পূর্ব্বেই আমরা সখায় প্রকাশ করিয়াছি। আমেরিকার ওয়াসিংটন নগরে আর এক ইফেল প্রাসাদ প্রস্তুত হইতেছে। ইহা পেরি নগরের ইফেল প্রাসাদ অপেক্ষা ৫০০ শত ফুট অধিক উচ্চ হইবে। এই প্রাসাদে ২৫০০০ লোকের বসিবার স্থান থাকিবে।

* *
*

পক্ষীর বাসায় মানুষ।—ইংলণ্ডের রাজা অ্যাল-ফ্রেড্ বড়ই শিকার প্রিয় ছিলেন। একদা পশু শিকারার্থ বনে প্রবেশ করিয়াছেন, এমন সময় শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। রাজা সঙ্গীয় লোকদের মধ্যে একজনকে কারণ অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। কোন বৃক্ষ হইতে শব্দ আসি-তেছে শুনিতে পাইয়া সে বৃক্ষে আরোহণ করিল, এবং তথায় একটী ঈগল পক্ষীর বাসাতে সুন্দর একটী শিশু সন্তান দেখিয়া তাহাকে নামাইয়া আনিল। রাজা তাহাকে নিজ অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে সে অতিশয় যত্নসহকারে লালিত পালিত হইয়াছিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার পিতামাতার কোন খোঁজ খবর পাওয়া গেল না। এই শিশু বড় হইয়া সংসারে অনেক সৎকাজ করিয়া-ছিল।

* *
*

হস্তীর আশ্চর্য্য প্রতিহিংসা।—ফ্রান্স দেশীয় জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমাদের ভারতবর্ষে বাস করিতেন। তাঁহার একটী পোষা হাতী ছিল। ভদ্র লোকটীর আহার হইলে এই হাতীটী প্রত্যহই আসিয়া খাদ্য বস্তু চাহিত। এক দিন এই ভদ্র-লোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল। তাঁহার কয়েকটী বন্ধু খাইতেছেন, এমন সময় হাতীটী আসিয়া খাদ্যের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তিনি কিছুই দিলেন না, তথাপি সে দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি একটু বিরক্ত হইয়া হাতের কাঁটাটী লইয়া হস্তীর শুঁড়ের উপর ধীরে একটী আঘাত করিলেন। এই আঘাত পাইয়া হস্তী মহাশয় সম্মুখের বাগানে প্রবেশ করি-লেন। বাগানের ভিতর একটী ডালে পীপিলিকার বাসা ছিল, হস্তী মহাশয় পীপিলিকার বাসা সমেত সেই ডালগাছা ভাঙ্গিয়া আনিয়া প্রভুর মস্তকে ঝাড়িয়া দিলেন। পীপিলিকার দংশনে অস্থির হইয়া প্রভু তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া স্নান করিয়া সুস্থ হইলেন।

ভাইব'ন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুখ দুঃখ।

বামনদাস চক্রবর্ত্তী একজন শিক্ষিত লোক; কলিকাতার কোন প্রধান স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। পরিবারে অধিক লোক ছিল না;—স্ত্রী, একটী পুত্র, এবং একটী কন্যা। পুত্রের নাম নেপাল, কন্যার নাম মুরলা। শিক্ষকতা করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তদ্দ্বারা কোনমতে বামনদাস বাবু পরিবার প্রতিপালন করিতেন। বিদ্যায় তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, এবং স্ত্রী-শিক্ষার তিনি অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। পুত্র কন্যার ছেলেবেলা হইতেই যাহাতে সুন্দররূপ শিক্ষা লাভ হয়, তদ্বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা যত্নবান ছিলেন। মুরলা প্রথম সন্তান বলিয়া বামনদাস বাবু তাহাকে অধিক স্নেহ ও আদর করিতেন। অল্প বয়স হইতে মুরলাকে লেখাপড়া ও শিল্পকার্য্য ইত্যাদি সুন্দররূপ শিক্ষা করাইয়াছিলেন। মুরলার বিবাহের বয়স হইলে উপযুক্ত পাত্রের সহিত তাহার বিবাহ দেন। ঘরে শ্বশুর শাশুড়ী, দেবর ননদ আর কেহই ছিল না; কেবল পাত্রের গুণ, স্বভাব চরিত্র এবং উপার্জ্জনের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই বামনদাসবাবু কন্যার বিবাহ দেন। মনে করিলেন, সৎপাত্রের হস্তে মুরলাকে দিয়াছেন, পতিসোহাগিনী হইয়া জীবন কাটাইতে পারিবে। লোকে যাহা আশা করে, তাহাই যদি সফল হইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে দুঃখ কষ্ট থাকিত না। মুরলা পতিগৃহে গিয়া পতির সোহাগে মহাসুখে কাল কাটাইতেছে। বিবাহের পর এখনও এক বৎসর ভালরূপে পার হয় নাই; ইহার মধ্যেই যমের চক্ষে মুরলার এত সুখ সহ্য হইল না। হঠাৎ হতভাগিনী মুরলা বিধবা হইল। সেই স্বর্ণপ্রতিমা মলিন হইয়া গেল।

মুরলা শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী। রামায়ণ মহাভারতে সে অনেক সতী সাধ্বীর কথা পাঠ করিয়াছিল; এবং ছেলেবেলা হইতেই সেই সমস্ত পুণ্যকথা তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া আসিয়াছিল। আজ তাহার এই সর্ব্বনাশের সময় প্রাতঃস্মরণীয়া সেই সতী লক্ষ্মীদের পতিভক্তি ও পবিত্র জীবন মনে করিয়া সমস্ত শোক দুঃখ স্থিরচিত্তে হৃদয়ে বহন করিল। নিজে অধীর ও অস্থির না হইয়া পিতা-মাতাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। মুরলা পিতামাতার বড়ই আদরের ছিল। সুতরাং কন্যার এই বিষম বৈধব্য-শেল বামনদাসবাবু ও তাঁহার পত্নীর বুকে বড়ই বাজিল। মুরলার মাতা শোকে দুঃখে শয্যাগতা হইলেন। বামনদাসবাবুও বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। মুরলার মলিন বিষণ্ণ মুখখানি যখনই তাহার নয়নপথে পড়িত, তাঁহার বুক শতধা বিদীর্ণ হইত। কি ভাবিয়াছিলেন, কি হইল। তাঁহার সোণার প্রতিমার শেষে এই দশা হইল। পতিগৃহে মুরলাকে দেখিবার আর কেহই ছিল না; সুতরাং পিত্রালয়েই তাহার আশ্রয় নিতে হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আঁধারে আলো।

বিপদ যখন আসে, তখন চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া দেখা দেয়। মুরলার মাতা ক্রমশঃই অধিক শয্যা-

লগ্না হইতে লাগিলেন। এখন আর শুধু শোকে দুঃখে শয্যাগতা নহেন,—বিষম ব্যাধিতে ধরিয়াছে। রোগ সহজ নহে, ক্ষয়কাসিতে দিন দিনই তাহার আয়ু ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। এমন সময় বিপদের উপর বিপদ উপস্থিত হইল। হৃদ্‌রোগে বামনদাস বাবু অকস্মাৎ প্রাণ ত্যাগ করিলেন। পিতার মৃত্যুতে মুরলা অকূল সমুদ্রে পড়িল। মাতা মৃত্যু-শয্যায়, বালক ভ্রাতা কাঁদিয়া আকুল; একাকিনী কোন্ দিক্ দেখিবে? সে নিজে এখন শোকদুঃখে অধীরা হইয়া পড়িলে যে কোনমতে চলে না, তাহা বেশ বুঝিয়াছিল; সুতরাং নিজে পাষাণে বুক বান্ধিল এবং নেপালকে মাতার ক্রোড়ে দিয়া অভাগিনীকে নানারূপ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। "মা, অধীর হইও না; তোমার শরীরের এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এরূপ অস্থির হইলে তোমাকে কিছুতেই বাঁচাইতে পারিব না। তুমিও ছেড়ে গেলে নেপালকে নিয়ে আমি কোথায় দাঁড়া-ইব? মা স্থির হও, ধৈর্য্যাবলম্বন কর। সকলই সেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা। আইস, আমরা তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া আমাদের এই দুর্দ্দিনে স্থির হইতে চেষ্টা করি।" মুরলার এই কথায় তাহার মাতা আরও অধিক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"মা, আমাকে বাঁচাইবার চেষ্টা বৃথা। আমার দিন ফুরাইয়াছে। দেখিয়াও কি কিছু বুঝিতে পারিতেছ না? আমি গেলে তোমরা কোথায় দাঁড়াইবে, আমারও সেই চিন্তা হইয়াছে। তুমি এ বয়সে শিশু ভাইটীকে নিয়া কোথায় স্থান লইবে? কে তোমাদিগকে রক্ষা করিবে? ভগবান ভিন্ন এখন আমাদের কোন সহায় নাই। তাঁহার হস্তেই তোমাদিগকে সঁপিয়া যাইতেছি। তিনি যাহা করেন। পূর্ব্ব জন্মে যেন কত পাপ করিয়াছিলাম, তাই আজ আমার এ দুর্দ্দশা। মুরলা মা, নেপাল যেন না খাইয়া মরে না। তুমি বুদ্ধি-মতী, তোমাকে অধিক আর কি বলিব। ভগবানকে ডাক, তিনিই রক্ষা করিবেন।" মুরলা নানারূপ প্রবোধ দানে মাতাকে কতকটা সুস্থির করিলেন এবং বুঝাইয়া সুঝাইয়া নেপালকেও শান্ত করিলেন।

বামনদাস বাবু টাকাকড়ি কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার যে উপার্জ্জন ছিল, তদ্দ্বারা কোন মতে সংসার চলিত। মুরলার স্বামী অল্প কিছু টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন; তাহা ছাড়া তাঁহার যে গহনা ছিল, ক্রমে ক্রমে বিক্রয় করিলে, তাহার মূল্যে কতক দিন যাইবে, এই একমাত্র আশা। যথা সময়ে মুরলা নেপালকে দিয়া পিতার শ্রাদ্ধশান্তি করাইল। নেপাল স্কুলে পড়িত; তাহার লেখা-পড়া শিক্ষার যাহাতে কোন ব্যাঘাত না জন্মে, তৎ-পক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে লাগিল। হাতে যে কিছু টাকা ছিল, তাহাতে অধিক দিন যাইবে না জনিত; সুতরাং মাতাকে শুশ্রূষাদি করিয়া যে সময় পাইত, তাহা নানা প্রকার শিল্পকার্য্যাদিতে ব্যয় করিত। প্রতিদিনই প্রায় কিছু না কিছু শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া নেপালকে দিয়া কোন দোকানে পাঠাইয়া দিত। অল্প মূল্যে পাওয়াতে দোকানীরা সেই সমস্ত জিনিষ আদর করিয়া রাখিত এবং এই সামান্য আয় হইতে মুরলার বিশেষ আনু-কূল্য হইত। দুঃখের দিন অল্পে অল্পে এইভাবে কোন মতে কাটিতে লাগিল। মুরলার মাতাও অল্পে অল্পে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নেপাল বালক হইলেও তাহার মার যে দিন ফুরাই-য়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। সম্মুখে কাঁদিলে মাতা পাছে আরও অধিক কষ্ট পান, এই আশঙ্কায় অন্তরালে দিদির কণ্ঠ লগ্ন হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিত। মুরলা প্রাণাধিক ভ্রাতাকে নানা রূপে প্রবোধ দিত। রামায়ণ মহাভারতের কত

মহাত্মার কত পুণ্য কথা শুনাইত; বিপদে আপদে শোকে দুঃখে কিরূপে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হয়, ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস থাকিলে এবং তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে পারিলে কিরূপে সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করা যায়, উপদেশ-চ্ছলে এইরূপ পৌরাণিক কত গল্প শুনাইত। নেপাল সেই সমস্ত পুণ্য কথা শুনিতে শুনিতে হৃদয়ে বল পাইত এবং শান্ত সুস্থির হইয়া দিদির কষ্ট লাঘবের চেষ্টা পাইত। নেপাল জানিত তাহার অভাগিনী দিদির কত গুণ কত ধৈর্য্য;—এবং দিদির অবিচ্ছিন্ন চেষ্টায়ই যে এখন পর্য্যন্ত তাহাদের পথে ভিক্ষা করিতে বাহির হইতে হয় নাই, তাহাও মনে মনে বেশ বুঝিয়াছিল। এই সব কারণে নেপাল দিদির অজ্ঞাবহ দাস ছিল; দিদি যাহা বলিতেন তাহাই করিত; যাহা শিখাইতেন তাহাই শিখিত। আজ এই দুর্দ্দিনে মুরলার এটী কম সুখ নহে। ঘোর আঁধারে সে এই একমাত্র আলো দেখিতে ছিল।

ক্রমশঃ।

মহামতি গ্লাড্‌ষ্টোনের বাল্য-প্রতিভা।

মহামতি গ্লাডষ্টোনের নাম তোমাদের অনেকেই হয়ত জান। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের রাজ-নীতিবিদ্‌দের মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ,—উদারনৈতিক দলের নেতা। তাঁহার অসাধারণ শক্তি ও গুণ। একাধারে এতগুণ প্রায় দেখা যায় না। তিনি যেমন সুবক্তা, তেমনি সুলেখক; যেমন পণ্ডিত, তেমনি ধার্ম্মিক। মাতৃভাষা ইংরাজীতে যেমন তিনি সুপণ্ডিত, গ্রীক্ লাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষাতেও তাঁহার তেমনি প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি। এক কথায় বলিতে হইলে, এই বলিতে হয় যে, বর্ত্তমান যুগে তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী লোক। তিনি যে এত বড় লোক হইবেন, তাঁহার বাল্যকালেই তাহার অভ্যাস পাওয়া গিয়াছিল। সাধারণ কথায় বলে, কোন্ গাছটা কিরূপ হবে, অঙ্কুরেই তা বোঝা যায়। মানুষের সম্বন্ধেও তাই। বাল্যকালেই প্রতিভাশালী লোকদের প্রতিভার জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে। প্রায় প্রত্যেক বড় লোকের জীবনেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মহামতি গ্লাডষ্টোন সাহেবের বাল্য জীবনের একটী ঘটনা হইতে আজ তোমাদিগকে তাহার উদাহরণ দিব।

ইউরোপে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদিগকে আমাদের দেশের ন্যায় বিদ্যালয় পাঠান হয় না। অবস্থাপন্ন লোকেরা বাড়ীতে শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া তাহাদের লেখা পড়া শেখান। গ্লাড্‌ষ্টোন সাহেবের শিক্ষার জন্যও তাঁহার পিতা এক শিক্ষয়িত্রী রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যখন ৬। ৭ বৎসর বয়স, তখন সেই শিক্ষয়িত্রীর বিবাহ হইয়া গেল। পুত্রের শিক্ষা নিয়া পিতা বিপদে পড়িলেন; ভাল শিক্ষয়িত্রী না পাওয়াতে, নিকটে এক পাদ্রীর বাড়ীতে যে বিদ্যালয় আছে, তাহাতে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়াই ঠিক করিলেন। কিন্তু পাদ্রী সাহেব এত অল্প বয়স্ক ছেলেদিগকে তাঁহার স্কুলে ভর্ত্তি করিতেন না। তাঁহার বিদ্যালয়ে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণই পড়িত—গ্রীক্ লাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষাই তাঁহার নিকট ছাত্রগণ শিক্ষা করিতে আসিত। পাদ্রী সাহেব অতি

বিদ্বান লোক ছিলেন। গ্লাড্‌ষ্টোনের পিতা সেই পাদ্রি সাহেবের নিকট যাইয়া সমুদয় অবস্থা খুলিয়া বলিয়া তাঁহার মনোগত ভাব প্রকাশ করিলেন। পাদ্রি সাহেব কথা দেওয়ার আগে ছেলেটীকে দেখিতে চাহিলেন। পিতা উইলিকে (পিতামাতা ভাই বোনেরা বালক গ্লাড্‌ষ্টোনকে আদর করিয়া এই নামে ডাকিতেন) লইয়া পর দিন প্রাতঃকালে পাদ্রি সাহেবের নিকট গেলেন। অধ্যাপক পাদ্রি উইলিকে একখানা ছবির বই দেখিতে দিয়া কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হইলেন। উইলি ছবির বইখানির এদিক ওদিক দেখিয়া দু এক পাতা উল্‌টাইয়া পাদ্রিকে বলিলেন,—আমি এই বই চাই না, এরকম পুঁথি আমার ভাল লাগে না। পাদ্রি সাহেব বালক গ্লাড্‌ষ্টোনের রুচি ও প্রকৃতির পরীক্ষা করিতেছিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে অন্য ঘরে আনিয়া বলিলেন, এই আমার লাইব্রেরী রহিয়াছে; এখান হইতে যে বই তোমার ভাল লাগে, তাই নিয়া তুমি পড়। এই বলিয়া পাদ্রি সাহেব চলিয়া গেলেন,— উইলি একলাটী লাইব্রেরীতে রহিলেন। তখন তিনি খুঁজিয়া খুঁজিয়া ইংলণ্ডের এক প্রকাণ্ড ইতিহাস খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। পাদ্রি সাহেব ও উইলির পিতা কতকক্ষণ পরে সেই ঘরে আসিয়া দেখেন,—ক্ষুদ্র বালক প্রায় তাহার সমান উচু এক বই খুলিয়া গভীর মনোযোগের সহিত পড়িতেছে। পাদ্রি সাহেব একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি এই বই পড়িতে পার? উইলি— "হাঁ; এই বই পড়িতে আমার বেশ লাগিতেছে।" তখন অধ্যাপক পাদ্রি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি গ্রীক, লাটিন পড়িতে জান? উইলি বলিল,—হাঁ, আমি গ্রীক্ ও লাটিনের প্রথম শিক্ষার বই সমাপন করিয়া দ্বিতীয় শিক্ষার বই প্রায় শেষ করিয়াছি। পাদ্রি সাহেব উইলির উত্তরে অত্যন্ত সুখী হইয়া বলিলেন, আচ্ছা বাবা, তোমাকে আমার স্কুলে ভর্ত্তি করিব। বালক গ্লাড্‌ষ্টোন সেই হইতে তাঁহার নিকট থাকিয়া বাল্য শিক্ষা সমাপন করিলেন।

পোষ্যপুত্র রাজা। *

রাজাদের গাই বিয়াইল।
সুন্দর বাছুর তার, দেখ মরি কি বাহার,
সবাকার চক্ষু জুড়াইল॥
কিবা কচি মুখখানি, কিবা ভাবে নাহি জানি,
ছল ছল নয়ন যুগল;
শ্বেত নীল চারু অঙ্গে, মিশিয়াছে এক সঙ্গে,
কি মধুর কেমন উজ্জ্বল।
ফল ফুল তরু লতা, প্রাণীপুঞ্জ-বিচিত্রতা,
নীলাকাশ, শীতল বাতাস,
হেমকান্তি মেঘ দল, দীপ্তিমান ভূমণ্ডল,
এর কাছে প্রথম প্রকাশ।
শীতল নিশ্বাস লয়ে, আনন্দেতে মত্ত হয়ে,
দেখ কিবা নেচে নেচে যায়।
অশিক্ষিত পদভরে, পড়িয়া ধরণী'পরে,
কাম অঙ্গ ধূলায় লোটায়।

* বঙ্গীয় বর্ত্তমান কোন রাজ-পরিবার সম্বন্ধে একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

দেখিয়া সানন্দ মনে, গিয়া রাজ-সন্নিধানে,
রাখাল বালক নিবেদিল ;—
দেখ রাজা একবার, মরি কিবা চমৎকার,
বুধী গাই বৎস প্রসবিল।
চলে-রাজা কুতূহলে, সভাসদ দল বলে,
বুধীগাই অতি প্রিয় তার,
নিরখিয়া হৃষ্ট মনে, বলে সভাসদ জনে,
দেখ দেখ কিবা চমৎকার।
বিষম বেদনা পেয়ে, একান্ত অধীর হয়ে,
দুনয়নে বহিতেছে ধারা,
তবু ওই বৎস তরে, দেখ ছুটাছুটি করে,
ধন্য ধন্য পশু মাতা যারা।
শুনিয়া রাজার কথা, রাখাল বালক তথা,
অকস্মাৎ বলিল বচন ;—
স্বভাবের শিশু যেই, কভু কিগো জানে সেই,
মনোভাব করিতে গোপন ;—
"মহারাজ যবে তুমি, এসেছিলে ভবভূমি,
প্রসব বেদনা ভুলি, ইহারি মতন,
তোমার জননী যিনি, তোমারও তরে তিনি,
অভাগিনী করেছেন এমনি যতন।"

* * *

বাজিল হৃদয়তন্ত্রী, উদাস অধীর প্রাণ,
অশ্রুপূর্ণ হইল নয়ন,
মরমের উৎস আজি, ছুটিয়া গিয়াছে তার,
শূন্যময় সকল ভুবন।
"বলি হে রাখাল শিশু, জানকিহে জান তুমি,
কোথা মোর জননী দুখিনী ?"
"মোর সঙ্গে এস রাজা, দেখিতে পাইবে তারে
ওই গ্রামে আছেন যে তিনি।"
মন্ত্রমুগ্ধ যেন রায়, রাখালের পাছে ধায়,
দু'নয়নে বহে বারিধারা,
পারিষদ সভাসদ, পশ্চাতে ছুটিছে সব,
হাতী ঘোড়া শিবিকা পাহারা।
কোথা মান অভিমান, সকলি গিয়েছে ভুলে,
হৃদয়ের এমনি উচ্ছ্বাস,
প্রখর সূর্য্যের তাপে, শরীর যেতেছে পুড়ে,
লক্ষ্য নাই নিদাঘ-বাতাস।
গিয়া সেই গ্রামান্তরে, রাখাল-দর্শিত এক,
পর্ণকুটিরের দ্বার ধরি,
ডাকে রাজা বারবার, "কোথা আছ মা আমার,
এস মা এস মা ত্বরা করি।"
"কেগো বাছা তুমি মোরে, মা বলিয়া ডাকিতেছ,
আমি নারী অতি অভাগিনী,"
বলিতে বলিতে কথা, ছুটিয়া আসিল সেই
দীনহীনা কুটিরবাসিনী।
"আমি যে তোমারি ছেলে, তব গর্ভজাত আমি,
আহা মাতঃ এদশা তোমার!
ওগো মা এ দিকে এস, তব বুকে মুখ রাখি,
কাঁদিবারে বাসনা আমার।"
বলিয়া মায়ের বুকে, ঘুমাল মায়ের ছেলে,
অচেতন ভূপতি তখন,
জননীর অশ্রুনীরে, নিশীর শিশির-সিক্ত
পদ্মবৎ হইল শোভন।

* * *

ঝম্ ঝম্ ঝম্ রবে বাজিছে বাজন।
জননী প্রতিমাখানি, শিবিকায় উঠাইয়া
পদব্রজে নরপতি করিছে গমন।
রাজপুরে মহোৎসব, এসেছেন রাজমাতা,
মাঙ্গলিক শঙ্খরবে বধির শ্রবণ,
হর্ম্ম্যতলে বসাইয়া, জননীরে প্রণমিয়া
জননীর পাদোদক করিয়া গ্রহণ,
স্নানাহার নরপতি করিল তখন॥

রুষযুবরাজের ভারত ভ্রমণ।

রুষ-যুবরাজ গ্রাণ্ডডিউক নীকোলাস ও তাঁহার ভ্রাতা জর্জ্জ আলেক্‌জেণ্ড্রভিক পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, এ খবর তোমরা জান। তাঁহারা ইউরোপের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া গ্রীস্ দেশে উপনীত হইলে, তথাকার রাজকুমার জর্জ্জও তাঁহাদের সঙ্গে যুটিয়াছেন। রুষযুবরাজ ও গ্রীসের রাজকুমার এখন ভারতবর্ষের নানা স্থানে বেড়িয়া বেড়াইতেছেন; যুবরাজের ভ্রাতা অসুস্থ হইয়া বোম্বাইর বন্দরে জাহাজে আছেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা ভারতের কোন্ কোন্ স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, কোথায় কিরূপ অভ্যর্থনাদি পাইয়াছেন, সংক্ষেপে আজ তোমাদিগকে সেই সংবাদ প্রদান করিব।

অপর পৃষ্ঠায় যাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রদত্ত হইল, ইনিই রুষযুবরাজ গ্রেণ্ডডিউক নীকোলাস। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মে তাঁহার জন্ম হয়। এখন ইঁহার বয়স ২৩ বৎসর। দেখিতে খুব সুশ্রী নহেন—কদাকারও নহেন। রাজ পোষাকে সজ্জিত দেখিলে, রাজ পুত্রের যোগ্য বলিয়াই মনে হয়। তিনি যে সৈনিক পোষাকে সজ্জিত হইয়া, কলিকাতা নগরীতে অবতরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে বেশ মানাইয়াছিল।

বিগত ২৩এ ডিসেম্বর তিনি জাহাজ হইতে সদলবলে বোম্বাই সহরে অবতরণ করেন। তথাকার গবর্ণর লর্ড হেরিস বিধিমতে তথায় তাঁহার আদর অভ্যর্থনা করেন। বোম্বাই হইতে তিনি নিজাম রাজ্যে গমন করেন। নিজাম রাজ্যের রাজধানী হায়দরাবাদে তাঁহার যথাযোগ্য অভ্যর্থনা হইয়াছিল। কুমার এলবার্ট ভিক্টর যে গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন, নিজাম রুষ-যুবরাজকেও তাহাতে অবস্থিতি করিতে দিয়াছিলেন।

বিগত ৩১এ ডিসেম্বর জারপুত্র দলবল সহ আমেদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে বিশ্বামৈত্রী নামক স্থানে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া বরদা রাজ্যের অন্তর্গত কেলামপুরে শিকারার্থ গমন করেন। কেলামপুরে পৌছিলে গুইকুমারের সৈন্যদল তাঁহার অভ্যর্থনা করে। তথায় শিকার-আমোদ সম্ভোগের পর, অপরাহ্ণে আমেদাবাদে পৌছেন। বোম্বাইর লাট এখানে আবার তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। ১লা জানুয়ারী আমেদাবাদে অবস্থান করিয়া ২রা জানুয়ারী বীরভূমি রাজপুতানা পরিদর্শনে যাত্রা করেন। বিদায় কালে ষ্টেসনে বোম্বাইর লাট প্রভৃতি অনেক মান্য গণ্য লোক উপস্থিত ছিলেন।

৩রা জানুয়ারী রুষযুবরাজ দলবলে যোধপুরে উপস্থিত হন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য মহারাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তাঁহার ভ্রাতা, রেসিডেণ্ট প্রভৃতি ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন। সৈন্যগণ ষ্টেসনের বাহিরে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা রুষের জাতীয় সঙ্গীত বাজাইয়া যুবরাজকে প্রীত করিয়াছিল। তাঁহার বাস জন্য যোধপুরে যে গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা অতি সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। জার-নন্দন মাধ্যাহ্নিক আহারের পর যোধপুরের দুর্গ ও নগর দর্শন করিয়া আনন্দিত হন। রাত্রিতে ভোজ, নৃত্য গীতাদি হইয়াছিল। পর দিন মৃগয়াদি করিয়া রাত্রির গাড়ীতে আজমিরাভিমুখে যাত্রা করেন।

৫ই জানুয়ারী রবিবার আজমিরে উপস্থিত হন। তথায়ও আদর অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হয় নাই। সেখানে ২ দিন আমোদ আহ্লাদ, শিকার নৃত্য গীতাদিতে অতিবাহিত করিয়া, ৭ই জানুয়ারী মঙ্গলবার প্রাতে জয়পুরে উপনীত হন। মহারাজা স্বয়ং, রেসিডেণ্ট প্রভৃতি গণ্য মান্য অনেকে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন। অশ্ব-শকটে ও হস্তী-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহারা সকলে ষ্টেসন হইতে রাজধানীতে গমন করেন। জয়পুরে রেসিডেণ্টের গৃহে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। মহারাজা তথায় সম্রাট-পুত্রকে আতর পান দিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সেদিন আহারান্তে লোক জন সহ ব্যাঘ্র শিকারে গমন করেন। একটা বাঘিনী ও একটা ১৮ মাসের শাবক বধ করিয়া তাঁহারা রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রাত্রিতে ভোজ, নাচ, বাজি, তামাসার পর, রুষযুবরাজ জয়পুর পরিত্যাগ করিয়া আলোয়ার অভিমুখে গমন করেন।

যুবরাজের অভ্যর্থনার জন্য আলোয়ার ষ্টেসনটী সুসজ্জিত হইয়াছিল;—মহারাজা স্বয়ং ও রেসিডেণ্ট, অন্যান্য গণ্য মান লোকজন সহ তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন; রাজ্যের সৈন্যগণ

শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ষ্টেসনের বাহিরে দণ্ডায়মান ছিল। মহারাজার "গ্রীষ্মাবাসে" তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সাক্ষাৎ প্রতিসাক্ষাতের পর যুবরাজ শিকারে বহির্গত হন। অপরাহ্ণে ভোজ ও রাত্রিতে বাজি পোড়ান হইয়াছিল। পর দিবস মৃগয়াদি করিয়া রাত্রিতে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন।

১২ই জানুয়ারী প্রাতঃকালে যুবরাজ দিল্লীতে অবতরণ করেন। তথাকার ইংরেজ গবর্ণমেন্টের দুইজন উচ্চ সৈনিক কর্ম্মচারী দলবলে তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। প্রাতর্ভোজের পর ভারতের প্রাচীন রাজধানী দিল্লী নগরী পরিদর্শনে বহির্গত হন। সায়াহ্নে ভোজ হইয়াছিল। পর দিন দিল্লীর অক্ষয়কীর্ত্তি কুতবমিনার দর্শন করেন।

১৩ই জানুয়ারী রুষ-সম্রাটপুত্র সহচর অনুচর বৃন্দসহ দিল্লী হইতে পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের রাজধানী লাহোর নগরে উপস্থিত হন। পঞ্জাবের ছোটলাট ও অন্যান্য অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন। ষ্টেসনটী পত্র পুষ্পে, সৈন্য দলে সুসজ্জিত হইয়াছিল। যুবরাজ রেলগাড়ী হইতে অবতরণ করিবামাত্র রুষের জাতীয় সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল,—জাতীয় সঙ্গীত শুনিয়া তিনি পুলকিত হইলেন। ষ্টেসন হইতে লাহোর দুর্গ ও তন্নিকটস্থ প্রাচীন মস্‌জিদ প্রভৃতি দেখিয়া যুবরাজ রাজপ্রাসাদে গমন করিলেন। সেদিন অপরাহ্ণে ক্রীড়াদি ও সায়াহ্নে ভোজ নাচ হইয়াছিল। ১৪ই তারিখ শিকারে দিন যাপিত হয়। ১৫ই তারিখ অমৃতসরের গুরু-দরবারের "স্বর্ণমন্দির" দর্শন করেন।

১৭ই জানুয়ারী শনিবার আগ্রাতে পৌছিয়া তত্রত্য দুর্গ ও তাজমহল পরিদর্শন করেন। সেদিন রাত্রিতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট ও অপরাপর গণ্য মান্য লোকে তাঁহাকে এক ভোজ দেন। রবিবার বিশ্রামে কাটিয়া যায়। সোমবার দিন বাদসাহ আক্‌বরের সমাধিমন্দির পরিদর্শন করেন। সেই দিবস রাত্রিতে গাড়ীতে চড়িয়া গোয়ালিয়ার অভিমুখে যাত্রা করেন।

তিনি পথে গোয়ালিয়ার, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ ও কাশী প্রভৃতি স্থানের দর্শনীয় বিষয় পরিদর্শন ও স্থানে স্থানে শিকারাদি করিয়া বিগত ২৬শে জানুয়ারী সোমবার অপরাহ্ণ ৪টা ৩৩ মিনিটের সময় ভারতের রাজধানী কলিকাতা নগরীতে উপনীত হন। তাঁহার গাড়ী ষ্টেসনে পৌছিবামাত্র ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ হইতে ২১টী তোপ পড়িয়াছিল। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বড়লাট, ছোটলাট প্রভৃতি সসৈন্যে ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হাওড়া ষ্টেসনটী সুসজ্জিত হইয়াছিল; ষ্টেসন হইতে যে পথে যুবরাজ রাজপ্রাসাদে পৌছিলেন, তাহার দুই ধারে সৈন্যগণ কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহাকে দেখার জন্য অনেক লোক পথের দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। রাজপ্রাসাদে পদার্পণমাত্র আবার ২১ বার তোপধ্বনি হইল। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বড়লাটের ভবনে ভোজ, উদ্যান সম্মিলন এবং ছোটলাটের বাড়ীতে ভোজ হইয়াছিল। সম্প্রতি রুষরাজ-পরিবারস্থ কাহার মৃত্যু হওয়াতে নৃত্য গীতের আমোদ আহ্লাদ হয় নাই। তিনি যাদুঘর, পশুশালা, কোম্পানির বাগান, টেকশাল, দুর্গ প্রভৃতি দর্শন করিয়াছেন। রুষযুবরাজের দার্জ্জিলিং গমনের কথা ছিল, তাহা হয় নাই। ২৮এ জানুয়ারি রাত্রির গাড়ীতে বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। তিনি তথায় পৌছিয়াই জাহাজে আরোহণ করিবেন; জাহাজে চড়িয়া ৬ই ফেব্রুয়ারি মান্দ্রাজে উপনীত হইবেন।

বালক ভীষ্ম।

"শুনহ পাঞ্চাল আর যত রাজভাগ,
সবে জান আমি দারা করিয়াছি ত্যাগ।"

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় যিনি উপরের লিখিত কথা বলিয়াছিলেন; তাঁহারই নাম ভীষ্ম। বাল্যকালে তাঁহার নাম দেবব্রত ছিল। তিনি কেন চিরজীবন অবিবাহিত অবস্থায় কাটাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বাল্যকালে কিরূপ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল, আমরা অদ্য তাহার কিছু কিছু সখার পাঠক পাঠিকাদিগকে বলিব। সখার পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে যাঁহারা একটু অধিক বয়স্ক, তাঁহারা হয়ত আমি যাহা বলিব তাহা সবই জানেন; কিন্তু আমার এই গল্পটী ছোট ছোট বালক বালিকাদের জন্য মাত্র।

ভীষ্মের পিতার নাম শান্তনু। চন্দ্রবংশীয় রাজাদের মধ্যে শান্তনু একজন খ্যাতনামা রাজা ছিলেন। ভীষ্ম তাঁহার ঔরষে গঙ্গাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হিমালয় পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া কুল কুল নাদে অবিরাম অনন্ত গতিতে যে গঙ্গা নদী কলিকাতার নীচে দিয়া * সাগরে পতিত হইয়াছে, ভীষ্মের মাতা গঙ্গা সেই গঙ্গাদেবী অথবা সেই গঙ্গা নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। গঙ্গা দেবতা, শান্তনু মনুষ্য; উভয়ের মধ্যে কিরূপে মিলন কার্য্যটা হইল, তাহারও কিছু বলা যেন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

সেকালে আমাদের এই ভারতবর্ষের মানুষেরা বড় সামান্য মানুষ ছিলেন না। আমরা যেমন আবশ্যক পড়িলে এ পাড়ায় ওপাড়ায় যখন তখন বেড়াইতে যাই, সেকালে তেম্নি আমাদের দেশের পূর্ব্ব পুরুষেরা স্বর্গে বেড়াইতে যাইতেন। যুদ্ধে দেবতাদের সাহায্য করিতেন, কেহ স্বর্গ রাজ্যের রাজা ইন্দ্রের পদ লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ করিতেন। তাঁহারা অনেক অদ্ভুত, অলৌকিক কার্য্য করিতে পারিতেন। অগস্ত মুনি ত একদিন, সাতটা সাগরের জল এক গণ্ডূষে উদরস্থ করিলেন। আর ডারোইনী মতে আমাদের খাঁটী পূর্ব্ব পুরুষ যিনি, তিনি ত একদিন "জয় রাম" শব্দে লক্ষ যোজন সমুদ্র এক লাফে ডিঙ্গাইয়া ফেলিলেন। কাজেই বলি, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে সে ছিলেন না। তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; আমরা সামান্য মানুষ, আমাদের সঙ্গে তাঁহাদের তুলনাই হয় না। প্রায় প্রত্যেক দেশের পৌরাণিক আখ্যায়িকাতেই এরূপ অলৌলিক, অস্বাভাবিক কথা আছে। যাউক এসব কথা। অষ্টবসু, বশিষ্ঠ মুনি কর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হয়,—তাহাদিগকে মানুষ হইয়া এই পৃথিবীতে বাস করিতে হইবে। স্বর্গবাসী দেবতা কোন দিন দুঃখের লেশ জানে না, তাই আজ বসু আট জনের বড়ই ভাবনা হইল, কেমন করিয়া এই দুঃখময় পৃথিবীতে বাস করিবে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহারা গঙ্গাদেবীর শরণাপন্ন হইল। গঙ্গাদেবীও স্বীকার করিলেন—আমি মানুষী হইয়া তোমাদিগকে গর্ভে ধারণ করিব এবং সত্বর সত্বর এই স্বর্গলোকে পাঠাইয়া দিব। শাপগ্রস্ত অষ্ট বসু ভূপতিত হইল, গঙ্গাদেবী পরমা সুন্দরী যুবতী হইয়া শান্তনুর সহিত বিবাহিত হইলেন। কথিত আছে, শান্তনুর পিতা প্রতীপ গঙ্গার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন যে, তাঁহার পুত্রের সঙ্গে গঙ্গার বিবাহ দিবেন, শান্তনু পিতার প্রতিজ্ঞা পূরণ করিলেন, দেবী স্বয়ং শান্তনুর গৃহলক্ষ্মী হইলেন। সেকালে হইত, একালে কি আর তেমনটি হয়।

যখন গঙ্গাতে শান্তনুতে বিবাহ হয়, সেই সময় গঙ্গা শান্তনুকে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন, যে গঙ্গা-

* কলিকাতার নীচে দিয়া প্রবাহিত নদীর নাম 'হুগলি'। ইহা গঙ্গার শাখানদী মাত্র।

দবী যখন যে কার্য্য করিবেন, শান্তনু তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন না, কিম্বা বাঁধা জন্মাইতেও পারিবেন না; যে দিন তাহা হইবে, সেই দিনই গঙ্গা শান্তনুকে পরিত্যাগ করিবেন।

একে একে অষ্ট বসুর এক এক জন করিয়া গঙ্গার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতে লাগিল, গঙ্গাদেবীও একটী একটী করিয়া সদ্যজাতঃ কুমার নিকটবর্ত্তী নদীগর্ভে বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, আর বেচারী শান্তনু ভ্যাবা গঙ্গারামের মত চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। বারণ করিতে পারেন না, কারণ জিজ্ঞাসিতে পারেন না, গঙ্গা পাছে ছাড়িয়া যান। এইরূপে সাতজন বসু শাপমুক্ত হইল, শেষে অষ্টম বসু প্রসূত হইল। গঙ্গাও সদ্যপ্রসূত সন্তান ক্রোড়ে পূর্ব্ববৎ নদীর দিকে গমন করিলেন; কিন্তু শান্তনুর এবার তাহা সহ্য হইল না। তিনি মনে করিলেন, রাক্ষসী না হইলে কে সন্তান বধ করিতে পারে? এবার তিনি খুব সাহসে বুক বান্ধিয়া গঙ্গাকে বাধা দিলেন। সুধু বাধা নয়, বেশ চড়া সুরে দুকথা শুনাইয়া দিলেন। গঙ্গাদেবীও পূর্ব্ব কথামত শান্তনুকে নিজের পরিচয় প্রদান করিয়া, পুত্রটী কোলে লইয়া সেই নদী-মধ্যে অদৃশ্যা হইলেন। বলিয়া গেলেন, সময়ে তোমার পুত্র তোমার নিকট প্রেরিত হইবে। ভীষ্ম, মাতা গঙ্গাদেবীর সঙ্গে স্বর্গে থাকিয়া অনন্ত বিদ্যা অভ্যাস করিলেন, এবং যৌবনের প্রারম্ভে পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন; শান্তনু ভীষ্মকে পাইয়া শান্ত হইলেন। গঙ্গার শোকে কিন্তু আর বিবাহ করিলেন না। ভীষ্ম বাল্যকালে দেবব্রত নামে খ্যাত ছিলেন। ভীষ্মের জন্ম বৃত্তান্ত এইখানে শেষ হইল।

দেবব্রত বড় পিতৃভক্ত ছিলেন, পিতার তৃপ্তি সাধন করিতে তিনি কখনও পরাঙ্মুখ ছিলেন না।

"পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥"

শাস্ত্রমতে পিতা আমাদের স্বর্গ, পিতাই আমাদের ধর্ম্ম, পিতাই আমাদের প্রধান তপস্যা; পিতার প্রীতি সাধন করিতে পারিলে সকল দেবতারা আমাদের উপর প্রসন্ন হয়েন। যে পিতা হইতে আমরা এই বিচিত্র জগতের অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি নয়নগোচর করিতেছি, যিনি মুখের জিনিশ তুলিয়া আমাদের খাওয়াইয়াছেন, কত যত্নে পালন করিয়াছেন, আমাদের সামান্য পীড়ায় যিনি ভাবিতে ভাবিতে কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়াছেন, তিনিই পৃথিবীতে আমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা। পিতার আজ্ঞা পালন করিয়া যে পুত্র সুখী না হয়, পিতার তৃপ্তি সাধন করিয়া, পিতার হসিত মুখ দেখিয়া যে পুত্র স্বর্গ-সুখ প্রাপ্ত না হয়, সে নিতান্তই নরাধম। আমাদের পাঠক পাঠিকারা সকলই পিতৃভক্ত এমত আশা করি। পিতা যাহা বলিলেন, তাহার উপর বোধ হয় কেহ দ্বিরুক্তি করেন না। পিতা কখন কি আদেশ করেন, তাহার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত। পিতৃ আজ্ঞা পালন করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া যে পুত্র পিতার মনে ব্যথা দেয়, নরকবাস তাহারই ভাগ্যে।

যাহা বলিতেছিলাম, ভীষ্ম বড় পিতৃভক্ত ছিলেন, এবং পিতার তৃপ্তিসাধন করিতেই তাঁহাকে চির কৌমার্য্য-ব্রত অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

একদা শান্তনু রাজা সসৈন্যে মৃগয়ায় বাহির হন। বহু পর্য্যটনের পর শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া নদীর তীরে উপস্থিত হন। নদীর ধারেই ধীবর রাজের বাড়ী। পিপাসিত শান্তনু সেই বাড়ীতে জলপানার্থ গমন করিলেন। ধীবর রাজের সত্যবতী নাম্নী পরমা সুন্দরী এক কন্যা ছিল। উপযুক্ত পাত্র অভাবে, সত্যবতীর বয়স একটু অধিক হইলেও, ধীবররাজ তাঁহার বিবাহ দেন নাই। শান্তনু জল প্রার্থনা করিলে, সত্যবতী স্বর্ণপাত্রে জল আনিয়া রাজার সম্মুখে রাখিল। রাজার জলপান করা হইল

না। সত্যবতীর রূপে তিনি এমনি মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন যে, ধীবর রাজকে ডাকিয়া, স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলেন এবং সত্যবতীকে বিবাহ করিবেন এরূপ অভিপ্রায় জানাইলেন। শান্তনুর মনে বিশ্বাস ছিল, পরিচয় পাইলে ধীবররাজ আহ্লাদ সহকারে কন্যা দান করিবেন; কিন্তু কার্য্যে তাহা হইল না। ধীবররাজ কন্যা দান করিতে অসম্মত হইলেন। শান্তনু ভগ্ন-মনোরথ হইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সেই হইতে তাঁহার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ, মুখ সর্ব্বদা অপ্রসন্ন, রাজকার্য্যে সম্পূর্ণ অমনোযোগ, স্নেহের আধার পুত্ররত্ন ভীষ্মের প্রতি অযত্ন। বালক ভীষ্মের প্রাণে ইহা সহিল না, পিতার মলিন মুখ পুত্রের হৃদয়ে বড় বাজিল। ভীষ্মেরও আহার নিদ্রা ত্যাগ হইল;—সর্ব্বদা হসিত মুখ গাঢ় আঁধারে ঢাকিল, পিতার অসুখের কারণ জানিবার জন্য ভীষ্ম বিশেষ যত্ন করিতে লাগিল। অনেক অনুসন্ধানের পর ভীষ্ম প্রকৃত কারণ জানিতে পারিয়া, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল,—পিতার মুখে পুনরায় হাসি দেখিতে পাইলে গৃহে ফিরিব, নচেৎ আর না।

ভীষ্ম একেবারে সেই ধীবর রাজের বাটী গিয়া উপস্থিত। ধীবররাজ ভীষ্মের আগমনবার্ত্তা প্রাপ্তিমাত্রে, বহু সম্মান পূর্ব্বক তাঁহাকে যত্ন করিতে লাগিলেন। অনেক আলাপের পর ধীবররাজ ভীষ্মের আগমনের কারণ জানিতে চাহিলেন। সত্যবতীর পিতার মনে ধারণা হইয়াছিল যে, ভীষ্ম তাহার কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্যই আগমন করিয়াছেন। ভীষ্মের ন্যায় জামাতা পাওয়া কম সৌভাগ্যের বিষয় নয়। সেই জন্য ধীবর রাজের বড় আহ্লাদ হইয়াছে; কিন্তু ভীষ্মের মনের ভাব যে স্বতন্ত্র, তাহা সত্যবতীর পিতা জানিলে কখনই এত সুখী বোধ করিতেন না। যাহা হউক, কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে, ভীষ্ম মনোগত ভাব ব্যক্ত করিল। ভীষ্ম বলিল যে, আপনার সত্যবতী নাম্নী কন্যার সহিত আমার পিতার বিবাহ দিন। পিতা আমার তাহার জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত ও দুঃখিত। তাঁহার অপ্রসন্ন মুখ আমি দেখিতে পারি না; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রস্তাবে সম্মত হউন।

ধীবররাজ বিষম সমস্যায় পড়িলেন। তাঁহার মনে মনে আশা ছিল, সত্যবতীকে কোন রাজার সঙ্গে বিবাহ দেন এবং সত্যবতীর সন্তানেরা কালে রাজা হয়, এখানে শান্তনু রাজা বটে, কিন্তু শান্তনুর সঙ্গে বিবাহ দিলে সত্যবতীর সন্তানেরা কস্মিন্ কালেও সিংহাসন পাইবে না। ভীষ্ম জ্যেষ্ঠ, বিদ্বান, বুদ্ধিমান; ভীষ্ম বর্ত্তমানে অন্য পুত্রে শান্তনুর সিংহাসন পাইতে পারে না। ধীবররাজ, ভীষ্মকে বিনয় করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনার বংশে কন্যাদান পরম সৌভাগ্য, কিন্তু শান্তনু প্রাচীন এবং আপনার ন্যায় পুত্র তাঁহার বর্ত্তমান; এমত অবস্থায় তাঁহার বিবাহ করাই অন্যায়, তবে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সত্যবতীকে গ্রহণ করিলে, বিশেষ আহ্লাদিত হই।" ভীষ্ম দৃঢ়তা সহকারে বলিল, "মহাশয়, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত; সত্যবতী আমার মাতৃকল্পা, যদি অনুগ্রহ করেন, আমার পিতার সঙ্গেই তাঁহার বিবাহ দিন।" সত্যবতীর পিতা ভীষ্মের কথায় হতাশ হইয়া বলিলেন,—"আমি আমার কন্যার বিবাহ দিব না, আপনি স্বরাজ্যে গমন করুন, আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না।"

ভীষ্ম দেখিল, তাহার আশাপূর্ণ হইল না, পিতার বিষম ব্যাধির ঔষধ মিলিল না। তখন নিতান্ত হতাশ হইয়া ধীবর রাজকে জিজ্ঞাসা করিল যে, "মহাশয়, পিতার সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দিতে

কি জন্য আপত্তি করিতেছেন; খুলিয়া বলিলে আমি তাহার প্রতিবিধান করিতে পারি”। তখন ধীবররাজ মনের কথা বলিলেন,—শান্তনুর সঙ্গে বিবাহ দিলে তাহার কন্যার সন্তানেরা রাজ-সিংহাসনের অধিকারী হইবে না,—চিরকাল পরের অধীন হইয়া থাকিবে, একমাত্র কন্যাকে এরূপ অবস্থায় বিবাহ দিতে তাঁহার আদবেই মত নাই। তবে ভীষ্ম স্বয়ং বিবাহ করিলে তাঁহার কোন আপত্তি নাই। ভীষ্ম যুবরাজ, সিংহাসনের ভাবী অধিকারী। তাঁহার সন্তানেরাও কালে রাজা হইতে পারিবে। ভীষ্ম তখন সমস্ত বুঝিতে পারিল এবং সর্ব্ব সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিল,—“আমি আজ হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম, কখনও বিবাহ করিব না। চিরকাল কৌমার্য্য-ব্রত পালন করিব, স্বয়ং সিংহাসনে বসিব না। আমার রাজা হওয়ার সাধ নাই, আমর প্রাপ্য রাজ্য আমি ভাবী বিমাতৃ তনয়কে প্রদান করিব।” ভীষ্মের প্রতিজ্ঞায় জগৎ স্তব্ধ হইল। ধীবররাজ বিস্মিত হইলেন এবং অগত্যা শান্তনুর সঙ্গে স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে স্বীকার করিলেন। যথাসময়ে শান্তনু ও সত্যবতীর বিবাহ হইয়া গেল। শান্তনুর মুখে আবার প্রসন্নতা দেখা দিল, কার্য্যে উৎসাহ ও মনোযোগের বৃদ্ধি হইল। সমস্ত হইল, কালে সমস্তই লয়প্রাপ্ত হইল; কিন্তু ভীষ্মের কীর্ত্তি কালে কিছুই করিতে পারে নাই। ভীষ্মের কীর্ত্তির সঙ্গে নশ্বর জগতের নশ্বর কার্য্য কলাপ অবিনশ্বর ভাবে গ্রথিত হইয়াছে। এই বিষম প্রতিজ্ঞা করিয়াই দেবব্রত “ভীষ্ম” নামে আখ্যাত হন।

ভীষ্ম সত্যই বুঝিয়াছিল যে, পিতার মুখে যদি হাসি দেখিতে না পাইলাম, তবে আমার রাজ্যে কার্য্য কি? সুখ ক্ষণস্থায়ী। মনুষ্যজীবন প্রাপ্ত হইয়া যদি পিতার তৃপ্তি সাধন করিতে না পারিলাম, তবে ভোগ লালসা পুরণ করিয়া কি তৃপ্তি পাইব? আয়ুর স্থিরতা নাই, সেই অস্থায়ী জীবন লইয়া কে স্থায়ী পুণ্য সঞ্চয় করিতে যত্নবান না হয়? ভীষ্মকে ধন্য, সে নিজের স্বার্থ অনায়াসে ত্যাগ করিয়াছিল। এই স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই, আজ তাহার অক্ষয় কীর্ত্তির কথা ইতিহাসে গ্রথিত আছে; নহিলে ভারতবর্ষে কত রাজা কত রাজপুত্র জন্মিয়া এই ভারতের মাটীতে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের, কথা কে জানে?

মাতৃ-প্রেম।

শীতকালে, এক দিন অতি প্রত্যুষে একটী বালিকা শীতে জড়সড় হইয়া কতকগুলি বাসন পরিষ্কার করিতেছিল। এমন সময় একটী প্রতিবেশী স্ত্রীলোক আসিয়া বলিল,—“এত সকালে এই ভয়ানক শীতে তোমার এই কাজ করিতে কষ্ট হইতেছে না?” বালিকা মুখ একটু উচু করিল। মুখ দেখিয়াই তাহার হৃদয়ের প্রসন্নতা প্রকাশ পাইল। সে বলিল,—“মার আজ একটু অসুখ করেছে, তাঁহার জন্য এই কায করিতে আমার একটুকুও কষ্ট হইতেছে না; বরং আনন্দ হইতেছে।

পত্রপ্রেরকদের প্রতি
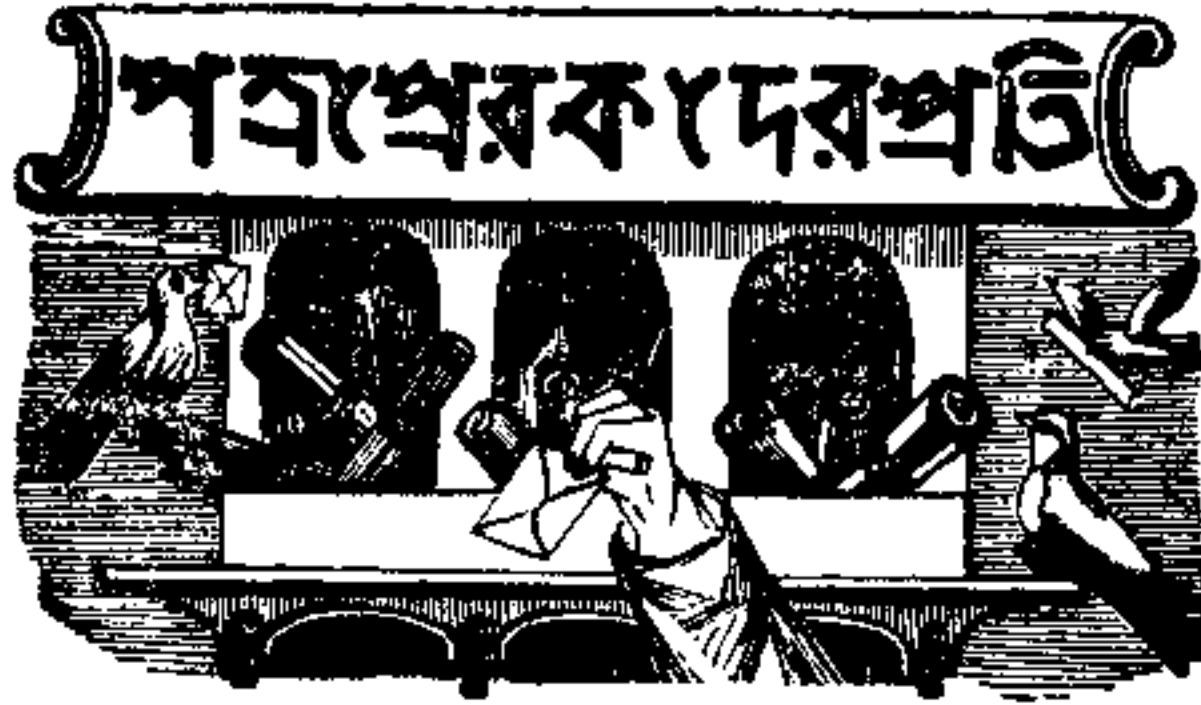
কুমারী রেবা বাই, কটক।—সখাতে প্রকাশ জন্য ক্রমাগত কয়েকটী কবিতা পাঠাইয়াছেন। তত ভাল হয় নাই বলিয়া প্রকাশ করা গেল না।

শ্রীবিনোদলাল ঘোষ, ঢাকা কলেজ।—আপনার প্রবন্ধ বালক বালিকাদের পক্ষে কিছু শক্ত হইয়াছে। প্রবন্ধে মার্টিন লুথার, গেলিলিও, সেক্ষপিয়র প্রভৃতি যে সকল মহাত্মাদের নামোল্লেখ আছে; তাঁহাদের জীবনী জানা না থাকিলে প্রবন্ধের মর্ম্ম গ্রহণে সখার পাঠক পাঠিকারা সক্ষম হইবেন না।

শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায়, বাঁশবেড়িয়া।—এব্রাহিম লিঙ্কণের জীবনী দ্বিতীয় ভাগ সখায় বাহির হইয়াছে। ঐ ভাগ সখার ১৭০ পৃষ্ঠা দেখিবেন।

সমালোচনা।

শিশুরঞ্জন রামায়ণ।—শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য।০ আনা।

এই পুস্তকখানি অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদের জন্য লিখিত হইয়াছে। সহজ ভাষায় ও অল্প কথায় নবকৃষ্ণ বাবু রামায়ণের প্রায় সমস্ত বিষয়ই ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই পুস্তকের ভাষা যেমন সহজ, কবিতা গুলিও তেমনি মিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক বালক বালিকাকেই এই পুস্তকখানি পড়িতে আমরা অনুরোধ করি।

নবকৃষ্ণ বাবু আমাদের সখার একজন লেখক; সুতরাং ইঁহার বইয়ের বিশেষ প্রশংসা করা আমাদের পক্ষে ভাল দেখায় না। বই খানা পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন, ইহা কেমন সুন্দর হইয়াছে।

ধাঁধা।

১। তিন বর্ণে মর্ত্তে কভু করি বিচরণ।
কভু শূন্যে গতি, স্থির নাহিক কখন॥
দ্বিতীয় তৃতীয় মোর এক সঙ্গে নিলে।
কণ্ঠমালা হয়ে তব শোভিব গলে॥
আদি অন্তে মিলাইলে হ'য়ে যাব জল।
আমি কে বল ত শিশু? মনে করি বল॥

২। র্ডরিলণপ—ইনি ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইহার সময় মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন উঠিয়া যায়। ইনি ভারতবাসীকে খুব ভাল বাসে না।

৩। আছাড় দিলে ভাঙ্গে না,
টিপের ভর সয় না।

বল ত কি?

সখা

নবম ভাগ। ২য় সংখ্যা।

ফেব্রুয়ারী, ১৮৯১।

বিবিধ।
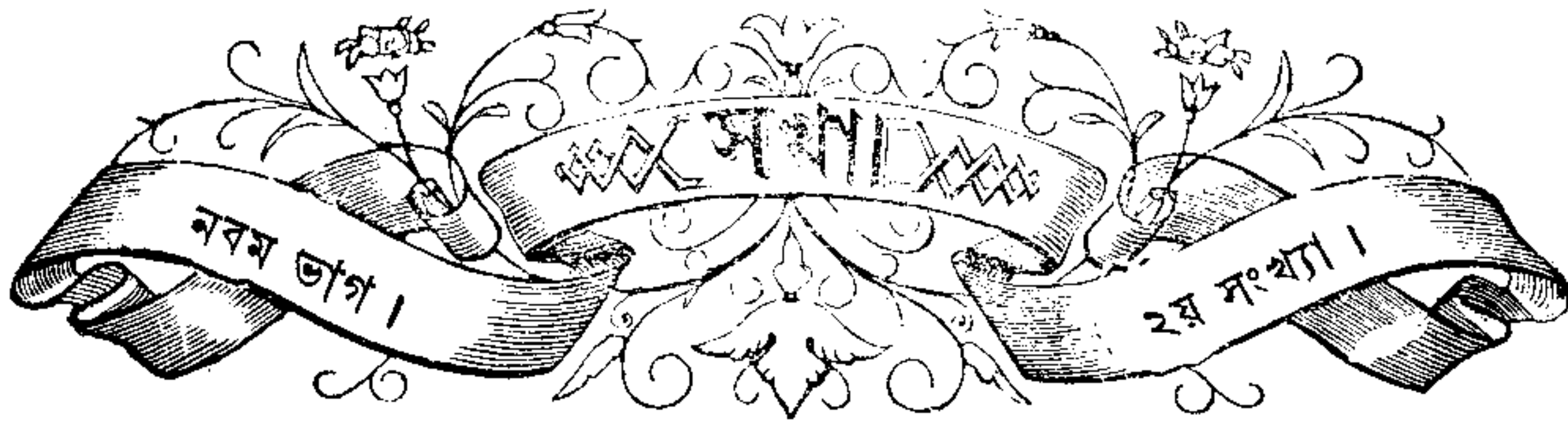
অর্দ্ধোদয় যোগ।—এ বৎসর এক মহা ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। এ অনুষ্ঠানের নাম অর্দ্ধোদয় যোগ-স্নান। পৌষ কিংবা মাঘের অমাবস্যা যদি রবি ও সোমবারে পতিত হয়,এবং তাহাতে শ্রাবণা নক্ষত্রের সংযোগ হয়; তবেই এই যোগের উৎপত্তি হয়। এবার তাই হইয়াছিল। সচরাচর এই যোগ হয় না,—২৭ বৎসর পর নাকি এবার এই যোগের সংযোগ হইয়াছিল। এই যোগ উপলক্ষে গঙ্গাতে স্নান করিতে এবার কলিকাতাতে অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল,—কাশী হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্ব স্থানেই গঙ্গার উভয়তীরে প্রধান প্রধান জনপদে অনেক লোক সমাগম হইয়াছিল। কলিকাতাতে এরূপ যাত্রী সমাগম বোধ হয় অনেকেই দেখেন নাই; এরূপ মড়কও বোধ হয় বড় দেখা যায় নাই। মিউনিসিপালিটী, ভবানীপুর ও কালীঘাটে যতদূর সম্ভব সতর্কতা নিয়াছিলেন, তথাপি যাত্রীদের মধ্যে ওলাউঠাতে অনেকে মারা পড়িয়াছে। ৮ই ফেব্রুয়ারি হইতে ১৪ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে কলিকাতা, কালীঘাট ও ভবানীপুরে ৫৩৮ জনের এই রোগে মৃত্যু হইয়াছে। তাহাদের প্রায় সকলেই যাত্রী,—অপর লোক অতি অল্প।

* *
*

সৎসাহস।—বাবু পার্ব্বতী শঙ্কর রায় ঢাকার অন্তর্গত তেঁওতার জনৈক জমীদার। অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষে ইনিও গঙ্গায় স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। ইডেন বাগানের নিকটে যাত্রীদের স্নান করিবার ঘাটে পার্ব্বতী বাবু একখানি নৌকায় ছিলেন। একটী স্ত্রীলোক স্নান করিবার সময় লোকের ভিড়ে হঠাৎ অধিক জলে গিয়া পড়ে, সে সাঁতার কাটিতে জানিত না। যাই অধিক জলে গিয়া পড়িল অমনি দুই হাত তুলিয়া লোকের সাহায্য ভিক্ষা করিতে লাগিল। ঘাটেতে পুরুষ স্ত্রী অনেক ছিল, পুলিসের লোকও ছিল; কিন্তু কেহই স্ত্রীলোকটীকে জল হইতে উঠাইতে অগ্রসর হইল না। পার্ব্বতী বাবু যাই এই স্ত্রীলোকটীর কথা শুনিলেন, অমনি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন এবং অনেক কষ্টে তাহাকে চুলে ধরিয়া উপরে উঠাইলেন। যখন তাহাকে উপরে উঠান হইল, তখন সে সংজ্ঞাহীন ছিল। অনেক শুশ্রূষার পর তাহার সংজ্ঞা লাভ হইল।

* *
*

আগর চাঁদ সোত্তকার।—ইঁহার বাড়ী মান্দ্রাজ প্রদেশে। এ ব্যক্তি অতি দরিদ্র ছিলেন। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে উদরান্নের জন্য অন্য এক স্বজাতীয়ের বাড়ীতে ভারির কার্য্য আরম্ভ করেন,—তাহার পর আর এক জনের নিকট গোমস্তা হন। শেষের কাজে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া, স্বাধীনভাবে দাদন আরম্ভ করেন। দাদনে ক্রমে ক্রমে তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১৩লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া তিনি ৫২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

* *
*

উড়িবার কল।—লাহোরের ট্রিবিউন বলেন যে, জনৈক জাপানী কলের সাহায্যে উড়িবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই কলের ৬টী পাখা আছে, বৃহত্তমটী ১০ ফিট এবং ক্ষুদ্রতমটী ৩ ফিট। কলের মধ্যস্থিত একটী চাকা ঘুরাইলে পক্ষীর ডানার ন্যায় এই পাখাগুলি কাজ করে। কতকটা উপরে উঠিলে চাকাটীর সাহায্য ব্যতীতও যে কোন দিকে গমনাগমন করা যায়।

* *
*

বৃদ্ধ স্ত্রীলোক।—ফ্রাঙ্ক মারগারেট ক্রেটসিকের বাড়ী ভিয়ানাতে। বর্ত্তমানে ইহাঁর বয়স ১১৬ বৎসর। ইনি এখনও বেশ কর্ম্মঠ, নিজ হস্তেই আপন গৃহ ও অন্যান্য জিনিষপত্র পরিস্কার করেন। আগন্তুকদিগকে পুরাতন সুন্দর সুন্দর গল্প শুনাইয়া পরিতৃপ্ত করেন। টাঙ্গাইলে আর একটী স্ত্রীলোক ১২৮ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। মানুষ ইহা অপেক্ষা অধিক বয়স পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে, আমরা বড় শুনি নাই।

* *
*

সাধু কার্য্য।—জেনারেল বুথ মুক্তিফৌজের নেতা। ইংলণ্ডে জ্ঞান-ধর্ম্ম-বিরহিত পশুবৎ যে সকল ইংরাজ আছে, ইনি তাহাদের উদ্ধারের জন্য কায়োমনে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি স্থানে স্থানে বৃহৎ বাড়ী প্রস্তুত করিয়া এই শ্রেণীর ইংরাজদিগকে খাটাইতেছেন এবং ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন। এই কার্য্যের জন্য বুথ মহোদয় ১০,০০০,০০০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। সাধু সংকল্পে সাধুরা অজস্র অর্থ দান করিতেছেন। এই কাজ শেষ হইলে জেনারেল মহাশয় কয়েদ-খালাসীদিগের জন্য বাড়ী প্রস্তুত করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। এই সংকল্পের দরুণ এ পর্য্যন্ত ১০,০০০ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। এই বাড়ীগুলিতে কারামুক্ত ব্যক্তিদিগকে স্থান দেওয়া হইবে। যে পর্য্যন্ত তাহাদের আত্মার সর্ব্বাঙ্গিন উন্নতি না হয় ততদিন কয়েদ-খালাসীদিগকে সেই বাড়ীতে রাখিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইবে। এই বাড়ীর সংলগ্ন গোলা বাড়ীতে গিয়া ইহাদিগকে রীতিমত কাজকর্ম্ম করিতে হইবে। ধন্য সাধু চেষ্টা!

আদব কায়দা।

দেশ ভেদে আদব কায়দার কত প্রভেদ হয়! আবার একস্থানেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের ভিতরে এ বিষয়ে কত মতভেদ দেখা যায়। গল্প আছে যে, একবার অতিশয় নিম্নশ্রেণীর একজন

লোক লেখা পড়া শিখিয়া বড় লোক হইয়াছিল। তাহার বড়ই ইচ্ছা হইল যে, স্বজাতীয় লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়িত করিবে। আয়োজন অনেক হইল; সমাদরের সীমা নাই। ইহাতে কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। তাহারা সহজ-বুদ্ধি লোক। তাহারা যখন দেখিল যে, যে সকল কথা বলিয়া দশ জায়গায় নিমন্ত্রণের সময় তাহাদিগকে আদর করে, যে সকল জিনিস চিরকাল ঐরূপ স্থলে তাহারা খাইয়া থাকে, এ জায়গায় তাহার কিছুই নাই; তখন তাহাদের বড়ই বেখাপ্পা বোধ হইতে লাগিল। তাহারা বলিল, "এরা আদব কায়দা কিছু জানে না, এখানে খাওয়া হবে না"—এই বলিয়া সকলে যাইতে উদ্যত হইল। বাড়ীর কর্ত্তা ইহাতে বড়ই ব্যস্ত হইলেন, কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। এই সময়ে একজন বুদ্ধিমাম্ ব্যক্তি বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই, আমি সব করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া তিনি "আপনি" "মহাশয়" ইত্যাদি সম্ভ্রমার্থক শব্দ পরিত্যাগ করিয়া "তুই" "তোরা" ইত্যাদি শব্দে তাহাদিগকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন। বসিতে আসন দেওয়া হইয়াছিল, সে সব তুলিয়া ফেলিলেন। লুচির পরিবর্ত্তে মোটাভাত, শুকনো মাছ আর লঙ্কার চচ্চড়ি, আর কিঞ্চিৎ দধির যোগাড় করিলেন। নিমন্ত্রিতগণ অমনি মহানন্দে কোলাহল করিয়া খাইতে বসিয়া গেল।

পথে দেখা হইলে, ভক্তিভরে কাহারও পায়ের ধূলা নিই, কাহাকে একটী "কুড়ুলে" নমস্কার করিয়াই যথেষ্ট মান্য হইয়াছে মনে করি; আবার কোন অল্পভাগ্য লোককে কেবল মাত্র দন্তপংক্তি দেখাইয়া বিদায় দিই।

ফ্রান্স্ দেশে ভদ্রলোকে ভদ্রলোকে দেখা হইলে, অনেক স্থলে পরস্পরকে চুম্বন করিবার রীতি আছে। একজন ফরাসী একবার তাঁহার এক ইংরাজ বন্ধুকে দেখিতে গেলেন। ফরাসী আসিয়াছেন শুনিয়াই ইংরাজ তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে গিয়া মুখময় সাবান মাখিয়া আসিলেন। ফরাসীকে অগত্যা বন্ধুর টাক পড়া তালুতে চুম্বন করিয়া ভদ্রতা রক্ষা করিতে হইল।

আফ্রিকা দেশে এক জাতীয় অসভ্য লোক আছে। তুমি যদি তাহাদের বাড়ীতে যাও, আর যদি গৃহস্বামী তোমাকে যৎপরোনাস্তি সমাদর করিতে ইচ্ছা করেন, তবে চাকরকে দুই বাটী রং আনিতে বলিবেন,—এক বাটীতে শাদা রং অপর বাটীতে কালো রং। রং আসিলেই তিনি তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয়া যত্নের সহিত মুখে মাখিতে থাকিবেন। তুমিও যদি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ না কর, তবে তোমাকে ভারী অসভ্য, আদব কায়দা বিহীন জংলী জানোয়ার মনে করিবেন।

একবার একজন বড় ইংরাজ কোন অসভ্য জাতির সহিত সন্ধি করিতে গিয়াছিলেন। সেই জাতির দলপতির দরবারে সাহেবকে লইয়া যাওয়া হইল। দলপতি পরম সমাদরে গাত্রোত্থান করিয়া সাহেবকে অভ্যর্থনা করিলেন। সাহেবও অবিকল সেইরূপ অঙ্গভঙ্গী করিয়া প্রতি নমস্কার জানাইলেন। নিকটস্থ হইলে দলপতি সস্নেহে সাহেবের হাতখানি টানিয়া লইলেন, এবং ধীরে ধীরে তাহার ঠিক মধ্যস্থলে অতি সুন্দর এক বিন্দু থুথু ফেলিলেন। সাহেবের অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু পাছে অসভ্যতা হয়, তাই বাহিক কিছু প্রকাশ করিলেন না। দলপতি নিবৃত্ত হইবামাত্রই সাহেব তাঁহার হাতখানি টানিয়া লইয়া নূতন শিক্ষিত প্রণালী অনুসারে যথাসাধ্য সদ্ভাব জ্ঞাপন করিলেন। সাহেবের এই ব্যবহারে উপস্থিত সকলেই যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং সন্ধি হইতে আর কোন গোল হইল না।

মহামতি ব্রাড্‌ল সাহেব।
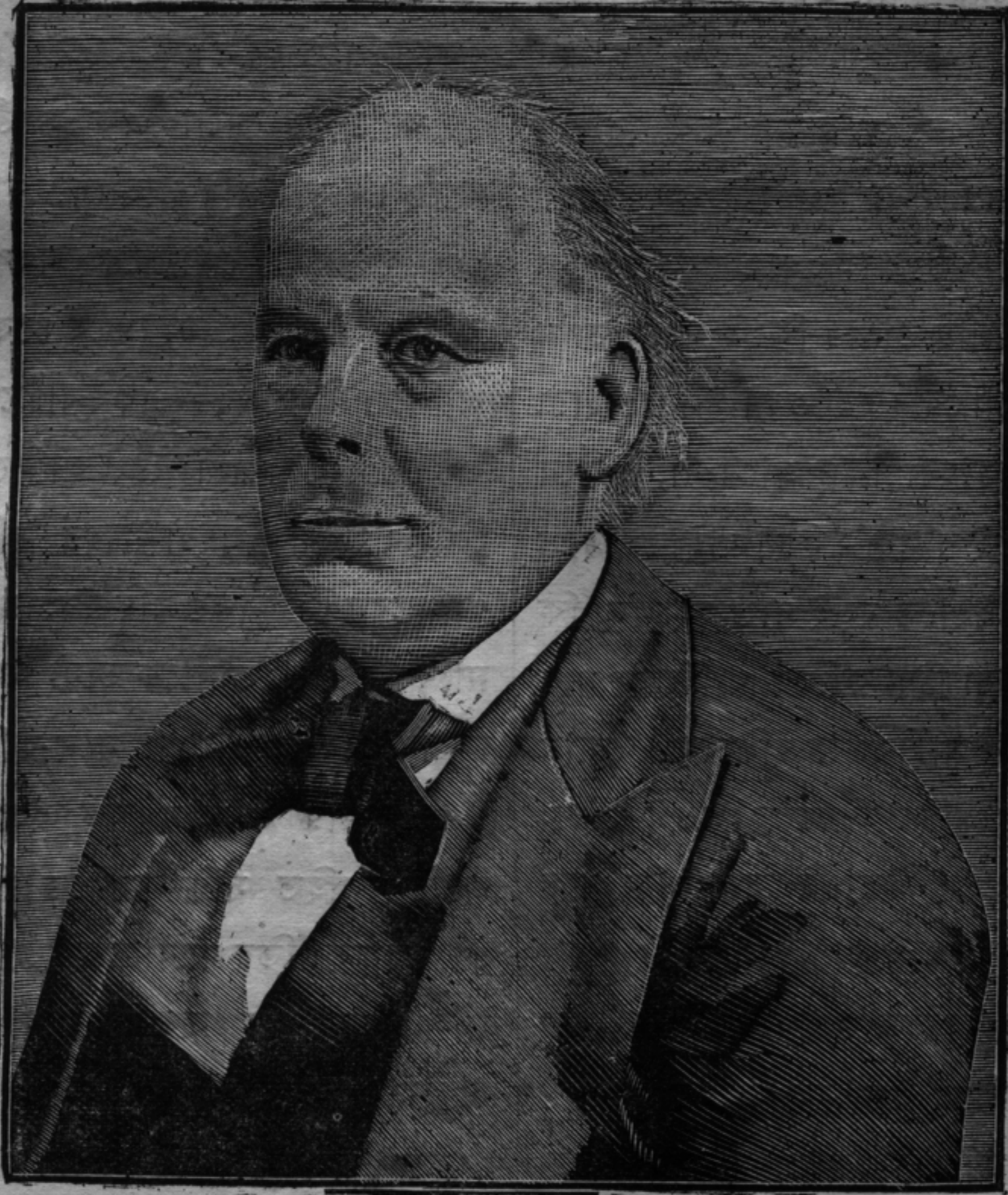
মহামতি ব্রাড্‌ল সাহেবের নাম, বোধ হয়, তোমাদের অনেকেই জান; যাঁহারা সংবাদ-পত্র পাঠ করেন, তাঁহারাই তাঁহার কথা জানেন। তিনি ভারতের একজন হিতৈষী বন্ধু ছিলেন,—ইংরেজ জাতির মধ্যে একমাত্র মহাত্মা ফসেট সাহেব ব্যতীত, ভারতবর্ষবাসীদের কল্যাণের জন্য তাঁহার ন্যায় অক্লান্ত ভাবে প্রাণ মন দিয়া আর কেহই খাটেন নাই। কিন্তু ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য, তিনি বিগত ৩০এ জানুয়ারি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এবার ইংলণ্ডে দারুণ শীত পড়িয়াছিল। এই শীতের প্রকোপে তাঁহার ফুসফুসের পীড়া হয়,—সেই পীড়াতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহাকে হারাইয়া সমগ্র ভারত যুড়িয়া হাহাকার পড়িয়াছে। তিনি ভারতবাসীর বন্ধু ছিলেন বলিয়াই তাঁহার স্মৃতি যে আমাদের আদরের জিনিস, তাহা নহে; তাঁহার ঘটনাপূর্ণ জীবনে অনেক শিক্ষনীয় বিষয় আছে। তাঁহার সেই শিক্ষাপ্রদ জীবন-চরিত সংক্ষেপে তোমাদিগকে উপহার দিব, ভাবিয়াছি।

ইংরেজী ১৮৩৩ সালের ২৮এ সেপ্টেম্বর তারিখে চারল্‌স্ ব্রাড্‌ল এক দরিদ্রের কুটীরে জন্মগ্রহণ করেন। তাহারই পূর্ব্ব দিবসে ভারতের মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায় ব্রিষ্টল নগরে পরলোক গমন করেন। একজন ভারতের কাহিনী পার্লেমেণ্টে জ্ঞাপন করিতে যাইয়া দেহপাত করিলেন, আর একজন সেই সময়ে ভারতের দুঃখ দুর্দ্দশার জন্য সংগ্রাম করিতে জন্মগ্রহণ করিলেন। বিধাতার এমনই বিধি!

ব্রাড্‌লর পিতা অতি দরিদ্র ছিলেন,—মোক্তারের মহুরীর কাজ করিতেন। কিন্তু তাহাতে যে আয় হইত, তদ্দারা তাঁহার পরিবার প্রতিপালনের ব্যয় কুলাইত না। অনেক দিন পেট পূরিয়া আহার জুটিত না। যাহার উদরান্নের সংস্থান হয় না, সন্তানের শিক্ষা দান তাহার পক্ষে একরূপ অসম্ভব। তথাপি তিনি চারল্‌স্‌কে ৭ বৎসর বয়সের সময় এক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। কিন্তু সেই বিদ্যালয়ের ব্যয় বহনে অসমর্থ হইয়া, চারল্‌স্‌কে আর এক ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ে পাঠাইলেন। ব্রাড্‌ল ৪ বৎসর কাল সেই সামান্য বিদ্যালয়ে সামান্য শিক্ষা লাভ করেন। তখন সেই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের সামান্য ব্যয় ভার বহন করাও চারল্‌সের পিতার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। ১৪ বৎসর বয়সের সময় চারল্‌স্ ব্রাড্‌ল বিদ্যালয় ছাড়িয়া, পিতা যে মোক্তারের আফিসে মহুরীর কাজ করিতেন, সেই আফিসে এক পেয়াদার কাজে নিযুক্ত হইলেন। ২ বৎসর কাল এই পেয়াদার কাজ করিয়া, ১৬ বৎসর বয়সে এক কয়লা বিক্রেতার দোকানে সামান্য বেতনে কেরাণী নিযুক্ত হইলেন।

এই কাজে থাকিয়া তাঁহার জীবনে এক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল,—এখানেই তাঁহার জীবনে উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। ১৮৪২ সালে পার্লেমেণ্টের সংস্কার জন্য ইংলণ্ডে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। ব্রাড্‌ল সারাদিন দোকানের কাজ করিয়া, অবসর সময়ে আন্দোলন সভাতে উপস্থিত হইতেন। সেই সকল সভাতে প্রদত্ত বক্তৃতাদি শুনিয়া তাঁহার ইচ্ছা হইত, তিনিও মন প্রাণ ঢালিয়া সেই আন্দোলনে যোগ দান করেন,—প্রাণের আবেগে বক্তৃতা দেন। কিন্তু নিজের মূর্খতা ও অসামর্থ্য ভাবিয়া দুঃখিত ও লজ্জিত হইতেন। কেবল দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াই তিনি নিশ্চেষ্ট হইলেন না,—সেই মুহূর্ত্ত হইতে তিনি দৃঢ় সংকল্প করিয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। কয়েক বৎসর মধ্যে তিনি আত্ম-চেষ্টায় একজন শিক্ষিত লোকের মধ্যে পরিগণিত হইলেন। আমাদের মনেও কত সময় এরূপ সদিচ্ছার উদ্রেক হইয়া থাকে, কিন্তু আমাদের কয়জন ব্রাড্‌লর-ন্যায় দৃঢ়সংকল্প হইয়া আত্মোন্নতিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন?

ব্রাড্‌ল সাহেবকে নাস্তিক বলিয়া সকলে গালাগালি দিত। কিন্তু তিনি প্রথমে নাস্তিক ছিলেন না। কোন খৃষ্ট-পুরোহিতের অন্ধ গোঁড়ামিতে তাঁহাকে ধর্ম্ম-বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল। বাল্যকালে প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মে তাঁহার গভীর বিশ্বাস ছিল। বাইবেল ও খৃষ্টধর্ম্মতত্ত্বে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার এই ধর্ম্মজ্ঞান দেখিয়া, অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগকে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য, তাঁহাকে রবিবাসরিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। ব্রাড্‌ল চিরকাল সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন,—তাঁহার মধ্যে কপটতা ছিল না। তিনি যাহা বুঝিতেন, নির্ভীক চিত্তে অসংকোচে তাহাই বলিতেন;—বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিতেন। বাইবেল পড়িতে পড়িতে একদিন তাঁহার মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়। তিনি যে গির্জ্জাতে যাইয়া ভজনা করিতেন, সেই গির্জ্জার পাদ্রিকে

তাঁহার সন্দেহের কথা জ্ঞাপন করেন। পাদ্রি তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জনের চেষ্টা না করিয়া, নাস্তিক অবিশ্বাসী বলিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বিদায় দিলেন। পাদ্রির গোঁড়ামি তাঁহাকে কেবল তিরস্কার করিয়াই থামিল না,—ব্রাড্‌লকে রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদ হইতে তাড়িত করিলেন। এদিকে ব্রাড্‌লর সন্দেহ মীমাংসিত না হইয়া দিন দিনই গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল,—অবশেষে অবিশ্বাসে পরিণত হইল। অনেকে যেরূপ আপন অবিশ্বাস গোপন রাখিয়া, নিজকে ধর্ম্মবিশ্বাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, ব্রাড্‌ল সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁহার মন মুখ এক ছিল।

কেবল রবিবাসরিক বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া পাদ্রির জিঘিংসা প্রবৃত্তি প্রশমিত হইল না। তিনি ব্রাড্‌লর পিতার নিকট যাইয়া বলিলেন,—"তোমার পুত্র নাস্তিক হইয়াছে, তাহাকে শাসন কর।" ব্রাড্‌ল যাহার চাকুরী করিতেন, তাহার দ্বারা ব্রাড্‌লকে বলাইলেন,—"তুমি যদি তিন দিন মধ্যে তোমার সন্দেহ দূর না কর, তবে তোমাকে কাজ হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া হইবে।" ব্রাড্‌ল তেমন ছেলে ছিলেন না যে তিনি তাড়নাতে বা ভয়ে তাঁহার বিশ্বাসের বিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন। তিনি যাহা বিশ্বাস করেন না, কপটচারীর ন্যায় তাহাতে তাঁহার আস্থা ও বিশ্বাস আছে বলিতে পারিলেন না। এই অপরাধে পিতা পুত্রকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, মুনিব চাকুরী হইতে জবাব দিলেন। তরুণ বয়স্ক যুবক সহায়-হীন, সম্পত্তি-হীন হইয়া সংসার-সাগরে ভাসিলেন।

ব্রাড্‌ল জীবনোপায় অর্জ্জন জন্য একটী ক্ষুদ্র কয়লার দোকান খুলিলেন। পাদ্রি সাহেবের তাহাও সহ্য হইল না। তিনি ভাবিলেন,—যন্ত্রণা দিয়া ব্রাড্‌লকে ধর্ম্মবিশ্বাসী করিবেন! এক রুটি-ওয়ালা তাঁহার দোকান হইতে কয়লা কিনিত—তাঁহাকে খুব ভাল বাসিত। পাদ্রি সেই রুটি-ওয়ালাকে যাইয়া বলিলেন,—"ব্রাড্‌ল নাস্তিক, তাহার দোকানের কয়লা কিনিও না।" দোকানি ফাঁপরে পড়িল। ব্রাড্‌লকে ভালবাসিত, সহসা জবাব দিতে পারে না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"চারল্‌স্, তুমি নাকি নাস্তিক?" ব্রাড্‌ল নিজকে নাস্তিক মনে করিতেন না,—কাজেই কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া দোকানি বলিল,—"নাস্তিকের কয়লাতে রুটি তৈয়ার করিলে তাহাতে নাস্তিকতার গন্ধ হইবে; তোমার কয়লা আর কিনিব না।" স্থূল কথা—ভয়, পাছে কেহ তাহাকেও নাস্তিক মনে করিয়া তাহার দোকানের রুটী না কিনে। পাদ্রি সাহেবের অক্লান্ত চেষ্টাতে ব্রাড্‌লর কয়লার দোকান উঠিয়া গেল। তখন তাঁহার দুর্দ্দশার এক শেষ হইয়াছিল; অনেক দিন দিনান্তে তাঁহার এক বেলা আহারও যুটিত না। পথে পথে ফিরি করিয়া সামান্য জিনিস পত্র বেচিয়া দুচার আনা যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতেই দিনপাত করিতেন। এত কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে সময় সময় বক্তৃতা করিতেন।

আর্থিক কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে তিনি সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইলেন। সৈন্যগণ মদ খাইয়া মাতলামি ও কুকার্য্য করিয়া সময় কাটাইত; তিনি অবসর সময় জ্ঞানার্জ্জনে কাটাইতেন,—পিপাসার্ত্ত হইলে চা পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতেন। তিনি ধর্ম্মবিশ্বাস হারাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহ-জীবনে কোনও দিন নীতি ও চরিত্রহীন হন নাই। সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইয়া, এত কুসংসর্গে পড়িয়াও তাঁহার চরিত্র স্খলিত হয় নাই। এই সময় তাঁহার এক আত্মীয়ের মৃত্যু হয়,—মৃত্যুকালে তিনি ব্রাড্-

লকে কিছু টাকা দিয়া যান। এই টাকা দিয়া তিনি সৈন্যদল হইতে আপনার নাম কাটাইয়া লইলেন।
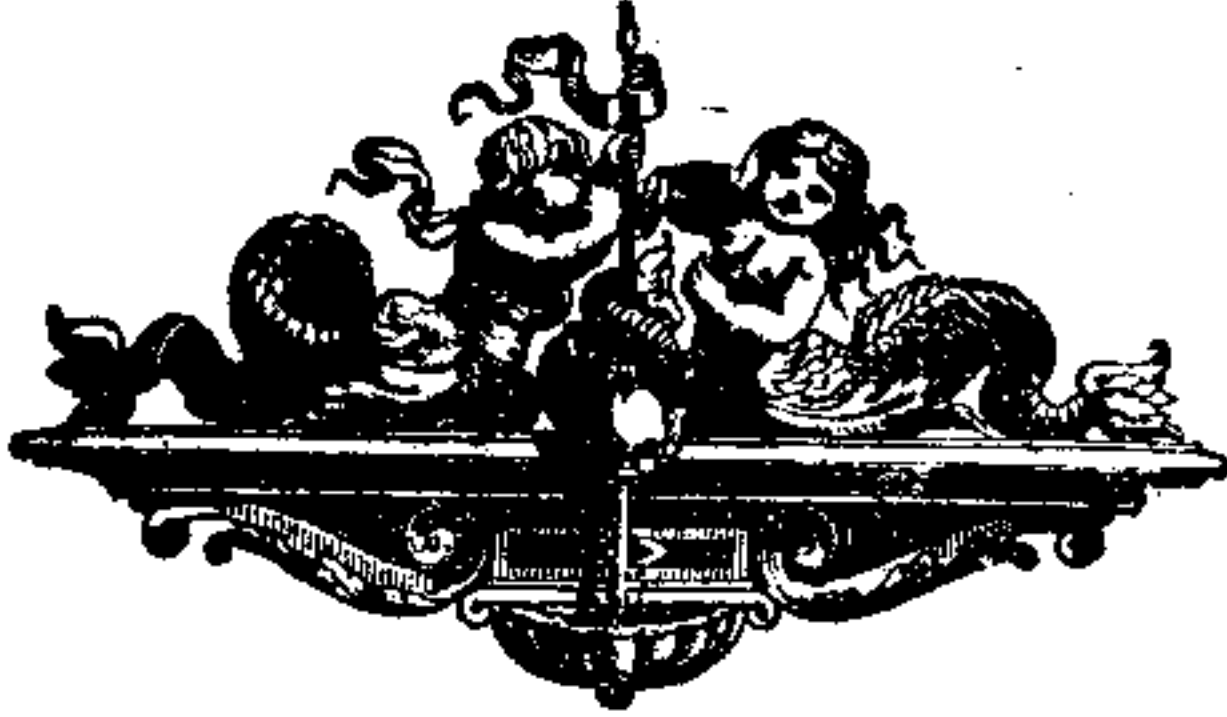
ক্রিকেট্।

(ব্যাট্‌বল খেলা।)

ত বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসের সংখ্যায় ক্রিকেট্ খেলা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতে বলিতে, আমাদের বালক বৃন্দের মধ্যে শারীরিক পরিশ্রমের অভাব দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। ক্রিকেট্ সাহেব ছেলেদের মধ্যে একটী অত্যন্ত প্রিয় খেলা। এই খেলায় সাহেবদের এত আমোদ আহ্লাদ পাইতে দেখিয়া, আমাদের দেশীয় বালকেরাও ঐ আমোদ আহ্লাদের অংশ-ভাগী হইবার জন্য অনেক বৎসর হইতে ব্যাট্‌বল খেলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক কি তাঁহারা সাহেবদের মত এই খেলায় আমোদ পাইয়াছেন? ফল দেখিয়া ত আমাদের তাহা মনে হয় না। সাহেবের ছেলেরা অল্পবয়স হইতে এই খেলা আরম্ভ করিয়া অন্ততঃ তাহাদের ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সমান উৎসাহ,—সমান কেন, ক্রমশঃ অধিকতর উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত এই খেলা খেলিয়া আমোদ আহ্লাদ পাইয়া থাকে। আমাদের ছেলেরা ১৫, ১৬ কি জোর ২০ বৎসর পর্য্যন্ত হয়ত একটু উৎসাহের সহিত ক্রিকেট্ খেলায় যোগদান করেন, তাহার পরেই আর তাঁহাদের পোষায় না। রৌদ্রে মাথা ধরে, তৃষ্ণায় বুকের ছাতি শুকাইয়া যায়;—বড় কষ্ট। ঘরের খাইয়া বনের মহিষ ফিরান কি তাঁদের ভাল দেখায়? তখন তাঁহারা আয়েস চাহেন। সুকোমল শয্যার উপর গ্রাবু খেলাইয়া, দাবাবঁড়ে টিঁপিয়া এবং অবিশ্রান্ত গুরুক ফুকিয়া বড়ই আমোদ ও সুখ পান। কিন্তু ইহার পরিণাম আমরা কি দেখিতে পাই? সাহেবরা আজীবন সুস্থ শরীরে কাটান; বাহুতে অসুরের বল ধারণ করেন; বিপদের সম্মুখে স্থির ও অটল ভাবে আত্মরক্ষা করেন। আর আমরা? বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কয়েকটী শেষ হইতে না হইতেই এক একটী যমালয়ের যাত্রী হই। যে কয়জন বাঁচিয়া থাকি,—তাহারাই বা কি? কাহারও মাথা থাকিয়াও নাই; কারণ, হয় ভারে তাহা তুলিতে পারেন না, অথবা কোন কাজ করিতে বসিলে তাহা ঘুরিতে থাকে। কেহ কেহ চক্ষু থাকিয়াও অন্ধ; কারণ, দশ হাত তফাতের বস্তু ভাল করিয়া তাঁহাদের নজরে আসে না। কাহারও পালা জ্বর, কাহারও প্রাত্যহিক জ্বর, কাহারও অম্লপিত্ত, কাহারও শূল, এই প্রকার কিছু না কিছু ব্যারাম প্রায় সকলেরই লাগিয়া আছে। বন্দুকের একটী আওয়াজ শুনিলে বুক ধরফর করিয়া উঠে; বিপদ দেখিলে হাত পা অবশ হইয়া আসে। বাঁচিয়া আমরা যে কয়জন থাকি,—নিতান্ত অকর্ম্মণ্য অপদার্থ জীবের ন্যায় জীবন বহন করি। এক প্রকার জীয়ন্তে মরিয়া থাকি। আমাদের এই ভারতবর্ষেই যাহারা শ্রমশীল এবং ব্যায়ামশীল, তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; দেখিবে, তাহারা অনেকেই সবল

ও সুস্থকায়। পাঞ্জাবী শিখদিগকে দেখিলে কাহার না চক্ষু জুড়ায়?

গত বৎসর কলিকাতাতে ক্রিকেট্ খেলায় বাঙ্গালী ছেলেদের শৈথিল্য দেখিয়া আমরা দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলাম, এবং মনে করিয়া ছিলাম এ বৎসর অনেক উন্নতি দেখিয়া সুখী হইতে পারিব। কিন্তু এবৎসর এ খেলার আরও অধিক অবনতি দেখিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু বাবু সারদারঞ্জন রায় ও বাবু বিপিনবিহারী গুপ্ত সমান উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত তাঁহাদের ছাত্র বন্ধুগণকে এই স্বাস্থ্যকর খেলাটীতে অনুরক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন; এবং এজন্য তাঁহারা সকলেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন। কিন্তু তাঁহাদের এত চেষ্টার বিশেষ কোন ফল না দেখিয়া, সময় সময় তাঁহাদের মুখে হতাশ ও নিরুৎসাহের কথা শুনিয়া, আমাদের মনঃকষ্ট পাইতে হইয়াছে। আমাদের ছেলেদের একেবারে উৎসাহ না থাকিলে তাঁহারা জোর করিয়া আর তাহাদিগকে কত উৎসাহিত করিতে পারেন। কোন এক দলের সহিত এক বাজি খেলিতে হইলে, ১১ জন ভাল লোক যুটাইতে হইলে, বাড়ী বাড়ী গিয়া খোসামুদি করিতে হয়। যেন উৎসাহদাতার পিতৃ-মাতৃদায় উপস্থিত। নিয়ম মত খেলাত এক কাজ অধিকাংশের কোষ্ঠীতেই নাই। দুই দিন খেলার স্থানে আসিলে, আর চারি দিন ঘরে বসিয়া থাকিতে হইবে, এটী যেন সকলের পক্ষে একটী অলঙ্ঘ্য নিয়ম।

এবৎসর রীতিমত ভালরূপ একটী (match) খেলাও হয় নাই। ৫।৭ দিন যাহা খেলা হইয়াছে, তাহার কোনটাতে বা সাহেব ছেলেরা জয় লাভ করিয়াছেন, আর কোনটায় বা বাঙ্গালীরা জয় লাভ করিয়াছেন। তবে ইহার অধিকাংশ গুলিতেই বাঙ্গালীরাই জয়লাভ করিয়াছেন বটে। কিন্তু ইহাও বলা উচিত হইবে যে, সাহেবদের বেশ ভাল কোন দলের সঙ্গেই এবৎসর খেলা হয় নাই। হেরিসন-সিল্ড পাইবার জন্য এবারও কোন বাঙ্গালী ছেলেরাই চেষ্টা করেন নাই। যেরূপ উৎসাহের ও চেষ্টার অভাব এখন সকলের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে শীঘ্র যে ঐ পুরস্কার পাইবার জন্য কোন বাঙ্গালী ছেলেরা চেষ্টা করিতে পারিবেন, এরূপ আমাদের আশা হয় না। বড়ই দুঃখের কথা।

ঢাকা কলেজ ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছেলেদের মধ্যে এবৎসর বড় দিনের ছুটীর সময় দুই দিবস কলিকাতার টাউন-ক্লাবের ক্রীড়াভূমিতে খেলা হয়। ছুটীর সময় বলিয়া শিবপুরের ভাল ভাল অনেক ছেলে কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন না; সুতরাং শিবপুরের ঠিক ভাল দল খেলাতে যোগ দিতে পারেন নাই। ঢাকারই জয় লাভ হইয়াছে। আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, এবার ঢাকা হইতে যাঁহারা খেলিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই খেলা দেখিয়া আমরা তুষ্ট হইতে পারি নাই। কলিকাতা প্রবাসী ঢাকার কোন কোন বন্ধুর সাহায্য না পাইলে, বোধ হয়, ঢাকা কলেজ নিশ্চয়ই হারিয়া যাইতেন। আরও দুইবার যে ঢাকা হইতে দুই দল খেলিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে বেশ ভাল খেলিতেন। সেরূপ খেলা এবার ঢাকার কাহারওই আমরা দেখিলাম না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ঢাকায়ও ক্রিকেট্ খেলার দিন দিন অবনতি হইতেছে। ঢাকার ছেলেদের অনেক দিনের একটী গৌরব, তাঁহাদের নিজের দোষে তাঁহারা হারাইতে বসিয়াছেন।

সভাবাজার ক্লাব গত বর্ষাকালে ফুট্বল খেলায় এক দল গোড়া সৈন্যকে হারাইয়া যেরূপ নাম করিয়াছিলেন, ক্রিকেট্ খেলায় সেরূপ নাম বাঙ্গালী ছেলেদের মধ্যে কেহ করিতে পারেন নাই। সভা-

বাজার ক্লাবের সে জয়লাভের সংবাদ বিলাত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল এবং নানা খবরের কাগজে আন্দোলিত হইয়াছিল। আমরা আশা করি, আগামী ফুট্‌বল খেলার সময় সভাবাজার তাঁহাদের প্রশংসা দেশ বিদেশে আরও অধিক বিস্তারিত করিতে পারিবেন। তাঁহাদের মধ্যে অন্যান্য ক্লাব অপেক্ষা অধিক উৎসাহ ও চেষ্টা দেখিয়া অনেকে আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। আশা করি, তাঁহাদের চেষ্টা ও উদ্যম শীঘ্র শিথিল হইবে না।

গত বৎসর হইতে শীতকালে খুল্‌নাতে একটী প্রদর্শনী-মেলার মত হইতেছে। এবৎসরের মেলার সময় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে খুল্‌না জেলাস্থ চারিটী এণ্ট্রান্সস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে ক্রিকেট্ ম্যাচ্ (match) খেলা হইয়াছিল। ঐ খেলার একটী বিবরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। প্রথম দিবস সেনহাটী ও বাগেরহাট স্কুলের মধ্যে এবং খুল্‌না ও দৌলাতপুর স্কুলের মধ্যে দুইটী পৃথক ম্যাচ্চ (match) হয়। সেনহাটী ও বাগেরহাট স্কুলের মধ্যে যে ম্যাচ্চ হয়, তাহাতে সেনহাটী জয় লাভ করেন, এবং খুল্‌না ও দৌলাতপুরের মধ্যে, খুল্‌না জয় লাভ করেন। দ্বিতীয় দিবস খুল্‌না ও সেনহাটী স্কুলের মধ্যে ম্যাচ্চ্ হয়। এই শেষ খেলায় সেনহাটী জয় লাভ করেন। সেনহাটীর ছেলেদের ৯৪ দৌড় (runs) হয়, এবং খুল্‌নার ছেলেদের ৭০ দৌড় (runs) হয়। খেলার স্থলে প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের কমিসনর, খুল্‌নার মেজেষ্ট্রেট্ ও ডাক্তার সাহেব প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত ছিলেন। শুনিলাম, সেনহাটীর ছেলেদের খেলা দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিয়াছেন। খুল্‌নার ছাত্রদিগকে একটী সাহেব খেলা শিখাইয়াছিলেন, এবং খেলাস্থলে তিনিই তাহাদের মধ্যস্থ (Umpire) ছিলেন; সেনহাটীর ছাত্রদের পক্ষে খুল্‌না স্কুলের একটী মাষ্টার মধ্যস্থ ছিলেন। কিন্তু এই খেলা উপলক্ষে হার-জিত নিয়া পরস্পরের মধ্যে নানারূপ হাস্য বিদ্রূপ হইয়াছে শুনিয়া, আমরা বড় দুঃখিত হইয়াছি। রীতিমত যাহাকে খেলা বলে, সেরূপ খেলিতে সেনহাটীও পারেন না কিম্বা খুল্‌নাও পারেন না। অতএব এই জয়লাভে নির্বোধের ন্যায় অত্যধিক উল্লসিত না হইয়া, যাহাতে ভবিষ্যতে এই কঠিন খেলাটী রীতিমত শিখিতে পারেন, তাহার চেষ্টা সকলে করুন। এই খেলা উপলক্ষে পরস্পরের মধ্যে সৌহৃদ্যের অভাব হইতেছে দেখিলে, বড় মনঃকষ্টের কারণ হইবে। সৌহৃদ্য না হারাইয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রতিযোগিতায় হারাইতে চেষ্টা করিলেই, সুখের বিষয় হইবে। অন্যান্য জেলার স্কুলের ছেলেদের মধ্যে বৎসর বৎসর এইরূপ খেলা হইলে, সর্ব্বত্র এই খেলার অনেক উন্নতি হইবার সম্ভব।

খোস গল্প।

অগ্র পশ্চাত বিবেচনা না করিয়া অকস্মাৎ কোন কার্য্য করিলে অনেক সময়ই অপ্রতিভ, ক্ষতিগ্রস্থ ও বিপদ্গ্রস্থ হইতে হয়। এই মূল্যবান কথাটী প্রতিপন্ন করিবার জন্য নিম্নে তিনটী গল্প লিখিলাম। বালক বালিকারা তাহা পাঠ করিয়া সতর্ক হইবে আশা করি।

(১)

বর্ষাকাল। মেঘের গায়ে মেঘ মিলিয়া নীলবর্ণ নৈশ আকাশকে ঘন কৃষ্ণ বর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। তুষার-শীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া শরীর কণ্টকিত করিতেছে, টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িয়া পথ ঘাট পিচ্ছল করিয়াছে, লোক জনের গতায়াত নাই, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীকে দ্বিগুণ অন্ধকারে ডুবাইয়া দিতেছে, বর্ষার জল পাতে গ্রাম্য পুকুরগুলি ভাসিয়া গিয়াছে এবং স্রোত নির্গম পথে পুকুরের শোল, কই, মাগুর প্রভৃতি মৎস্য স্রোত বহিয়া অন্যত্র যাইতেছে। এ সময় গ্রাম্য নিষ্কর্ম্মা লোকেরা বড় ব্যতিব্যস্ত, কোন পুকুরের মাছ বাহির হইয়া যাইতেছে, তাহারা তাহার অনুসন্ধান লইতেছে এবং সুবিধা মত বিবিধ প্রকারের মৎস্য ধরিতেছে। এ হেন গভীর রাত্রে খুব জল হওয়ার পর, যখন টিপ্ টিপ্ জল হইতেছিল সেই সময়ে দুইজন গ্রাম্য যুবক মাছ ধরিবার জন্য ইহার উহার পুকুরের জল নির্গমন পথ সমূহ পরীক্ষা করিতেছিল। দুই জনে একত্র অনেকক্ষণ থাকার পর, উভয়ে পৃথক্ হইয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইল। এই দুই যুবকের মধ্যে একজন অনেক ভ্রমণের পর দেখিল যে একটী পুকুরের অনতিদূরে জঙ্গলের ধারে স্রোত বহিয়া অনেক মাছ যাইতেছে; এবং বিদ্যুতালোকে আরও দেখিতে পাইল যে অনতিদূরে যেন কে একজন স্রোতের মাছ ধরিতেছে। যুবকের মনে বিশ্বাস হইল তাহার সঙ্গীই মাছ ধরিতেছে। তখন সে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে—কেন না পদ-শব্দে পাছে মাছ ভাগিয়া যায়। ধীরে ধীরে মৃন-কল্পিত সঙ্গীর নিকট যাইয়া অস্ফুটস্বরে "কেমন ভায়া, শোল কই পাচ্ছ ত?" এই কথা বলিয়া যেমন সে অবসর হইল অমনি এক বিকট শব্দ। বিকট শব্দে বন কম্পিত হইল। যুবক ভয়ে অচেতন হইয়া সেখানে পড়িয়া গেল। কসাইদের বাড়ীর বাঘা কুকুর মহাশয় মাছ ধরিয়া খাইতেছিলেন। কুকুরটী দেখিতে বাঘের মত ছিল, তাই উহাকে বাঘা কুকুর বলিত। অকস্মাৎ নূতন রকম জানোয়ারের ফুশ ফুশ স্বর শুনিয়া তিনিও ভীত-চিত্তে বিকট শব্দ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় যুবকের প্রাণটা বাঁচিয়া গেল।

(২)

হরিপুরের গ্রাম্য বিদ্যালয়ে, এক ভীষণ প্রকৃতির শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রেরা তাহাকে বাঘা দয়াল বলিয়া ডাকিত, দয়াল বাবু হাঁক দিলে অনেক ছোট ছোট বালক কাপড় চোপড়ে মল মূত্র ত্যাগ করিত, পথে দয়াল বাবুর সঙ্গে দেখা হইলে অত্যন্ত সাহসী বালকও গতি শক্তি রহিত হইয়া পড়িত। দয়াল বাবুর মুখে খুব বড় গোপ ছিল—জানালার ফাঁক দিয়া দয়াল বাবুর গোপ দেখা গেলে বালকেরা ভয়ে নীরব হইত। কিন্তু এহেন দয়াল বাবুর একটী মহৎ দোষ ছিল, তিনি নিয়মিত সময়ে স্কুলে আসিতেন না। বারটা বাজিয়া গেলেও অনেক দিন তাঁহার আগমন হইত না।

পল্লী গ্রামের বালকদের মধ্যে দুই একজন বড় দুষ্ট বালক থাকে, দু একটী বড় ডেঁপো থাকে। তাহারা স্কুলে প্রায়ই সকলের আগে আইসে; আগে আসিয়া গোলমাল করে, এখানকার বেঞ্চ ওখানে রাখে, চেয়ার খানা উল্টাইয়া দেয়, বোর্ডে খড়ির দাগ দিয়া ভরিয়া রাখে, এবং পদ ধূলি দ্বারা বেঞ্চ, টেবল প্রভৃতি রঞ্জিত করিয়া দেয়। হরিপুর স্কুলের যে শ্রেণী দয়াল বাবু পড়ান সেই শ্রেণীতে তিন চারিটী বালক এইরূপ দুষ্ট ছিল। একদিন দয়াল বাবু এগারটা বাজিবার অনেক আগে ক্লাশে আসিয়া বসিয়াছেন। যাহারা ক্লাশে উপস্থিত ছিল, ভয়ে তাহারা চুপ করিয়া বসিয়া আছে, দয়াল বাবু

একখানা পুস্তক হাতে করিয়া বসিয়া পড়িতেছেন; এমন সময় ক্লাশের সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্ট বালক শচীন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। ক্লাশে ঢুকিতে হইলে মাষ্টার মহাশয়ের পশ্চাদ্দিক দিয়া ঢুকিতে হয়। এস্থলে একটী কথা বলিয়া রাখি। দয়াল বাবু খর্ব্বাকার, স্কুলে ধুতি চাদর পরিয়া আসেন এবং পশ্চাৎ দিক হইতে দেখিতে ঠিক সেই শ্রেণীস্থ লোকনাথের মত। শচীন্দ্র ক্লাশে প্রবেশ করিয়া দেখিল, লোকনাথ যেন মাষ্টার সাজিয়াছে—ইহা শচীন্দ্রের সহিল না; সে সবেগে দয়াল বাবুর উপর পড়িয়া "কি রে লোকা, বড় মাষ্টার সেজেছিস্" বলিয়া সজোরে এক গলাধাক্কা দিল। ক্লাশের সকলে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

(৩)

রবিবারে কলিকাতা বড় আমোদে কাটিয়া যায়। আপিস, আদালত বন্ধ, স্কুল কলেজ বন্ধ; কেরাণী বাবুরা, স্কুলের ছেলেরা সকলেই আমোদে মত্ত থাকেন। পড়া শুনা থাকে না—আপিসের কাজ থাকে না, আল্‌সে খেলাগুলি সেদিন মূর্ত্তিমতি হইয়া সর্ব্বত্র বিরাজ করেন।

এক রবিবারে কয়েকজন বন্ধু আহারান্তে তাস লইয়া গ্রাবু খেলিতেছিল। চারিজনে খেলা হইতেছিল, আর কয়েকজনে বসিয়া দেখিতেছিল। দর্শকের মধ্যের একজনের খুব ইয়ার এক হাতে খেলিতে ছিলেন। যিনি দর্শক তাহার নাম বিপিন, এবং যে খেলিতে ছিল তাহার নাম বরদা। কিছু কাল খেলা দেখার পর বিপিন কার্য্যান্তরে অন্যত্র চলিয়া গেল; অনেকক্ষণ পরে আসিয়া দেখে বরদার প্রতিপক্ষেরা কতকগুলি পাঞ্জা ছক্কা ধরিয়াছে। বিপিন বড় সুযোগ পাইল, বরদা স্থানীয়ের দুটী কাণ ধরিয়া খুব জোরে মলিয়া দিল এবং বলিল "কি রে বরদা বড় খেলা খেল্‌চিস্—যা দূর হ।" বিপিনের এই অদ্ভুত কার্য্যে সকলেই হাতে তালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। তখন বিপিনের সংজ্ঞা হইল, চাহিয়া দেখে, সে যাহার কাণ মলিয়াছে সে নিতান্ত অপরিচিত ব্যক্তি। বিপিন তখন "অবাত বিক্ষোভিত মীনাহতি রহিত গভীর জলাশয়" বৎ স্থিত। ব্যাপারটী এই, বিপিন উঠিয়া গেলে, বরদার স্থানে অপর বাসার একটী অপরিচিত লোক খেলিতে বসিয়াছিলেন।

ঊষা।

নিভেছে তারা'র বাতি,
নিভেছে চাঁদিমা খানি,
উজলি পূরবকাশ—
আসিছেন ঊষারাণী।

২

হেরিতে সে রূপ ছটা
জগৎ খুলিছে আঁখি,
মধুর মঙ্গল গীতি
পুলকে গাহিছে পাখী।

৩

লতায় লতায় হাসি
ফুটিছে কুসুম কলি,
আদর করিতে যায়
মধু মাছি আর অলি।

৪

ধীরে ধীরে সমীরণ
দিগন্তে চলিয়া যায়,
ফুলের সুবাস টুকু
জড়ায়ে রয়েছে তা'য়।

৫

শ্যামল কোমল ঘাস
পরেছে মুকুতা হার,
ঊষারাণী ভাল বেসে।
দে'ছে তারে উপহার।

৬

তরুণ রবির আলো
পড়িছে তরুর গা'য়,
সোণালী ছটায় ধরা
আমরি কি শোভা পায়!

৭

নেচে নেচে বাছুরেরা
চলিছে গাভীর সনে;
রাখাল "পাঁচনি" হাতে
গান করে আন্ মনে

৮

কৃষক ক্ষেতের কাযে
যেতেছে "বলদ" সাথে,
সরলা মেয়েটী তার
"হুকা"টী দিতেছে হাতে।

৯

মৃদুল হিল্লোলে নদী
ঢেউ খেলাইয়া যায়,
সারি সারি দাঁড়ি মাঝি
"সারি" গেয়ে তরি বা'য়

১০

ঘরে ঘরে জাগে নর
স্মরি "হরি হরি বোল"
মা' ডাকেন "যাছু মণি,
উঠ, উঠ, আঁখি খোল।"

১১

আমিও তোদের ডাকি,
ভাই, বোন, দেখ চেয়ে,
এসেছেন ঊষা দেখ,
স্বরগের কচি মেয়ে।

১২

কত কি আদর করে
আনন্দে কত কি হাসে,
কি যেন মাখা'ন মুখে
যে দেখে সে ভাল বাসে।

১৩

যে না দেখে এ মাধুরী
এই শোভা এ বাহার,
আমি ভাবি, ভবে হায়,
নয়ন বিফল তার।

১৪

তাই ডাকি, ভাই, বোন,
কে দেখিবি ছুটে আয়,
ঊষাটী মধুর, কিন্তু
পলকে ফুরায়ে যায়,

১৫

সোণামুখী ঊষা হেন,
নিতি দেখি যাঁর তরে,
প্রণমি তাঁহার পায়
প্রাণের ভকতি ভরে।

১৬

এই ভিক্ষা মাগি সেই
জগৎ-ঈশ্বর কাছে,
করি যেন তার কায,
আজি যা' করিতে আছে।

অদ্ভুত মাতৃভক্তি।

জগতের অভিধানে যদি কোন মধুর শব্দ থাকে, যে শব্দ উচ্চারণে মনে কেমন এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয় সে শব্দ 'মা'। 'মা'র ন্যায় মধুর শব্দ বুঝি আর নাই। কত পুস্তক পড়িয়াছি—কত লোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াছি—সর্ব্বত্রই 'মা' শব্দ উচ্চারণে আমাদের মনে একটী অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছে। পাঠক পাঠিকাগণ, তোমাদের নিকটও বোধ হয় এই শব্দটিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মধুর লাগে। বাস্তবিক মার ন্যায় পরমাত্মীয় জগতে আর নাই। যিনি আমাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, আমাদের চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু দেখিলে চক্ষের জলে যিনি বুক ভাসাইয়া দেন; আমাদের মুখে একটু হাসির রেখা দেখিলে যিনি আনন্দে উন্মত্তা হন; তাঁহার মত আত্মীয় আর কে হইতে পারে? এবং তাঁহার নাম মধুর কেনই বা না লাগিবে? দশ মাস দশ দিন ক্লেশে যিনি জঠোরে ধারণ করিয়াছেন; আবার আমরা ভূমিষ্ঠ হইবার পর মুহূর্ত্ত হইতেই আমাদের মুখ পানে চাহিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন, তাঁহার নাম উচ্চারণে হৃদয় আনন্দরসে কেন না আপ্লুত হইবে? পাঠক পাঠিকাগণ এরূপ সততই তোমাদের মনেও হইয়া থাকে সুতরাং এ বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। যে মা আমাদের নিকট এত আদরের ধন, সেই মায়ের প্রতি যে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহা সকলেই জানিতেছ, কাহাকেও বোধ হয় সে বিষয়ে শিখাইয়া দিতে হইবে না। আজ আমরা তোমাদের নিকট মাতৃভক্তির একটী অদ্ভুত উদাহরণ উপস্থিত করিব।

তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তঃ রোমের কথা কিছু না কিছু জান। যখন রোম উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল তখন রোমীয়দের মধ্যে দুই শ্রেণী ছিল। প্রথম শ্রেণীকে পেট্রিসীয় (জমিদার সম্প্রদায়) এবং দ্বিতীয় শ্রেণীকে প্লিবীয় (সাধারণ প্রজাবর্গ) বলিত। দেশের বড় বড় কাজ কর্ম্মের অধিকার এবং অন্যান্য সমস্ত সুবিধা পেট্রিসীয়দিগের এক রকম এক চেটিয়া ছিল। প্লিবীয়েরা নিতান্ত হেয় বলিয়া পরিগণিত ছিল, এবং রাজ্যের প্রায় কোন বিষয়েই তাহাদের হাত ছিল না। এই সময়ে রোমে একবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। পেট্রিসীয়দিগের টাকা কড়ির অভাব ছিল না; সুতরাং তাঁহাদের বিশেষ কোন কষ্ট হইল না। কিন্তু প্লিবীয়দিগের দুঃখের সীমা রহিল না। না খাইতে পাইয়া, তাহারা হাহাকার করিতে লাগিল। কয়েকদিন পরে গবর্ণমেণ্ট এই স্থির করিলেন যে, প্লিবীয়দিগের নিকট খাদ্য দ্রব্য কম দরে বিক্রয় করা হইবে; কিন্তু পেট্রিসীয়দিগের মধ্যে কাহারই ইহা সহ্য হইল না। করিয়োলেনাস্ নামক পেট্রি-

সীয় সম্প্রদায়ের একজন, প্লিবীয়েরা যাহাতে এরূপ সাহায্য না পাইতে পারে সেজন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্লিবীয়েরা দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে আবেদন করিল। বিচারে করিয়োলেনাস্ দেশ হইতে তাড়িত হইলেন।

ঘৃণায়, অপমানে এবং ক্রোধে দগ্ধ হইয়া করিয়োলেনাস্ রোমের শত্রু ভল্‌সীয়দিগের সহিত যোগ দিলেন। ভল্‌সীয়েরা তাঁহার হস্তে সৈন্যভার অর্পণ করিল। প্রতিশোধ লইবার জন্য, করিয়োলেনাস্ ভল্‌সীয় সৈন্য লইয়া রোমের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত গ্রাম নগর প্রভৃতি ধ্বংস-করতঃ একেবারে রোমের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেহই তাঁহার প্রবল গতি প্রতিরোধ করিতে পারিল না। সমস্ত রোম ভয়ে কম্পিত হইল। দেশের সমস্ত বড় এবং প্রাচীন লোক করিয়োলেনাস্‌কে ক্ষান্ত করিবার জন্য তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন টলিল না। প্রবল প্রতিহিংসায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া আছে; কেহই তাঁহার মন ফিরাইতে সক্ষম হইলেন না। হায়! করিয়োলেনাস্ বুঝি তখনও জানিতেন না যে, জগতে এমন একটী জিনিস আছে যাহা মনুষ্যের বল বিক্রম নিস্তেজ করিয়া ফেলিতে পারে। যে ভীষণ-প্রকৃতি দেশের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ও প্রবীণ ব্যক্তিদের অনুরোধে দমিত হইল না, যে কঠোর-হৃদয় জন্মভূমির ধ্বংস ও দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া একটুও দয়ার্দ্র হইল না। সেই ভীষণ-প্রকৃতি, সেই কঠোর-হৃদয় সেই মধুর ও অমৃতময় জিনিসের সংস্পর্শে একেবারে গলিয়া গেল। যখন কিছুতেই করিয়োলেনাসের দুর্দ্দমনীয় হৃদয় রোমের প্রতি সদয় হইল না, তখন সকলে তাঁহার মাতার আশ্রয় লইলেন। জননী ধীরে ধীরে পুত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পুত্র জননীকে দেখিয়া আগ্রহ সহকারে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু জননী বলিলেন,—"সাবধান পুত্র, তুমি আমার শত্রু কি মিত্র, নিশ্চয় না বলিয়া আমাকে প্রণাম করিও না।" পুত্র অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন জননী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি রোমীয় রমনী; যে ব্যক্তি রোমের শত্রু, সে তাঁহারও শত্রু; এবং পুত্রকে রোমের অনিষ্টাচরণ করিতে নিষেধ করিলেন। করিয়োলেনাস্ সমস্ত উপেক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু জননীকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন "মা, তুমি রোম রক্ষা করিলে বটে, কিন্তু তোমার পুত্রকে রক্ষা করিতে পারিলে না।"

করিয়োলেনাস্ সৈন্য লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ভল্‌সীয়েরা এই জন্য তাঁহার প্রাণদণ্ড করিল।

পাঠক পাঠিকা, এমন আশ্চর্য্য মাতৃভক্তির কথা কি তোমরা শুনিয়াছ? আশা করি, তোমরা সকলে মাতাকে এইরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিবে এবং পুত্রের উপযুক্ত কার্য্য করিয়া জগতে যশস্বী হইবে।

(বালিকাদিগের বিশেষ পৃষ্ঠা।)

ধূলা খেলা।

বিংশ বৎসর পূর্ব্বে বালিকারা লেখা পড়া ততটা করিত না—লেখা পড়া শিক্ষা করা আবশ্যক বলিয়া মনেও করিত না। খেলাতেই অধিক সময়

যাপন করিত—বন জঙ্গল হইতে শাক পাতা কুড়াইয়া আনিয়া এবং উঠানের ধূলা দিয়া নানা প্রকার অন্ন ব্যঞ্জন রাঁধিত; অন্য বাড়ীর 'সই' 'বকুল ফুল' 'গোলাপ ফুল' প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষ সহকারে সেই ধূলি-শাক-পাতার অন্ন ব্যঞ্জন খাওয়াইত। ইহাদের তখনকার কাজ কর্ম্ম কেহ গাঢ় মনোযোগের সহিত দেখিলে আশ্চর্য্য হইতেন। ঘরে মা, খুড়ীমাকে যে সকল কাজ করিতে বালিকারা দেখিয়াছে, সেই সকল কাজ তাহারা খেলার নিমন্ত্রণে ঠিক সেই ভাবে সম্পন্ন করিত। নকল করিতে বালিকারা বড়ই পটু!

বালিকারা তখন পুতুল গড়িয়া খেলিত। পুতুলের ছেলে মেয়ের বিবাহ দিত। কখন আপনার খেলার সাজির মধ্যে, এক পুতুলের পুত্রকে অন্য পুতুলের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিত, কখন বা 'বকুল ফুল' কি 'গোলাপ ফুলের' পুতুলের সঙ্গে নিজ পুতুলের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া কত জাক্ জমকের সহিত জামাই অথবা পুত্রবধূ ঘরে আনিত। তাহাদিগকে কত আদর করিত, কত বার তাহাদের মুখ চুম্বন করিত। কেহ আড়ি পাতিয়া সেই বালিকা গৃহিনীদের কার্য্য কলাপ দেখিলে আশ্চর্য্য হইতেন। বালিকারা গৃহ-কর্ত্রী হইয়াছেন।

তখন বালিকারা প্রায় ১২ মাসই নানা প্রকারের ব্রত নিয়মাদি পালন করিত; ঠাকরুণ দিদি, বা কাকী মার নিকট নীতি ও ধর্ম্মের কথা শুনিত।

এই প্রকারে ধূলা খেলিয়া এবং ব্রত নিয়মাদি পালন করিয়া বালিকারা পিতৃগৃহে শৈশবকাল সুখ স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিত।

আমাদের অনেক বালিকা পাঠিকা এই সকল কথা শুনিয়া না জানি কতই হাসিতেছে, উহাদের কতই নিন্দা করিতেছে। সত্য নয় কি?

তখনকার বালিকাদের ধূলা খেলা ও ব্রত নিয়মাদি পালন করাতে, ঠাকুর মার নিকট ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক নানা প্রকার গল্প শ্রবণে অপকার উপকার দুই ছিল। ধূলা খেলার মধ্য দিয়া তাহারা সংসারের অনেক কাজ সাধারণ ভাবে শিখিয়াছে। গৃহিনীর কার্য্যের কতকটা আভাষ তাহারা শৈশবকালেই হৃদ্‌গত করিয়াছে। ব্রত নিয়মাদি পালন করাতে, কালে চরিত্র নিয়মিত করার পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে। অপর পক্ষে লেখা পড়া না শিখিয়া যে কোন কাজই অভ্যাস করা যাউক না কেন এবং সেই কাজ যতই ভালই হউক না কেন, তাহাতে কুসংস্কার আসিয়া পড়িবেই পড়িবে—যাহা শিখিয়াছে তাহা ছাড়া সংসারে আর কিছু ভাল আছে বা হইতে পারে সহজে তাহারা বিশ্বাস করিতে পারে না; বিশ্বাস করিলেও নূতন রকমের কিছু করিতে যেন কেমন আশঙ্কা হয়, বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে। ভাল বুঝিয়াও অনেকে অনেক কাজ করেন না; ছুতো দেন "এই কাজ করিবার আর্শ আমাদের বংশে নাই।"

আজ কাল বালিকারা ঘুম থেকে উঠেই ভাইদের সঙ্গে লেখা পড়া করিতে বসে; পুস্তকের কথা নিয়া ভাইদের সঙ্গে গল্প করে, তর্ক বিতর্ক করে। এই সব দেখে কাহার না চক্ষু জুড়ায়? কাহার না মন আনন্দে নাচিয়া উঠে? সুমাতা, সুগৃনীর অঙ্কুর দেখিয়া কাহার হৃদয় না আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠে?

আহা বালিকাগণ, আমাদের এত আনন্দ যে নষ্ট হইবার মধ্যে হইল। ঐ শোন তোমাদের বিরুদ্ধে কত অভিযোগ আসিতেছে। এই সব কথা কি সত্য? সত্য না হইলে প্রতিবেশী, পিতা মাতা সকলেই বা কেন বলিবেন? তোমরা লেখা পড়া করিতেছ, পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার

করিতেছে, তাঁহারা স্বীকার করেন এবং ইহার জন্য যথেষ্ট আনন্দও প্রকাশ করেন। কিন্তু তোমরা গৃহ-কাজ আদবেই কর না, বা শিখিতেও ততটা যত্ন কর না। ধূলা খেলার সঙ্গে পূর্ব্বে যে শিক্ষা হইত, এখন তাহা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। বালিকারা আর পূর্ব্বের মত মা অথবা কাকীমার সাহায্য করে না, সুতরাং সাহায্যকারী থাকিলে যে শিক্ষা লাভ হইত তাহাও হয় না। আজ কাল অনেক বালিকাকে বিদ্যালয় ছাড়িয়াই শ্বশুরালয়ে যাইতে হয়, গৃহ-কার্য্যে ভাল জ্ঞান না থাকতে সেখানে গিয়া তাহাদিগকে বড়ই মুস্কিলে পড়িতে হয়।

বালিকাগণ, তোমরা লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-নীতি এবং গৃহ-কর্ম্মে মনোযোগ দিবে। লেখা পড়া না শিখিলে শেষোক্ত বিষয়ে উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায় না অথবা কেবলই পুস্তক মুখস্ত করিলে সংসার যাত্রা সুন্দররূপে নির্ব্বাহ না। আমাদের এসকল কথা কল্পিত নহে। আমরা দেখিয়াছি অনেক বালিকা লেখা পড়ায় খুব ভাল, কিন্তু গৃহ-কর্ম্মে বড়ই অপটু।

যাহাতে বড় হইয়া সুমাতা ও সুগৃহিনী হইতে পার, শৈশবাবস্থা হইতে সেই সকল বিষয় শিক্ষা করিবে।

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১ম নীহার।

২য় লর্ড রিপণ।

৩য় ভাত।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ধাঁধার উত্তর ঠিক হইয়াছে।

শ্রীহেরম্বনাথ চক্রবর্ত্তী। শ্রীবিনয়ভূষণ ঘোষ।
শ্রীশিরিশচন্দ্র মজুমদার। শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।
শ্রীআশুতোষ দত্ত। শ্রীমহীন্দ্রনারায়ণ দাস।
শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী। শ্রীসতীশচন্দ্র সেন।

নূতন ধাঁধা।

এলাহাবাদ হইতে বাবু নীরদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নিম্নলিখিত ধাঁধাটী পাঠাইয়াছেন।

তিন অক্ষরে নাম মোর মিষ্ট বড় খেতে
আদ্যাক্ষর ছেড়ে দিলে পড়ে ব্যঞ্জনেতে।
মধ্যাক্ষর যদি মোর ছেড়ে দেওয়া যায়
ব্রাহ্মণের এক শ্রেণী তাহাতে বুঝায়।
বল দেখি ভাই বোন কি নাম আমার ?
যখন পাইবে মোরে করিবে আহার।

সখা।
নবম ভাগ। ৩য় সংখ্যা।

মার্চ্চ, ১৮৯১।

বিবিধ।
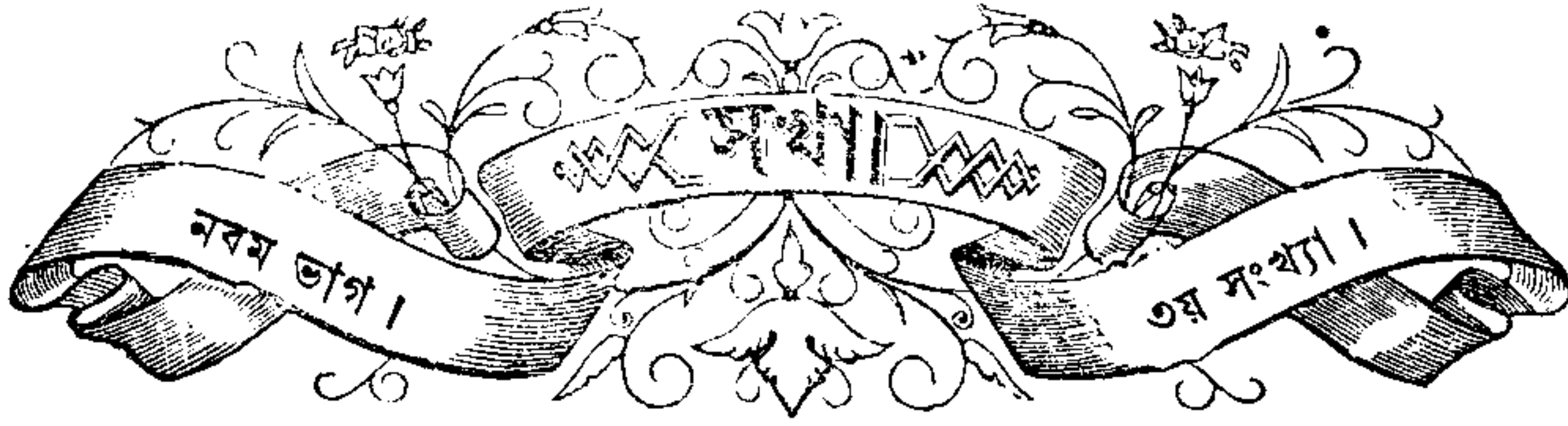
গণ্ডার শাবক।—যে গণ্ডার প্রকাণ্ড কায় ভয়ানক জন্তু, শাবকাবস্থায় তাহা দেখিতে শূকরের ছানার ন্যায় দেখায়। গণ্ডার শাবক গোবৎসের ন্যায় রব করিয়া থাকে। গণ্ডারের জিহ্বাতে তীক্ষ্ণ কণ্টকের সদৃশ এক প্রকার পদার্থ আছে। গণ্ডারী সদ্যজাত আপন শাবকের শরীর সেই জিহ্বা দ্বারা লেহন করিলে, তাহারও একপর্দ্দা চামড়া উঠিয়া যায়,—মনুষ্যের ত কথাই নাই। তাই বিধাতার এমনি বিধান, যাই গণ্ডারীর শাবক প্রসূত হয়, আর অমনি শাবক মাতা হইতে দূরে পলায়ন করে। গণ্ডারী নবজাত শাবকের দিকে ফিরিয়া তাহাকে দেখিতে না পাইয়া চারিদিকে ছুটিতে থাকে। কিন্তু শাবক এমনি স্থানে যাইয়া লুকায় যে, গণ্ডারী আর তাহার খোঁজ খবরও পায় না। মাতা সন্তানের মায়ায় প্রসব স্থানে পড়িয়া থাকে; শাবক ১০।১২ দিন পর দৃঢ়-চর্ম্ম হইয়া মাতার অন্বেষণে প্রসব-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়,—প্রসবিনীর সহিত মিলিত হয়। গোবৎসাদি প্রসূত হইলে, মাতার লেহনে সবল হয়,—আর গণ্ডার-শাবক প্রসূত হইয়াই মাতার লেহন হইতে দৌড়িয়া পালায়; নতুবা মাতৃ লেহনে তাহার প্রাণ বাঁচান ভার। কি বিধাতার কৌশল ও পালনী-শক্তি! ইহা মানব-শক্তির ধারণার অতীত। সদ্যজাত শাবক কার বলে দৌড়িয়া পালায়?—১০।১২ দিন কে তাহাকে অনাহারে বাঁচাইয়া রাখে? সর্ব্বজীবের আশ্রয়দাতা বিধাতার নিয়মেই এ সকল কার্য্য হইয়া থাকে।

*
* *

অদ্ভুত মাতৃ-ভক্তি।—চীনদেশের কোন প্রদেশে এক মাজিষ্ট্রেটের একটী যুবতী কন্যা ছিল। মাজিষ্ট্রেট কোন দরকারী কাজে মফস্বলে যান। ইতি মধ্যে তাঁহার স্ত্রীর সংকটাপন্ন পীড়া জন্মে। যুবতী মাতার সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। অবশেষে মাজিষ্ট্রেট ঘরে ফিরিলেন, তখন তাঁহার স্ত্রীর পীড়া একরূপ চিকিৎসার অতীত হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামী আসিয়া বিধিমত পত্নীর চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না,—তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। মাতার শোকে বালিকা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিল। পিতা তাহাকে বিবিধ মতে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন,—আহারের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম যুবতী পিতার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ২।৪ দিন পর পর যৎসামান্য আহারাদি করিত।

অবশেষে তাহাও ছাড়িয়া দিল। একাদি ক্রমে **৮ দিবস** জলাহার পরিত্যাগ করিয়া কন্যা মাতার শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। এই যুবতীর মাতৃ-ভক্তির কথা শুনিয়া, সেই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা চীন সম্রাটের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, তাহার সমাধি-স্থানে এক কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন। আমাদের নিকট এই ঘটনা অন্ধ মাতৃভক্তির বিকৃতি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে; কিন্তু চীনদেশের প্রথানুসারে তাহা রাজকীয় সম্মানে সম্মানিত হইয়াছে। শোকে আত্মহত্যা করা মহাপাপ; কিন্তু এই যুবতী মাতৃ-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া মাতার যেরূপ সেবা শুশ্রূষা করিয়াছে, তাহা আমাদের আদর্শ-স্থানীয় ও অনুকরনীয়।

* *
*

বঙ্গরমণীর পতিপ্রেম।—চট্টগ্রাম জেলার এক পল্লীতে এক গুরুমহাশয় ছিলেন। সেই গ্রামে একটী শাখা পোষ্টাফিশ আছে। পাঠশালার গুরু মহাশয়ই সেই পোষ্টাফিশের কাজ করিতেন। কয়েক মাস হইল, এক মনিঅর্ডারের টাকা চুরি যায়। তাঁহার উপরই সেই চুরির দায় পড়ে। বিচারে গুরুমহাশয়ের কারাদণ্ড হয়। পতির কারা দণ্ডের আদেশ শুনিয়া তাঁহার পত্নী জলগ্রহণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলেন। সতী-সাধ্বী নারী পতির অপমানে ম্রিয়মাণা হইয়া পড়িলেন, এই অপমান অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় জ্ঞান করিলেন। অবশেষে ৮।১০ দিন অনাহারের পর তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একাজ ধর্ম্ম-নীতির, রাজবিধির অনুমোদিত না হইতে পারে; কিন্তু তাহা পতিপ্রেমের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

* *
*

কুম্ভ মেলা।—এবার হিন্দু তীর্থের যুগ পড়িয়াছে। সেদিন অর্দ্ধোদয় যোগ হইয়া গিয়াছে,—আবার হরিদ্বারে কুম্ভ মেলা আরম্ভ হইয়াছে। বার বৎসর অন্তর এক একবার হরিদ্বারে এই মেলা হয়। গত মেলাতে প্রচারিত হইয়াছিল, এবারকার মেলার পর হইতে হরিদ্বারে গঙ্গার মাহাত্ম্য লোপ পাইবে। তাই এবার অন্যান্য বার অপেক্ষা অতিরিক্ত লোকের সমাগম হইয়াছে। সম্প্রতি একজন ধার্ম্মিক লোক সেই মেলা দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, ভারতের এমন প্রদেশ নাই, যেস্থান হইতে এই মেলাতে লোক আইসে নাই। আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান প্রভৃতি দেশ হইতেও হিন্দুসন্তানগণ এই তীর্থে সমাগত হইয়াছেন। মুসলমানরাজ্যে হিন্দুর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইবে না। অনেক হিন্দু ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে যাইয়া সেই সকল স্থানে বসবাস করিতেছেন। এই তীর্থে যত নাগা সৈন্ন্যাসী হিন্দু ভক্ত মহাজনের সমাগম হয়, আর কোন তীর্থে নাকি তত হয় না। মেলাস্থানে পাছে কোনও রূপ গোলযোগ ঘটে, গবর্ণমেণ্ট এই আশঙ্কায় পুলিস বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি সৈন্য পর্য্যন্ত প্রেরণ করিয়াছেন। আগামী ১২ই এপ্রিল প্রধান স্নান দিন।
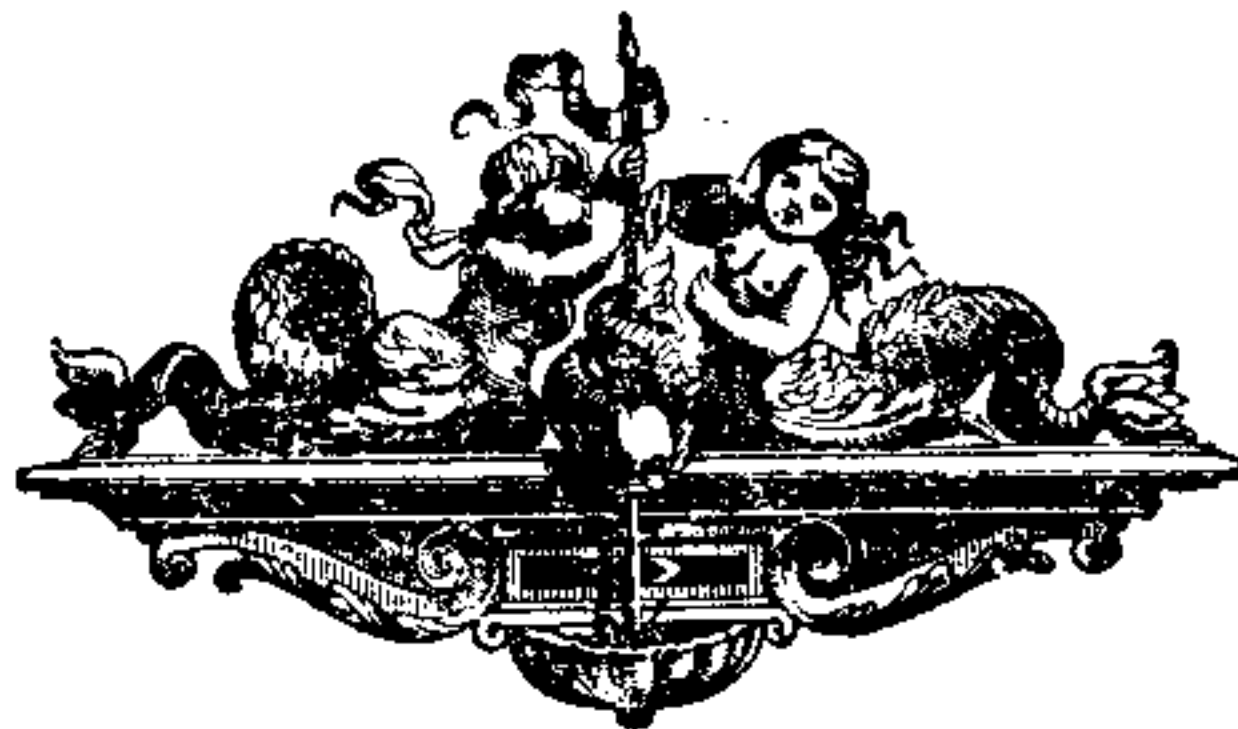
ভাইব'ন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(৬ পৃষ্ঠার পর।)

নেপালের আত্মগ্লানি।

মাঘ মাস। কলিকাতায় কয়েক দিন হাড়ভাঙ্গা শীত পড়িয়াছে। দুঃখী গরীবের বড়ই কষ্ট। জীর্ণবস্ত্রে শীর্ণ দেহখানি ঢাকা দিয়া বেচারীরা কোনমতে শীত কাটাইতেছে। এই সময় একদিন বেলার শেষে স্কুলের ছুটীর পর নেপাল ও তাহার সমপাঠী গোপাল ও ভূপাল কলেজ ষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছিল। গোপাল ও ভূপালের বাড়ী বহু-বাজারের নিকটেই; কিন্তু নেপালের বাড়ী শিমলা, হেদুয়ার পুষ্করিণীর কাছে। স্কুলে যাওয়ার সময় মুরলা মায়ের নিমিত্ত বেদানা কিনিয়া নিবার জন্য নেপালের হাতে দুইটী দু-আনি দিয়াছিলেন। গোপাল ও ভূপালের নিকট নেপাল শুনিয়া-ছিল যে, বহুবাজারের মোড়ে ভাল বেদানা পাওয়া যায়। মায়ের অসুখ বড়ই বাড়িয়াছে; আর বেশী দিন বাঁচেন কি না সন্দেহ। শেষ সময়ে তিনি বেদানা খাইতে চাহিয়াছেন। যদি ভাল বেদানা মাকে না খাওয়াইতে পারে তাহা হইলে তাহার মনে বড়ই দুঃখ থাকিবে; তাই গোপাল ও ভূপালের কথামত নেপাল স্কুলের ছুটীর পর একেবারে বাড়ী না গিয়া বহুবাজারের এদিকে বেদানা কিনিতে আসিয়াছিল।

তিন বন্ধু নানা প্রকার গল্প করিতে করিতে বহুবাজারের মোড়ে গিয়া পৌঁছিল। রাস্তার পার্শ্বে একটী ময়রা-দোকানে বেশ ভাল খাবার তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে দেখিতে পাইয়া গোপাল, নেপাল ও ভূপালকে বলিল,—"এস ভাই, কিছু খাওয়া যাক্। বড় ক্ষিধে পেয়েছে। আমার কাছে ছ-টা পয়সা আছে; এতেই তিন জনার হবে এক রকম।" গোপালের প্রস্তাবে ভূপাল ভাল মন্দ কিছু বলিল না; কিন্তু নেপাল অসম্মতি প্রকাশ করিল। অমন ঘাটে-পথে বন্ধু-বান্ধবের খরচে মিঠাই খাইয়া আমোদ করা তাহার অভ্যাস ছিল না। কিন্তু গোপাল ছাড়িল না; ছ-পয়সার খাবার কিনিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া নেপালকে সম্মত করাইয়া তিন জনে মিলিয়া খাইল। খাবার ফুরাইয়া গেলে হাসিতে হাসিতে গোপাল বলিল,—"এতে ভাই, কিছুই হলো না। চমৎকার খাবার করেছে কিন্তু; আর কিছু হলে বেশ হ'ত। আমার কাছে আরও কয়েকটা পয়সা থাক্‌লে আরও কিছু কিনে খাওয়া যে'তো।" এই বলিয়া সে ভূপাল ও নেপালের মুখের দিকে বারবার চাহিতে লাগিল। সে চাহনিতে গোপালের সমস্ত মনের ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। নেপাল ও ভূপাল কিছু কিছু দিয়া আরও খাবার কিনিয়া তিন জনে মিলিয়া খায় ইহাই গোপালের একান্ত ইচ্ছা। একথা নেপাল সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিল। মহা সমস্যা। সে এখন কি করে। মাতার জন্য বেদানা নিতেই হবে। অথচ, এদিকেও এখন সে মহা লজ্জার মধ্যে পড়িয়াছে। গোপালের নিকট সে এখন নিতান্ত অপ্রতিভ বোধ করিতেছিল। নানা চিন্তার পর স্থির করিল যে, তাহার নিকট যে দুইটী দু-আনি আছে তাহার একটী সেই ময়রা-দোকানে খরচ করিয়া গোপালের মনরক্ষা করিবে, আর অপরটী দিয়া একটী বেদানা কিনিয়া নিয়া যাইবে। এইরূপ স্থির করিয়া একটী দু-আনি গোপালের হাতে দিল, এবং তাহা দিয়া আরও

খাবার কেনা হইলে, তিন বন্ধুতে মিলিয়া তাহা খাইল।

গোপাল একটু পেটুক ছিল। ভাল খাবার জুটিলে সহজে তাহার তৃপ্তি হইত না। এবার খাবার শেষ হইলে সে ভূপালের দিকে চাহিয়া বলিল,—"কি বল, ভাই, ভূপাল, এখন তুমিও কিছু বের কর, তাহ'লেই বেশ এক রকম হয়ে যায়।" ভূপালও একটু পেটুক ছিল বটে, কিন্তু তাহার আসলে ঠিক ছিল। গোপালের কথায় সে উত্তর করিল,—"ভাই, আমার পয়সা নাই, স্মুতরাং আমার এখন কিছু দেবারও সাধ্য নাই। আমায় মাপ কর ভাই।"

গোপাল। কেন? স্কুলে তোমার কাছেত পয়সা দেখেছিলেম? সে পয়সা কি হ'ল?

ভূপাল। সে পয়সা এখনও আছে; কিন্তু তাহা খরচ করবার আমার কোন অধিকার নাই। সে পয়সা আমার বউ-দিদীর। স্কুল হইতে যাবার সময় উল কিনে নিয়ে যাবার জন্যে তিনি উহা আমায় দিয়েছেন। উহাতে আমার কোন অধিকার নাই। আজ ঢের খাওয়া হয়েছে। চল এখন বাড়ী যাওয়া যাক্। সাম্‌নের দোকান হতে আমায় আবার উল কিনে নিতে হবে।

অতঃপর বেদানা কোথায় কিনিতে পাওয়া যায় নেপালকে দেখাইয়া দিয়া, গোপাল ও ভূপাল তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। নেপাল নিতান্ত ছেলে মানুষ হইলেও ভাল-মন্দ বেশ বুঝিত। ভূপালের শেষোক্ত কথাগুলি তাহার মনে বড়ই লাগিয়াছিল। বউ-দিদীর পয়সায় কোন অধিকার নাই বলিয়া ভূপাল তাহা খরচ করিতে পারিল না;—কিন্তু দিদী যে মায়ের নিমিত্ত বেদানা কিনিয়া নিবার জন্য পয়সা দিয়াছিলেন, তাহা খরচ করিতে নেপালের কি অধিকার ছিল? দিদীর বিনা অনুমতিতে দু-আনিটী খরচ করা যে অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে, তাহা নেপাল এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল এবং তজ্জন্য মনে মনে আত্মগ্লানি ভোগ করিতেছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গাড়োয়ানের সহৃদয়তা।

গোপাল ও ভূপাল চলিয়া গেলে গোপাল অনুতাপ ও আত্মগ্লানিতে ম্রিয়মাণ হইয়া ধীরে ধীরে বেদানা-বিক্রেতার দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ৫টা বাজিয়া গিয়াছে। মাঘ মাসের বেলা। সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই। স্কুলের পর নেপাল কখনও কোথায় বিলম্ব করে না; তাহা ছাড়া, তাহার মাতার পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়াছিল। আজ নেপালের এত দেরী দেখিয়া বাড়ীতে তাহার মা ও দিদী নিশ্চয়ই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। যাহাতে সত্বর বেদানা নিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারে নেপাল সেই চেষ্টা করিতে লাগিল। বেদানার দোকানের নিকট গিয়া সে দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ভাই, তোমার কাছে খুব ভাল বেদানা আছে?"

দোকানী। হাঁ, আছে। তোমার কাছে তার খুব ভাল দাম আছেত?

দোকানীর এই প্রথম উত্তরেই নেপালের মনটা কেমন দমিয়া গেল। "ভাল দাম" আর তাহার কাছে কি আছে? একটী দু-আনি এখন তাহার সম্বল। উহা হইতে অধিক মূল্য চাহিলেইত সে মহামুস্কিলে পড়িবে। মার জন্যে হয়ত বেদানা নিয়া যাইতে পারিবে না। সে দোকানীকে পুনরায়

জিজ্ঞাসা করিল,—"ভাই, একটা বেদানা কত হবে?"

দোকানী। কি রকম বেদানা তুমি চাও? বেদানত আমার দোকানে ছোট বড় অনেক রকমের আছে। কোন রকমের একটা চাও? ঐ যে দেখিতেছ উহার সকলই ভাল বেদানা। খুব ছোট একটা তিন আনার কমে হবে না। এখন তোমার ইচ্ছা হয় নেও, না হয় চলে যাও।

নেপাল। ভাই, আমার কাছে তিন আনা নাই এখন। দু-আনা আছে। দু-আনায় ছোট একটা পাওয়া যাবে না?

দোকানী। এতেই তুমি এসে "খুব ভাল বেদানা চেয়েছিলে? দু-আনার বেদানা আমার কাছে নাই। অন্য দোকানে খোঁজ। পচা টচা মিল্‌তে পারে একটা।

নেপাল। ভাই, পচা নিয়ে কি কর্‌ব? ভাল ছোট রকমেরও যদি তুমি একটা দিতে পার তাহা হলে আমার বড় উপকার হয়। ভাই, আমার মা এখন মৃত্যু-শয্যায় বেদানা খেতে চেয়েছেন। আমার কাছে আর পয়সা নাই। আজ যদি মাকে নিয়া বেদানা না দিতে পারি, তাহা হইলে আমার মন-কষ্টের এক শেষ হবে। নেপালের কথা শুনিয়া দোকানীর মন একটু ভিজিল। স্তূপাকার বেদানা-গুলি হাতড়াইয়া ছোট একটী বেদানা নেপালের হস্তে দিয়া বলিল,—"নেও, এইটী আমার নিজের লোকসান ক'রে দু-আনায় তোমায় দিচ্ছি। দেও, পয়সা দেও।"

দু-আনিটী নেপালের পকেটের মধ্যে ছিল। পকেট হইতে উহা বাহির করিতে গিয়া নেপাল দেখিতে পাইল যে পকেট শূন্য। তখন তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। পকেটের একপার্শ্বের একস্থানে যে একটু ছিড়িয়া গিয়াছিল, নেপাল তাহা দেখিতে পায় নাই। সেই ছিদ্র দিয়া দু-আনিটী কোথায় পড়িয়া গিয়াছিল। দু-আনিটী না পাইয়া নেপাল এখন দোকানীর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া বলিল,—"ভাই, আমার পকেটে একটী দু-আনি ছিল, কোথায় পড়ে গেছে।" দোকানীর সে কথায় প্রত্যয় হইল না। সে নেপালের হস্ত হইতে বেদানাটী কাড়িয়া নিয়া তাহাকে একটা ধাক্কা দিয়া দূরে সরাইয়া দিয়া বলিল,—"তবে, এখন বাড়ীমুখো হও। ছোড়াটা চোর নাকি?" নির্দ্দয় দোকানীর ঐ কটূক্তি গুলি নেপালের প্রাণে যেন এক একটী শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইল। সে লজ্জায় ও ঘৃণায় মরিয়া গেল। কিন্তু এই লজ্জা ঘৃণা হইতেও কষ্টকর আর এক চিন্তা তাহার মনে এখন উপস্থিত হইল। বাড়ীতে যখন সে খালি হাতে ফিরিয়া যাবে, তখন তাহার দিদী ও মা কি মনে করিবেন? মা যদি আর না বাঁচেন, তাহা হইলেত আর বেদানা খাওয়ান হইল না। আজকার একথা তাহা হইলে চিরকাল তাহার প্রাণে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া থাকিবে। নেপাল আর আত্ম-সংযম করিতে পারিল না। তাহার দুই চক্ষু দিয়া অবিরল অশ্রু বহিতে লাগিল। রাস্তার একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সেই দোকানের সম্মুখে এক খানি ঠিকা গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। ঐ গাড়ীর গাড়োয়ান নেপাল ও বেদানা-বিক্রেতার মধ্যে যে যে কথা হইয়াছিল সমস্তই শুনিয়াছিল। গাড়োয়ান ইতর লোক হইলেও তাহার হৃদয় ছিল। নেপালের নিকট গিয়া সে বলিল,—"ভাই, তোমার নাম কি? তুমি কাহার ছেলে?" নেপাল কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিল,—"আমার নাম নেপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। আমার পিতার নাম ৺ বামন দাস চক্রবর্ত্তী।"

গাড়োয়ান। তোমাদের বাড়ী কোথায়? হেদোর পুকুরের কাছে? তোমার ঠাকুর কি কাজ কত্তেন বল দেখি?

নেপাল। হাঁ, আমাদের বাড়ী হেদোর পুকুরের কাছে। আমার পিতা স্কুলের মাষ্টারি কত্তেন।

গাড়োয়ান। ভাই, তুমি কেঁদো না। তোমায় ও বেদানাটী আমি কিনে দিচ্ছি। তোমার ঠাকুর অনেক সময় আমার অনেক উপকার করেছেন; তাঁর কাছে অনেক ভাড়া রয়েছি। তুমি কিছু মনে করো না। আহা! তোমার মা-ঠাকুরুণ কি ব্যারামে বড় কাতর? কি ব্যারাম তাঁর ভাই? চল বেদানাটা কিনে তোমায় নিয়ে বাড়ী যাই। আমি খালি গাড়ী নিয়ে এখন যাব। তুমি আমার সঙ্গে কোচ্‌বাক্সে উঠে চল। আমার আস্তাবলও হেদোর পুকুরের কাছে।

নেপাল। ভাই, তোমার কাছে আমি কেনা রইলেম। তোমার পয়সা আমি যতশীঘ্র পারি পরিশোধ করব। তোমার আস্তাবলটী আমায় দেখিয়ে দেবে এখন।

অতঃপর গাড়োয়ান নেপালকে সেই বেদানাটী কিনিয়া দিল, এবং তাহাকে কোচ্‌বাক্সে তুলিয়া নিয়া তাহার নিকট তাহাদের বাড়ীর সমস্ত কথা শুনিতে শুনিতে গাড়ী আস্তে আস্তে হাকাইয়া লইয়া চলিল।

এদিকে বাড়ীতে মুরলা নেপালের আসিতে এত বিলম্ব দেখিয়া বড়ই উতলা হইয়াছিলেন। রাত্রি হইয়া গিয়াছে। ভয়ানক শীত পড়িয়াছে। নেপাল স্কুলের পর কোথায়ও কোন দিন দেরী করে না। আজ সে কোথায় রহিল? মুরলা অস্থির হইয়া কেবল বারম্বার দরজা খুলিয়া পথপানে চাহিতেছিলেন। নেপালের বিলম্ব দেখিয়া তাহার মাতাও বড় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। মুরলা পথ দেখিবার জন্য আর একবার সদর-দরজা খুলিয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ একখানি গাড়ী দরজায় থামিল। কোচ্‌বাক্স হইতে নেপালকে গাড়োয়ান হাত ধরিয়া নামাইয়া দিল। মুরলা—"কে, নেপাল?"—এই কথা বলিতেই নেপাল গিয়া দিদীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া ভেউ-ভেউ করিয়া কাঁদিয়া পড়িল; এবং দুই এক মিনিটের মধ্যে যতদূর সাধ্য সমস্তই দিদীকে বুঝাইয়া বলিল। গাড়োয়ানের সহৃদয়তার কথা শুনিয়া মুরলার দুই চক্ষু দিয়া অজস্র অশ্রু ঝরিতে লাগিল। গাড়োয়ানকে শত ধন্য বাদ দিয়া মুরলা হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন এবং বেদানার মূল্য নিয়া যাইবার জন্য একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন। গাড়োয়ান মূল্য নিতে সম্মত হইল না। গাড়ী হাকিয়া চলিয়া গেল। মুরলা মনে করিল "—এ আমাদের কে?"

ক্রমশঃ।

মহামতি ব্রাড্‌ল সাহেব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সৈন্যদল হইতে তাঁহার নাম খারিজ করার কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তিনি পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিয়া মাতার ভরণ পোষণ ও সেবা শুশ্রূষাতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন এক উকী-

লের আফিসের পেয়াদার কাজে নিযুক্ত হইলেন। পাঁচ মাস কাল পেয়াদার কাজ করার পর, উকীল তাঁহার সততা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহাকে আপনার কেরাণী নিযুক্ত করিলেন। সেই জিঘিংসা-পরায়ণ পাদ্রি তাঁহার উন্নতির কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়া উকীলের নিকট উপস্থিত হইলেন,—"নাস্তিক" ব্রাড্‌লকে কার্য্য হইতে বরখাস্ত করার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু উকীল পাদ্রির কথা গ্রাহ্য করিলেন না। এই ইহতে ব্রাড্‌ল শনিগ্রহরূপী পাদ্রির কবল হইতে উদ্ধার পাইলেন। এই কার্য্যে থাকিয়া তাঁহার অল্প অল্প অর্থাগম হইতে লাগিল। এই সময় তাঁহার জীবনের একজন সুখ দুঃখের ভাগিনী আসিয়া জুটিলেন,—১৮৫৪ সনে ২১ বৎসর বয়সে কুমারী হুপারের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। দিনের বেলা উকীলের কার্য্য, সন্ধ্যাকালে বক্তৃতা করিয়া রাত্রিতে অবসর সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিখিয়া তখন তিনি অল্প অল্প অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

১৮৫৫ সালে পার্লেমেণ্টে এক আইন বিধিবদ্ধের প্রস্তাব উঠে, রবিবার দিন বাইবেলের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কোন গরীব দুঃখী কোন কার্য্য করিতে পারিবে না। ইংলণ্ডের গরীব লোকেরা তাহাতে ক্ষেপিয়া উঠিয়া, হাইড পার্ক নামক ময়দানে এক সভা করে। পুলিশের সহিত তাহাতে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়। ব্রাড্‌ল সাহেব সভাতে উপস্থিত ছিলেন,—তিনি চিরকাল গরীবের বন্ধু ছিলেন। তাঁহাকে তদুপলক্ষে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। কমিশনের লোকেরা তাঁহার সাক্ষ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—"ইংলণ্ডের স্বাধীন লোক স্বাধীনভাবে সভা করিবে, পুলিসের তাহাতে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নাই।" ব্রাড্‌লর হৃদয়ের এমনি অদম্য বল ও সাহস ছিল; কষ্ট, যন্ত্রণা, রাজভয়, সমাজভয়,—কিছুতেই তাঁহার চিত্তের সাহস ও স্বাধীনতাকে দমিত করিতে পারে নাই। কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়ে,—কোনও কালে ভয়, কাপুরুষতা কাহাকে বলে, তিনি জানিতেন না। সাহস, নির্ভীকতা, স্বাধীনচিন্তা ও স্বাধীনতা তাঁহার জীবনের চির সহচর ছিল।

এতদিনে তিনি সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার প্রথম সমর পাদ্রিদের সহিত। তাঁহাদের সহিত তর্ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন—লিখিত প্রবন্ধে ও বক্তৃতাতে। অনেক পাদ্রিকে তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হইতে হইয়াছিল। একদিন এক পাদ্রি তাঁহাকে মূর্খ প্রমাণিত করার উদ্দেশে হিব্রুভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। ব্রাড্‌ল হিব্রু ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন,—তিনি হিব্রুতেই তাঁহার উত্তর দিলেন। সভাস্থ সকলে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল।

তিনি সর্ব্ব প্রথমে "ইন্‌ভেষ্টিগেটার" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হন। তারপর বেকার ও ব্রাড্‌ল উভয়ে "ন্যাসনেল রিফার্ম্মার" নামক সংবাদপত্র সম্পাদন আরম্ভ করেন। এক কাগজে দুইজনে এক সময়ে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অবশেষে স্বত্বাধিকারীগণ বেকারকে ছাড়াইয়া দিয়া একমাত্র ব্রাড্‌লকেই সম্পাদক নিযুক্ত করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন।

তিনি উইগ্যান নামক স্থানে একবার বক্তৃতা দিতে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বক্তৃতার দিনে পাদ্রিগণ আসিয়া গোলযোগ আরম্ভ করিলেন। ঘরের দরজা জানালা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন। বক্তৃতান্তে কেহ কেহ তাঁহাকে ধরিয়া প্রহার করিয়াছিল, দুই একজন গোঁড়া খৃষ্টান তাঁহার মুখে থুথু পর্য্যন্ত দিয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট আইনের বলে তাঁহার বক্তৃতা

বন্ধ করিয়া দিবেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার কাগজে গোঁড়া খৃষ্টানদের দুর্ব্যবহার ও মাজিষ্ট্রেটের কথা এরূপ তীব্র ভাষায় সমালোচনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার উপর আর কেহ কোনওরূপ অত্যাচার, উপদ্রব করিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহার শরীরে অসাধারণ শক্তি ছিল। একদিন এক স্থানে বক্তৃতা করিতে গেলে, কতকগুলি ষণ্ডা মদ খাইয়া আসিয়া গোলমাল আরম্ভ করে। তিনি প্রথমতঃ তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেন। তাহাতে তাহারা নিরস্ত না হওয়াতে, তিনি বক্তৃতামঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া ঘাড়ে ধরিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিলেন। তাঁহার শারীরিক বল দেখিয়া ষণ্ডার দল ভীত হইল।

ব্রাড্‌ল চিরকাল স্বাধীনতার বন্ধু। মহাত্মা গারিবল্‌ডি অষ্ট্রীয়ার অধীনতা হইতে মাতৃভূমি ইটালিকে স্বাধীন করার জন্য প্রাণপণ করিতেছিলেন। কিন্তু অর্থ ভাবে তিনি তাঁহার সংকল্প সিদ্ধ করিতে পারিতেছিলেন না। ব্রাড্‌ল ইটালির স্বাধীনতার সাহায্যার্থ অর্থ দান জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিলেন,—গভীর নিনাদে ইটালির উপর অষ্ট্রীয়ার অত্যাচার কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড হইতে ইটালির উদ্ধার জন্য অজস্রধারে অর্থ রাশি যাইতে লাগিল। ইটালির অধীনতা বন্ধন মুক্ত হইল। ইটালির উপর অষ্ট্রীয়ার অত্যাচার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য তিনি ইটালির নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। কতকগুলি গোপনীয় কাগজ পত্র তাঁহার হস্তগত হয়। অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট বলপূর্ব্বক তাহা হস্তগত করার চেষ্টায় ছিলেন। তিনি যে জাহাজে ছিলেন, কয়েকজন সৈন্য সেই জাহাজে আসিয়া বলিল, "ইংরেজ রাজদূত আপনাকে তীরে যাইতে বলিয়াছেন।" ইটালির ভূমি স্পর্শ করিলেই তাঁহার নিকট হইতে কাগজগুলি তাহারা কাড়িয়া লইতে পারে। ব্রাড্‌ল তাহাদের চাতুরী বুঝিতে পারিয়া, তীরে উঠিতে অস্বীকৃত হইলেন। সৈন্যেরা তাঁহার জিনিশপত্র বলপূর্ব্বক হস্তগত করার উদ্যোগ করিতেছিল। তিনি পিস্তল হস্তে জিনিসের উপর বসিয়া রহিলেন,—একজন আমেরিক আসিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ দাঁড়াইলেন। সৈন্যগণ বেগতিক দেখিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

খৃষ্টান না হইলে কেহ ইংলণ্ডের আদালতে সাক্ষ্য দিতে পারিত না। বাইবেল ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা না করিলে কেহ নালিশ করিয়া লোকের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে পারিত না। ডিরিন নামে এক খৃষ্টান ব্রাড্‌ল সাহেবের নিকট কয়েক হাজার টাকা ধারিত। সে আইনের এই সুবিধার কথা জানিয়া টাকা দিতে অস্বীকৃত হইল। ব্রাড্‌ল নালিশ করিয়া ক্রমাগত দুই আদালতে মোকদ্দমা হারিলেন। অবশেষে সর্ব্বোচ্চ আদালতে বিচার প্রার্থী হইয়া জয়ী হইলেন বটে, কিন্তু মোকদ্দমার খরচে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। এই অত্যাচার দেখিয়া পার্লেমেণ্ট এই আইন বিধিবদ্ধ করেন যে, যাহারা খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করে না, তাহারা বাইবেল স্পর্শ করিয়া শপথ না করিলেও তাহাদের কথা প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইবে। ব্রাড্‌ল সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহা হইতে এরূপ অত্যাচারের পথ রহিত হইল। তখন তিনি স্ত্রীকে শ্বশুরালয়ে, সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে রাখিয়া, নিজে সামান্যভাবে থাকিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে লাগিলেন।

আমাদের দেশে গুরু সম্প্রদায়ের লোকেরা যেরূপ শিষ্যদের নিকট হইতে বার্ষিক আদায় করিয়া থাকেন, খৃষ্ট পুরোহিতগণও আগে তদ্রূপ লোকের নিকট হইতে দক্ষিণা আদায় করিয়া ফিরিতেন। এক নূতন পাদ্রি আসিয়া ইংলণ্ডের গরীব লোক-

দের নিকট এরূপ দক্ষিণা আদায় আরম্ভ করিলেন,—আদালতের পিয়নের সাহায্যে লোকের দ্রব্য সামগ্রী ক্রোক দিতে লাগিলেন। লোকে বাজার হইতে খাদ্য সামগ্রী কিনিয়া আনিতে গেলে, পথে তাহা পর্য্যন্ত ক্রোক দিতেন। দরিদ্রের বন্ধু ব্রাড্‌ল পাদ্রির এই অত্যাচারের কথা তাঁহার কাগজে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পাদ্রি তাঁহার নামে মানহানির মোকদ্দমা আনিলেন, খবরের কাগজে ব্রাড্‌লকে গালাগালি দিতে লাগিলেন। মোকদ্দমা বিচারাধীন থাকা কালে, তাহা সংবাদ পত্রে আলোচনা করার ওজুহাতে পাদ্রি মোকদ্দমা হারিয়া গেলেন; ব্রাড্‌লকে তাঁহার এক হাজার টাকা মোকদ্দমার ব্যয় দিতে হইল। মোকদ্দমায় হারিয়া পুরোহিত বলপূর্ব্বক দক্ষিণা গ্রহণ পরিত্যাগ করিলেন।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের দক্ষিণাংশের লোকেরা আফ্রিকা হইতে মানুষ চুরি করিয়া আনিয়া দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিত। উত্তরাংশের লোকেরা তাহার প্রতিবাদ করেন। ইহাতে যুক্তরাজ্যে অন্তর্যুদ্ধ আরম্ভ হয়। দক্ষিণাংশের লোকেরা আশা করিয়াছিল, বিদেশ হইতে তাহারা সাহায্য পাইবে। কিন্তু ব্রাড্‌ল সাহেব তাহাদের নিষ্ঠুর আচরণের কথা তীব্র ভাষায় ঘোষণা করিতে লাগিলেন। অত্যাচারীদের দুরাশা সফল হইল না,—যুক্তরাজ্য হইতে দাস-ব্যবসায় উঠিয়া গেল। যুক্তরাজ্যের এই অন্তর্যুদ্ধের পর ইংলণ্ডে দুর্ভিক্ষ হয়। ব্রাড্‌ল সেই দুর্ভিক্ষে গরীবদের সাহায্য করিতে যাইয়া নিজে ঋণজালে জড়িত হইতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি গরীবের এমনি বন্ধু ছিলেন!

ক্রমশঃ।

লোভ।

রাত হ'য়েছে আধাআধি নিঝুম সকল ঠাঁই।
আঁধারেতে নাচেন সুখে তিনটি ইঁদুর তাই॥
গর্ত্ত ছেড়ে নিজের এখন, পরের ঘরে লুঠ।
চাল্‌টি হেথা, ছোলা হোথা, কাটুর-কুটুর-কুট॥
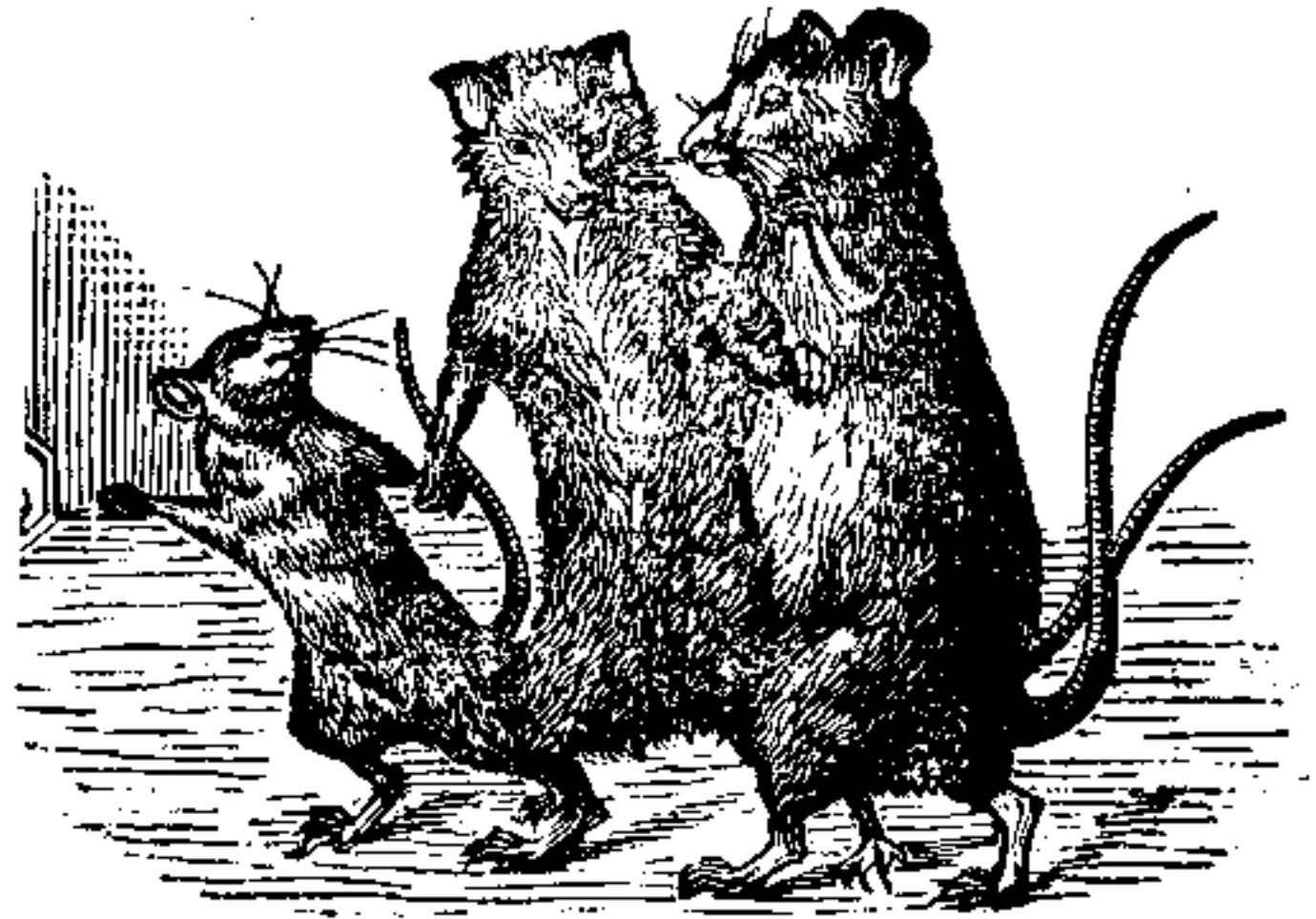
এমন সময় গন্ধ এসে লাগ্‌লো এমন নাকে।
তিনটা ইঁদুর চল্লো ছুটে খুঁজতে জিনিসটাকে॥
দেখ্‌লে গিয়ে বাক্স ভাঙা প'ড়ে ঘরের পাশে।
আ মরি! তায় খাদ্য কত, গন্ধ তারি আসে॥
তুড়ুক্ ক'রে অম্নি গিয়ে একটি তাতে ঢুকে।
খুড়ুৎ ক'রে টানটি দিলে খাবার ধ'রে মুখে॥
সুড়ুৎ ক'রে প'ড়ে গেল অম্নি কপাট তার।
বাক্স ভাঙা, লাগ্‌লো যোড়া—পথ নাইক আর॥

লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি সকল গেল দূরে।
কাঁপ্‌লো পরাণ, কলের ভিতর পথ না পেয়ে ঘুরে॥
সাম্‌নে খাবার ছোঁয় না ক আর দেখে অবাক্ বাজী।
বাহির হ'তে পার্‌লে এখন উপোস দিতে রাজি॥

একটা ইঁদুর তখন কলের বন্দীটাকে দেখে।
এক্‌টি লাফে কলের উপর উঠ্‌লো নীচে থেকে॥
জেঁকে ব'সে ভর দিয়ে সে পিছন দিকের পায়।
টান্‌চে কলের দুয়ার—দুয়ার ফাঁক হ'চ্চে তায়॥

অপর ইঁদুর কাজ কর্‌চে বড়ই চমৎকার।
কলের উপর ব'সে যেটা লেজ টান্‌চে তার॥
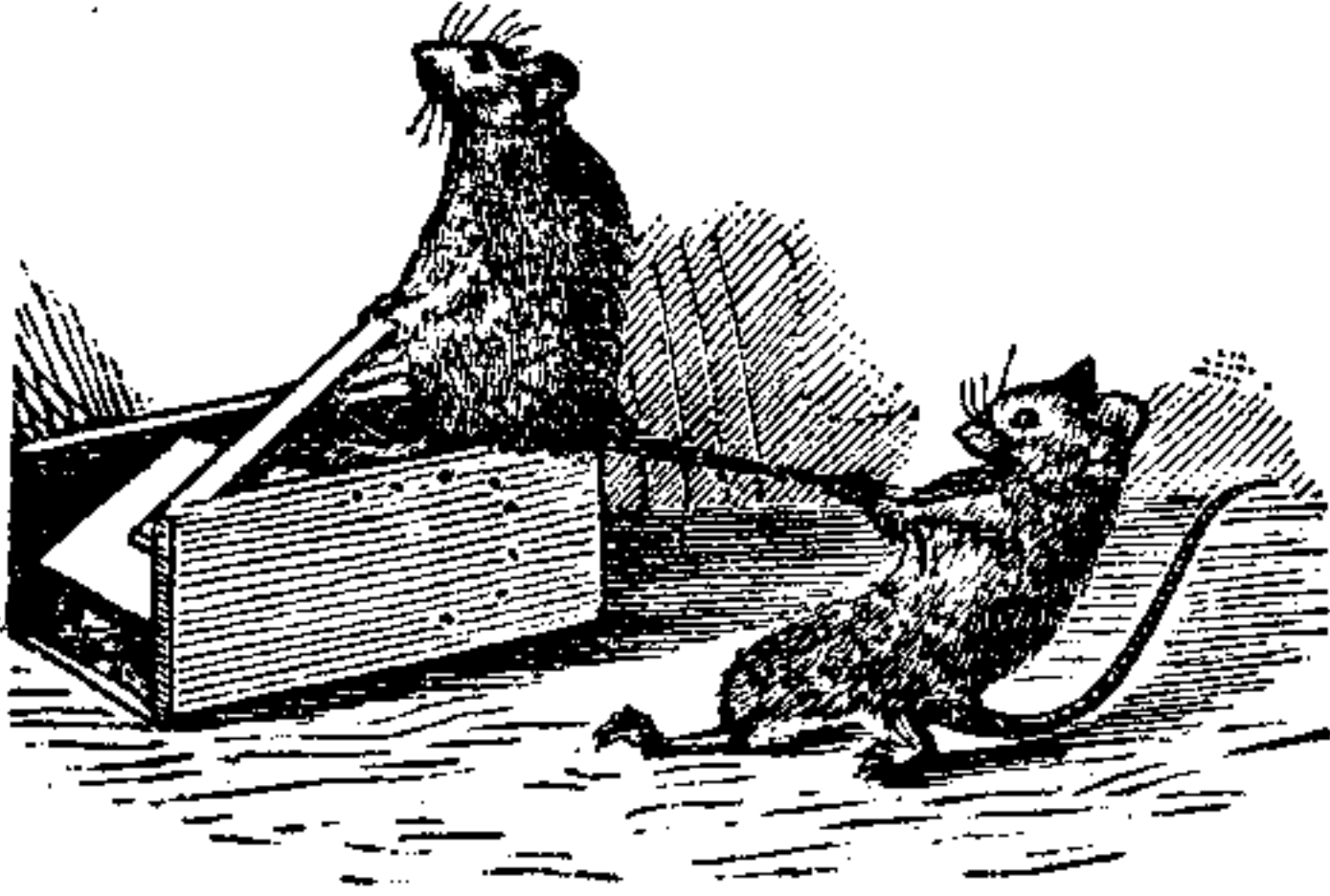
কলের দুয়ার উঁচু পানে তুল্‌চে ইঁদুর নিয়ে।
কয়েদীটা পথ খুঁজ্‌চে সেই দিকেতেই গিয়ে॥
বারেক নীচু, বারেক উঁচু, বারেক পাশে হেলে।
নাকের ডগা, নখের আগা বা'র ক'চ্চে ঠেলে॥
ভাব্‌চে থাওয়ার পায়ে সেলাম, পেলে বাঁচি পথ।
কলের কাছে আর আসি ত নাকে কাণে খত॥
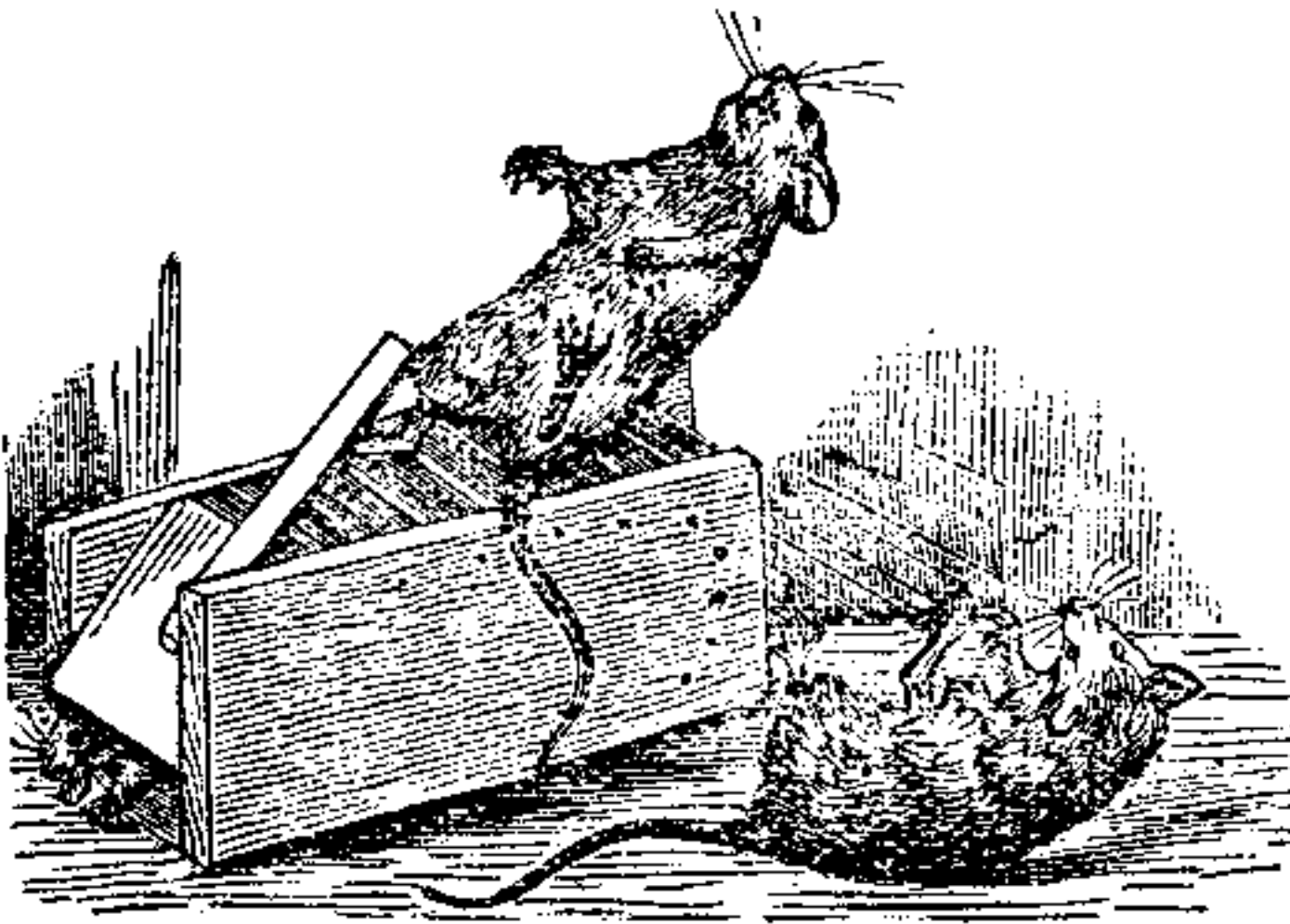
উপর থেকে টান পড়েচে আরও জোরে টান।
একেবারে খানিক স'রে গেছে কপাটখান॥
চিৎ হ'য়েছেন অম্নি প্রভু কপাট গেছে ছেড়ে।
নীচেও প্রভু চিৎ হয়েছেন, উঠ্‌ছেন গা ঝেড়ে॥

পেটের ভিতর রান্না।

তোমরা সকলেই জান, কিরূপে খাবার দ্রব্য প্রস্তুত হয়। আগুণ জল না হইলে, কোন জিনিষই পাক করা যায় না। জলের সঙ্গে দ্রব্যগুলি হাঁড়িতে দিয়া চুল্লির উপরে রাথিয়া নিম্নে আগুণ জ্বালিয়া দেয়; সেই আগুণের তাপে আস্তে আস্তে জল গরম হইয়া, কেমন টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে ফুটিতে দ্রব্যগুলিকে সিদ্ধ করিতে থাকে। যিনি পাক করেন, তিনি পাক করিতে করিতে অসার দ্রব্যগুলি পরিত্যাগ করিয়া সার জিনিষগুলি থাবার জন্য রাথিয়া দেন। আমরা সেই আহারীয় জিনিষ ক্ষুধার সময় খাইয়া, ক্ষুধার নিবৃত্তি করি। শুনিয়া অবাক্ হইবে, এই আহারীয় জিনিষগুলি পেটের ভিতর গিয়া আবার পাক হইয়া থাকে। তোমরা বলিবে সে কি কথা!! পেটের ভিতর আগুণ কোথা? জল কোথা যে পাক হইবে?—পেটের ভিতর আগুণ! এ যে অসম্ভব কথা!

আহারের কিছুকাল পরে কাহারও পেটের উপর কাণ পাতিয়া মনোযোগের সহিত শুনিলে বুঝিতে পারিবে; পেটের ভিতর রান্না আরম্ভ হইয়াছে। কেমন বুট্‌বাট পুট্‌পাট্ কুলকুল হুড়হুড় শব্দ করিয়া ভুক্ত দ্রব্যগুলি ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, চুল্লির উপর হাঁড়িতে যেমন ভাত ফুটে, সেইরূপ ফুটিতেছে। কিন্তু আহার করিবামাত্রই তাহা বুঝা যায় না। রান্না চাপাইলেই কি জিনিব ফুটিতে থাকে? কিছুক্ষণ জল নড়েও না। আস্তে আস্তে জল গরম হইয়া টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠে।

সেইরূপ আহার করিবা মাত্রই পেটের ভিতর যে পাক হয় তাহা বুঝা যায় না। এই জন্যই বলিতে-ছিলাম, আহারের কিছুকাল পরে পেটের উপর কাণ পাতিয়া শুনিলে জানা যায় যে "পেটের ভিতর রান্না" আরম্ভ হইয়াছে।

"পেটের ভিতর আগুন" তোমরা দেখিয়াছ, জ্বর রোগীর শরীর সময় সময় এত গরম হয়, যেন "ধান দিলে খৈ ফুটে"; শরীরটি আগুনে সেকিলে যেরূপ গরম হয়, ঠিক সেইরূপ গরম হইয়া থাকে। বলিতে পার এই তাপ কোথা হইতে আইসে? আমাদের পেটের ভিতর যে আগুন আছে, উহা সেই আগুনের কাজ; জ্বর কালে পেটে না থাকিয়া সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে; তাই শরীর এত গরম হয়। এই আগুন তখন পেটে না থাকায় ক্ষুধাও হয় না এবং গুরুপাক দ্রব্য আহার করিলে তাহার পরি-পাকও হয় না। তজ্জন্যই জ্বরের সময় পেটে অগ্নিমান্দ্য হয় বলিয়া, সাগু, বার্লি এবং টাট্‌কা খৈ ইত্যাদি লঘু পথ্য দেয়। অথবা একেবারেই লঙ্ঘন দেয়। আবার জ্বর কমার সঙ্গে সঙ্গে উদরাগ্নি বৃদ্ধি হয় সুতরাং ক্ষুধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আহারের পরিমাণও বাড়িয়া যায়।

আগুন কি? কতকগুলি তেজ একত্রিত হইয়া প্রকাশিত হইলেই আগুন হয়। এই তেজ সকল দ্রব্যেই অপ্রকাশিত ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। হাতে হাতে ঘর্ষণ কর, দেখিবে হাত গরম হইয়াছে। অত্যন্ত দ্রুতবেগে ঘর্ষণ কর, দেখিবে আগুনে পুড়িলে যেমন ফোস্কা পড়ে, হাতে সেইরূপ ফোস্কা পড়িয়াছে। এ ফোস্কা কেন পড়িল বলিতে পার? ইহাও আগুনের কাজ, আমাদের হাতের ভিতরে যে আগুন লুকাইয়াছিল; সেই আগুন আসিয়া হাতটিকে পোড়াইয়া দিয়াছে; তাহা তোমরা দেখিতে পাও নাই। পূর্ব্বে আমাদের দেশে বিলাতি দীপশলাকার ব্যবহার ছিল না, ঘরে ঘরে ঠুকনী পাথর ছিল। লোহার ঠুকনী দ্বারা কঠিন চকমকী পাথরে ঠুকিয়া দিলেই আগুনের ফুল্‌কী বাহির হইত, সেই ফুল্‌কী ধরিয়া লোকে আগুনের কাজ করিত। আগুন ঐ পাথরে লুকাইয়া থাকিত। দীপশলাকার ভিতরেও আগুন লুকাইয়া থাকে, সামান্য ঘর্ষণ করিলেই প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ জ্বলিয়া উঠে। যখন আগুন কোন বস্তুতে লুকাইয়া থাকে, তখনই তাহাকে তেজ বলে, আবার এই তেজ সংগৃহীত হইয়া প্রকাশ পাইলেই তাহাকে আগুন বলে, বস্তুতঃ তেজ ও আগুন একই পদার্থ। কোথাও আগুন না দেখিলে এমন মনে করিবে না যে এখানে আগুন নাই। অল্প বা অধিক পরিমাণে সেখানে আগুন তেজরূপে লুকাইয়া আছে। আমরা আগুনের এত কথা বলিলাম, পেটের আগুন কিরূপ তাহা বুঝাইবার জন্য। আগুনে শরীর পুড়িলে ফোস্কা পড়ে। অত্যন্ত উষ্ণ জল গায়ে লাগিলেও পুড়িয়া ফোস্কা পড়ে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যে গরম জলের ভিতর আগুন তেজরূপে লুকাইয়া আছে। আমাদের উদরে এই গরম জলের ন্যায় এক প্রকার তরল পদার্থ আছে, তাহাকে পিত্ত বলে, এই পিত্তই পেটে আগুনের কাজ করে; এই নিমিত্ত ইহাকেই উদরাগ্নি বা জঠরাগ্নি বলে, ইহারই প্রভাবে ভুক্ত দ্রব্যের পুনরায় পাক হয়। আহারীয় দ্রব্য উদরস্থ হইলেই তরল পিত্ত আসিয়া, তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়া, তাহাকে পাক করিতে প্রবৃত্ত হয়। যখন ভাত পাক করা হয়, তখন চাউল জল মিশাইয়া হাঁড়িতে চাপাইয়া আগুন দিয়া জ্বাল দিতে হয়। জল লঘু বলিয়া সহসা গরম হইয়া চাউলকে ফুটাইতে আরম্ভ করে, চাউল কিন্তু জলের তাপেই সিদ্ধ হইতে থাকে। সেইরূপ তরল, উষ্ণ পিত্তের তাপেই ভুক্ত কঠিন দ্রব্য সকল সিদ্ধ হয়। এ

রান্নায় জল আগুন এক সঙ্গেই থাকে। আর ভুক্ত জল দুগ্ধাদি তরল পদার্থ এবং চর্ব্বণ কালে মুখের লালা ও আহারীয় দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া পাকের সাহায্য করে। এইরূপে পেটের ভিতর রান্না হইয়া থাকে। এই রান্নায় ভুক্ত দ্রব্যের অসার অংশ মল মূত্ররূপে নির্গত হয়, আর সারাংশে শরীর গঠিত ও রক্ষিত হয়।

তোমাদের মাতা নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী রান্না করিয়া, পরম যত্নে তোমাদিগকে আহার করান; তাহাতে তোমাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। আর যিনি জগতের মাতা, তিনি সেই ভুক্ত দ্রব্যগুলিকে পুনরায় উদরাগ্নিতে পাক করেন এবং তাহার সার অংশ লইয়া, তোমাদের শরীর গঠন করেন। পৃথিবীর মাতা যেন সেই পরম মাতার আদেশে তাঁহার এই রান্নার যোগাড় করিয়া দেন আর তিনি রাঁধিয়া, সার অংশে তোমাদের শরীর গঠন ও রক্ষা করেন। কেমন আনন্দের কথা, তোমাদের রক্ষার জন্য এক মাতা যোগাড় করেন, আর এক মাতা অপূর্ব্ব কৌশলে পেটের ভিতর রান্না করেন।

এই উভয় মাতার যত্নেই তোমরা এত বড়টি হইয়াছ এবং জীবিত রহিয়াছ। এমন পরম উপকারী উভয় মাতাকেই ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত নিরন্তর সেবা করা, তোমাদের প্রত্যেক জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তোমরা কখন ভ্রমেও এই কর্ত্তব্য পালন হইতে বিচলিত হইও না।

বিধিলিপি।

পরিচয়।

দুর্গাপুর ও শিবপুর দুইটি গ্রাম। এই দুই গ্রামের মধ্যে ব্যবধান একটি ক্ষুদ্র নদী মাত্র। নদীটি না থাকিলে দুর্গাপুর ও শিবপুর এক গ্রামের এপাড়া ওপাড়া হইত। নদীটি আছে বলিয়া একটি গ্রামের নাম দুর্গাপুর ও অপরটির নাম শিবপুর হইয়াছে। নদীটির নাম হরিহর।

দুর্গাপুরের অধিকাংশ অধিবাসী কুলীন ব্রাহ্মণ, শিবপুরের অধিকাংশ লোক শ্রোত্রীয়, শুদ্ধ ও কষ্ট। উভয় গ্রামে একটি একটি "চাসা-পাড়া" আছে। চাসাদিগের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। গ্রামদ্বয়ের আর অধিক পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই।

শিবপুরে হরিমোহন রায় নামক এক ব্যক্তির বাস। হরিমোহনেরা গুড়গাঁই, সুতরাং কষ্ট শ্রোত্রীয়। রায় উপাধি তাঁহার কোন্ পুরুষ কোথা হইতে পাইয়াছিলেন, তাহার কোন নিদর্শন নাই। কিন্তু লোকের মনকষ্ট দেওয়ায় কোন ফল নাই। এই প্রবাদের বশবর্ত্তী হইয়া কেহই তাঁহাকে সে বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করা দূরে থাকুক, তাঁহার অনুপস্থিতিতেও তাহার উল্লেখ করিত না।

রায় মহাশয় এক্ষণে যুবাও নন, প্রাচীনও নন। বয়স আন্দাজ ৪৫ বৎসর। তাঁহার দুইটি পুত্র ও ৫টি কন্যা। কন্যাগুলি দেখিতে যেন পটের পুতুল; পুত্রগুলিকে যদিও কুৎসিৎ বলা যাইতে পারে না, কিন্তু তাহারা কোনক্রমেই কন্যাগুলির ন্যায় নহে।

শ্রোত্রীয়েরা কন্যাগুলিকে যদি কুলীনের ঘরে দান করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের নাম বৃদ্ধি,

মান বৃদ্ধি ও গৌরব বৃদ্ধি হয়। শুদ্ধ শ্রোত্রীয়েরা প্রায়ই এইরূপ করিয়া থাকে। কিন্তু অবস্থা সকলের সমান নহে। যাহারা দরিদ্রতা নিবন্ধন নিজ পুত্রের বিবাহ দিতে অসমর্থ, তাহারা প্রায় পরিবর্ত্ত কার্য্য করিয়া থাকে; যাহাদের সেরূপ করিবার প্রয়োজন না হয়, তাহারা বিক্রয় করিয়া থাকে। কন্যা বিক্রয় কাহাকে বলে, তাহা এই আখ্যায়িকার শেষ পর্য্যন্ত পড়িলে জানা যাইবে।

হরিমোহন রায়, একটি ভিন্ন আর সমস্ত কন্যা-গুলিকেই বিক্রয় করিয়াছিলেন। কোনটির মূল্য ৫০০৲ টাকার কম হয় নাই। পঞ্চম কন্যাটি জীর্ণ, শীর্ণ ও রুগ্ন। তাহার আর বাজারে দাম হয় না। টাকা দিয়া ক্রয় করিতে হইলে, মন্দ দ্রব্য কে কিনিতে চায়? কিন্তু দান করিলে মন্দ দ্রব্যেরও প্রার্থী পাওয়া যায়। হরিমোহন এক লাঠিতে দুই সর্প মারিবেন, এই বিবেচনায় ঘোষণা করিয়া দিলেন, এবার তিনি কন্যাকে কুলীন করিবেন।

তাঁহার ঘরের কন্যা ভাল, একথা সর্ব্বত্র বিখ্যাত। সুতরাং অনেক লোকে কন্যা দেখিতে আসিল কিন্তু কন্যার অবস্থা দেখিয়া সকলেই ফিরিয়া গেল। পরিশেষে অতি দরিদ্র এক কুলীন-কুমারের সহিত তাহার বিবাহ হইল। কন্যাকে গিয়া আর শ্বশুরের ঘরকন্না করিতে হয় নাই। বিবাহের দিন কয়েক পরেই সেটি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল।

যখন হরিমোহন কন্যাকে কুলীন করিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে এ কুপ্রথা অবলম্বন করিতে বারবার নিষেধ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "যদি কিছু না হয়, পাঁচ কুড়ী টাকাও তো পাওয়া যাবে; তোমার যে কি বড়মানুষি ভাব হয়েছে, বল্‌তে পারি না। 'আপনি বস্‌তে জায়গা পায় না, সংকরা ভাই শোবে কোথা?' তোমার যে সেই দশা ঘট্‌লো। এতদিন যে টাকা পেলে, বিষয় আশয় কিন্‌লে; বলে রেখে-ছিলে, কুসুমের (অর্থাৎ ছোট কন্যার) বিয়ে দিয়ে আমার মালা ছড়া গড়ে দেবে। এখন দাতাকর্ণ হয়ে বসে মেয়েটাকে ভিখারীর ঘরে ফেল্‌তে চাচ্ছ। ছি ছি! কুলীন-ছেলেকে দিলে লাভ কি? লাভের মধ্যে এই দেখ্‌ছি, সে গরীব মানুষ খাওয়াতে পরাতে পার্‌বে না, শেষকালে কতকগুল ছেলে পিলে নিয়ে এসে তোমার ঘাড়ে পড়বে।"

কিন্তু স্ত্রীর তিরস্কারে হরিমোহন কর্ণপাত করি-লেন না। কন্যাকে কুলীন করিলেন। রুগ্ন, জীর্ণ, শীর্ণ কন্যা অতি সত্বরই পরলোক প্রাপ্ত হইল।

কিছু দিবস পরে হরিমোহনের আর একটি কন্যা হয়। কন্যাটি ভূমিষ্ঠ হইলে ধাত্রী সকলেরি চিত্ত বিনোদন করিবার আশয়ে প্রথমে বলিল, পুত্র সন্তান হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া বাটীর সমস্ত লোকই বিষণ্ণ হইল। একটা ছেলে হলো এতকালের পর? জননীর দুঃখের শেষ রহিল না। প্রথমে সন্তানের মুখ দর্শন করিবেন না বলিলেন। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই প্রকাশ হইল, পুত্র নহে, কন্যাই হইয়াছে। তখন সকলেরি মুখ উজ্জ্বল হইল, কর্ত্তা হাসিতে লাগিলেন, গৃহিণী সন্তান কোলে লইলেন; কিন্তু ধাত্রী অবাক্ হইয়া রহিল।

এই কন্যা বিবাহ-যোগ্যা হইল। নানা স্থান হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসিতে লাগিল। হরি-মোহন কহিলেন, গতবার কন্যা বিবাহ দিয়া তিনি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার বংশে কুলক্রিয়া বরদস্ত হইবে না। যদিও একটি অর্দ্ধমৃত কন্যা বই আর কারুকে কুলীনের ঘরে দেন নাই, তথাপি লোক জনের সমক্ষে সর্ব্বদাই বলিতেন, যত কন্যা কুলীনের ঘরে দিয়াছেন, সে সমস্তই মরিয়া গিয়াছে। জানিয়া শুনিয়া তিনি আর কখনও ওরূপ কাজে থাকিবেন না। মনে মনে হরিমোহন

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন যে, উপস্থিত কন্যাটি হইতে দুইটি কন্যার মূল্য উঠাইয়া লইবেন; নচেৎ কোনক্রমেই গত কুলক্রিয়ার ক্ষতি পূরণ হইবে না।

জ্যৈষ্ঠ মাস, ষষ্ঠী তিথি—জামাই ষষ্ঠী। ঝুপ ঝুপ করিয়া ৭।৮ দিবস ধরিয়া বৃষ্টি হইতেছে। কি দিন কি রাত্রি বৃষ্টির বিরাম নাই। বাড়ী ঘর দ্বার কর্দ্দমময় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঘরের এক কোণে কতকগুলা আঁবের খোসা, কাঁঠালের ভোঁতা, জামের আঁটী ইত্যাদি পড়িয়া রহিয়াছে। তথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নীল বর্ণের মাছি বসিয়া সেই সমস্ত দ্রব্যের আস্বাদ উপভোগ করিতেছে; লোক জন যখন তাহার নিকট দিয়া যাইতেছে তখন মক্ষিকাগুলি ঠিক যেন "আমি খাই নাই, আমি খাই নাই," বলিয়া তাহার কর্ণকুহরের নিকট গিয়া নিজ নিজ নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতেছে। বাটীর লোকের বস্ত্রাদি বৃষ্টির আরম্ভ হইতে এক দিবসও সম্যকরূপ শুকায় নাই, ধোপা কাপড় যোগান দিবার কথা অনেক দিবস হইতে বিস্মৃত হইয়াছে। সুতরাং সকলেরি বস্ত্র মলিন ও অর্দ্ধ ভিজা; যে যখন ঘরের মধ্যে যাতায়াত করিতেছে, তখনি এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব সৌরভ বিস্তার করিতেছে। গৃহিণী সকলের অগ্রে স্নান করিয়া চুলগুলি আতা করিয়া বসিয়াছেন; যেখানে যাইতেছেন, আসিতেছেন দুর্গন্ধজালে দিঙ্মণ্ডল ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছেন। সকালে সকালে জামাতার জন্য রন্ধনাদি করিয়া তাঁহাকে অন্ন দিয়াছেন। জামাতা চাক্‌রে লোক, সকালে সকালে আহার করেন, আর আর সকলে পরে খাইবে। বারাণ্ডায় জামাতার আহারের স্থান করা হইয়াছে। সে স্থানে জলসংযোগে মাটি পিচ্ পিচ্ করিতেছে, দুই একটী কেঁচুয়া প্রাঙ্গন হইতে বুকে হাঁটিয়া আসিয়া তথায় বৃষ্টির ভয়ে আশ্রয় লইয়াছে। অদূরে কাঁঠালের ভোঁতা ইত্যাদি। জামাতা আহার করিতে বসিলেন, ডেঙ্গোর খাড়ার ঝোল থালায় পড়িয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, জামাতা অন্নের বাঁধে তাহাকে এক স্থানে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার ছোট শ্যালক অদ্যাপি বস্ত্র পরিধান করিতে শিখে নাই, সুতরাং মাজা, বা কোমর বা মধ্যদেশ কাহাকে বলে তাহা অদ্যাপি তাহার "বপু বর্ষ স্পর্শ" করিতে পারে নাই। শ্যালকের নাম প্রাণগোপাল। প্রাণ গোপাল স্থানান্তরে খেলা করিতেছিলেন, এক্ষণে সমস্ত শরীর ভিজাইয়া একটী আঁব চুসিতে চুসিতে দৌড়িয়া বাটীতে আসিয়াছেন। চন্দ্রের চতুষ্পার্শে যে আলোক চক্র দৃষ্ট হয়, তাহাকে লোকে চন্দ্রমণ্ডল বলে। প্রাণ গোপালের মুখের চতুষ্পার্শে যে আঁবের রস জমিয়াছে, তাহাকে মুখাম্রমণ্ডল বলা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। সে মুখাম্রমণ্ডল এত পরিধি বিশিষ্ট যে, অল্প একটু যত্ন করিলে মধ্যে ছেদ বিশিষ্ট এক খানি আমসত্ত হইয়া পড়ে। আম্র রসের কিয়দংশ বক্ষস্থল ও পেটস্থল বহিয়া শীতকালের খেজুর বৃক্ষের ননীর ন্যায় কোন এক স্থান হইতে টস্ টস্ করিয়া পড়িতেছে। প্রাণ গোপালের নখগুলির অভ্যন্তরে এত মৃত্তিকা জমিয়াছে যে, এক স্থানে সংগ্রহ করিলে প্রায় একটী দেওয়াল হইতে পারে। এমন অবস্থায় মাতার নয়নানন্দ, পিতার পুন্নাম নরকত্রাতা জামাতার অর্দ্ধাঙ্গের প্রাণের ভাই ও প্রতিবাসীর চক্ষের শূল আসিয়া কহিলেন, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আমি তোমার সঙ্গে বসে খাব।" মাতা ভ্রুকুটী করিলেন, ভগিনী হাত ধরিয়া টানিলেন, প্রাণগোপাল শুনিলেন না। থপ করিয়া বসিয়া তাঁহার সমল কর কণ্টক দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে লাগিলেন। গরিব চক্রবর্ত্তী মহাশয় অবাক হইয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিলেন। দৈবের অসাধ্য কার্য্যই নাই,

হঠাৎ অন্ন-নালের উভয় অন্তের ক্রিয়া যুগপৎ সম্পাদিত হইল। তখন প্রাণগোপালকে ধরিয়া মাতা স্থানান্তরে লইয়া গেলেন, চক্রবর্ত্তী মহাশয় বর্হির্বাটী আচমন ক্রিয়া সমাধান্তে গমন করিলেন।

অদ্য জামাতার আহার ভাল হইল না। এইজন্য বেলা ৪ চারিটা না বাজিতে বাজিতে রায় মহাশয়ের গৃহিণী তাঁহার রাত্রের আহারের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি মনস্তাপ! তণ্ডুলের জালায় হাত দিয়া দেখেন, চাউল নাই, ডালের হাঁড়িতে ডাল নাই; এতদ্ভিন্ন গৃহে তরকারিও নাই, মৎস্যও নাই!! চক্রবর্ত্তী মহাশয় যখন যখন শ্বশুরালয়ে আসিতেন, তখন শ্বশুরের এক মাসের খরচের উপযোগী চাল, ডাল, মসলা, ঘি, নুন, ইত্যাদি লইয়া আসিতেন। কিন্তু এবার বরষার দরুণ এ সমস্ত দ্রব্যের কিছুই আনিতে পারেন নাই। তদ্দর্শনে শ্বশুরের মনকষ্টের একশেষ হইয়াছে, শাশুড়ীর আর আক্ষেপ রাখিবার স্থান নাই। উভয়েই মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, এবারকার জামাই ষষ্ঠী সাফ্ লোকসান। কিন্তু কি করেন, জামাই একবার আসিয়াছে, আর তাড়াইবার যো নাই; অথচ জামাতার উপর এরূপ অভক্তি হইয়াছে যে তিনি এবার আর তাঁহার সহিত ভাল করিয়া কথাও কহিতেছেন না। এস্থানে বলিয়া দেওয়া উচিত যে, রায় মহাশয় ষষ্ঠীবাটার সময় কখনও আর অন্য কোন জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিতেন না। কারণ দু একবার নিমন্ত্রণ করিয়া দেখিয়াছেন, তাহারা রিক্ত হস্তে আইসে, আর বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া পূর্ণ হস্তে চলিয়া যায়। একি কোন শ্বশুরের বরদস্ত হয়?

বৈকালে যখন শাশুড়ী ঠাকুরুণ দেখিলেন, গৃহে কোন খাদ্য দ্রব্য নাই, তখন নিজ গৃহের জানালার নিকট দাঁড়াইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ডাকিলেন, "ও শিবু, ও শিবু।" শিবু ও জামাতা উভয়ে ঐ কুটীরের সম্মুখস্থ দর দালানে বসিয়া দাবা খেলিতেছিলেন। এটি পূর্ব্বের বন্দোবস্ত ছিল বলিয়াই ঐ স্থানে ঐরূপ ক্রীড়া হইতেছিল।

শিবু কিঞ্চিৎ কৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "কি বল্‌ছো বল, আমার কান আছে।" পরে খেলার দিকে দৃষ্টি করিয়া "এই কিস্তি"।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় যখন পূর্ব্বে পূর্ব্বে আসিতেন, তখন কিস্তিতে অর্থাৎ একখানি ছোট নৌকায় বোঝাই করিয়া আহার্য্য দ্রব্যাদি আনিতেন। কিন্তু দাবা খেলার কিস্তি যে সে কিস্তি নয়, তাহা বুঝিতে না পারিয়া রায়-গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "তাই তো বলি, আমার বাবা কখন বিনা কিস্তিতে আস্‌তেন না। কিস্তি এসে পৌঁছিয়াছে? তবু ভাল। একথা আগে বলতে? কথা চুপ চাপ করে পেটে পেটে রাখায় কোন ফল নেই।"

শিবু মাতার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "এ তোমার ডাল, চেলের কিস্তি নয়; এ খেলার কিস্তি।"

মাতা। "অমিও তো তাই বলছি, এক কিস্তি জিনিস দেওয়া আমার বাবার পক্ষে খেলা ধূলার কথাই বটে; তিনি মনে করলে আমাদের এক দিনেই বড়মানুষ করে দিতে পারেন।"

ক্রমশঃ।

পত্রপ্রেরকদের প্রতি

জলপাইগুড়ী হইতে আমরা একটী প্রবন্ধ সখায় প্রকাশ করার জন্য পাইয়াছি। লেখকের নাম নাই। প্রেরিত প্রবন্ধে লেখকের নাম ও ঠিকানা থাকা আবশ্যক। প্রবন্ধটী সখায় প্রকাশিত হইবে কি না এখন আমরা বলিতে পারি না।।

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

রাব্‌ড়ী।

প্রায় এক শত পাঠক পাঠিকা ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন এবং প্রায় সকলেরই উত্তর ঠিক হইয়াছে। এত অধিক নাম প্রকাশ করা সম্ভবপর নয় বলিয়াই এবার প্রকাশিত হইল না। নাম প্রকাশিত না হওয়ায় উত্তরদাতাগণ যেন অসন্তুষ্ট না হন।

নূতন ধাঁধা।

১। তিন অক্ষরে নাম মোর সবে গণে ভাই।
আদ্য অক্ষর ছেড়ে দিলে তোমা মধ্যে রই॥
মধ্য অক্ষর ছেড়ে দিলে সুতীক্ষ্ণ ধারায়।
শত্রুগণে ধ্বংশ করি নাহিক সংশয়॥
শেষ অক্ষর ছেড়ে দিলে হই আমি বাম।
বল এখন সবে ভাই আমার কি নাম॥

২। আমায় যখন লপ্ করে একেবারে খাও।
বল দেখি তখন তুমি কেমন মজা পাও?
মাথা আমার যদিও তুমি কেটে ফেলে দাও।
তবুও খেতে কতই মজা বল দেখি পাও?
মাজা আমার যদিও তুমি কর হে ছেদন।
বল্ তবুও না পার তুমি করিতে খণ্ডন॥
ভেবে সবাই বল হে দেখি কি নাম আমার।
বাস আমার যথায় তাহা শূন্যেরি উপর॥

কুমারী সরোজিনী গুপ্তা (বেজগাঁ—ঢাকা) নিম্নলিখিত ধাঁধাটী পাঠাইয়াছেন।

৩। তিন অক্ষরে নাম মোর আছি সর্ব্বময়,
ক্ষণেক আমাকে বিনা জীবন সংশয়।
প্রথম অক্ষর যদি মোর ছাড় ভাই,
অলসের সহ আমি সতত খেলাই।
মাঝের অক্ষর মোর যদি দাও ছাড়ি,
নামমাত্র ছুটে যাই আপনা পাসরি।
বল দেখি কেবা আমি ভাইভগ্নীগণ,
যদি আমি রাগি, তবে বড়ই ভীষণ।
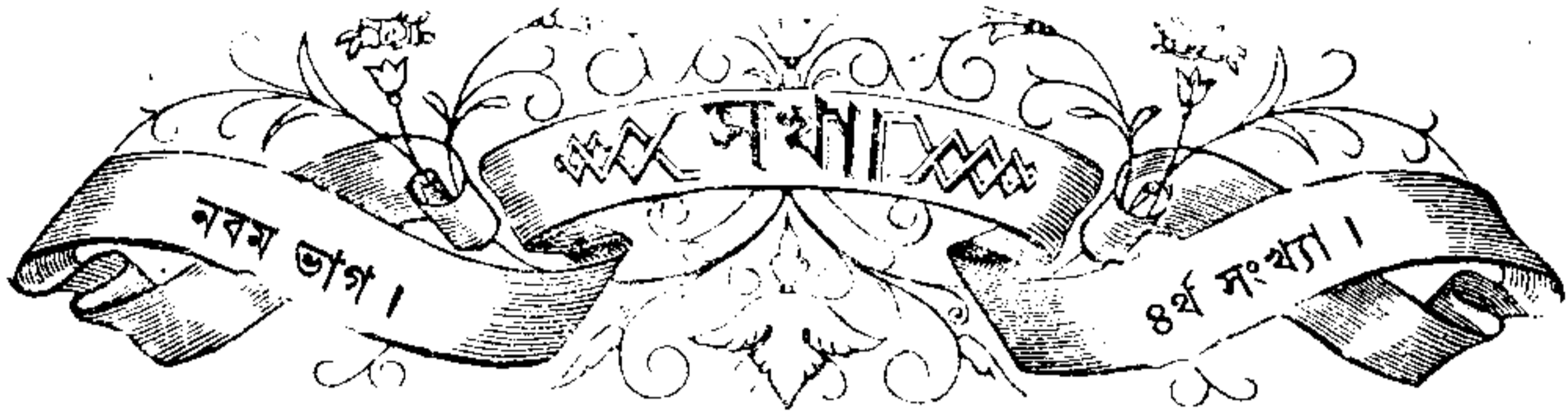
সখা
নবম ভাগ। ৪র্থ সংখ্যা।
এপ্রিল, ১৮৯১।

বিবিধ।

কৃষ্ণপর্ব্বত-সংগ্রাম।—পূর্ব্বে মণিপুর, পশ্চিমে কৃষ্ণ পর্ব্বত ও মিরঞ্জাইতে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সংগ্রাম বাধাইয়াছেন। কৃষ্ণপর্ব্বতের কোন কোন পার্ব্বত্য জাতি ইংরেজাধিকৃত স্থানে আসিয়া অত্যাচার, উৎপীড়ন করিয়া থাকে। তাহাদের শাসন জন্য আমাদের গবর্ণমেণ্ট সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায়, সোয়াটির মিঞা গুলা নামে একজন বীরপুরুষ কৃষ্ণ পর্ব্বতবাসীদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছেন।

* *
*

মিরঞ্জাই অভিযান।—মিরঞ্জাই ইংরেজাধিকৃত স্থান। অল্পকাল হইল সেই স্থান দখল করা হইয়াছে। তাহার আশপাশে আর অনেক পার্ব্বত্য স্বাধীন জাতির বাস। ইংরেজ ক্রমশই ওদিকে রাজ্য বিস্তার করিতেছেন;—পাছে তাহাদের বাসভূমিতেও হস্তক্ষেপ করেন—তাহাদের স্বাধীনতা লোপের প্রয়াসী হন, এই আশঙ্কায় তাহারা দলবদ্ধ হইয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বিদ্রোহাচরণ আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট তাহাদের বিরুদ্ধেও সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণপর্ব্বত ও মিরঞ্জাই অধিক দূরবর্ত্তী স্থান নহে—একই পর্ব্বতমালার অন্তর্গত। কৃষ্ণপর্ব্বত ও মিরঞ্জাই বিদ্রোহে সংযোগ আছে।

* *
*

অহিফেন বাণিজ্য।—আফিংএর ব্যবসা ও তজ্জনিত রাজস্ব ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের এক কলঙ্ক। খোলাভাটিতে বাঙ্গালা প্রদেশের,—সমগ্র ভারতের যেরূপ অপকার করিতেছে, দেশে মাতালের দল বাড়াইতেছে, লোকের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিতেছে; আফিংএ রাজপুতানা ও মালব প্রদেশের তেমনি সর্ব্বনাশ করিতেছে। বীর রাজপুত এবং মহারাষ্ট্রগণ এই বিষ খাইয়া অকর্ম্মণ্য ও মনুষ্যত্ব হীন হইয়া পড়িতেছে। গবর্ণমেণ্ট আফিংএর চাষ ও ব্যবসা এক চেটিয়া করিয়া দেশের লোককে এই বিষ ভক্ষণ জন্য পরোক্ষভাবে প্রোৎসাহিত করিতেছিলেন। বিলাতের রাজসভা পার্লেমেণ্ট সম্প্রতি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, ভারত গবর্ণমেণ্ট আর অহিফেণের চাষ বা ব্যবসার উপর কর আদায় করিতে পারিবেন না।

* *
*

স্মৃতিতত্ত্ব।—এক জন ফরাসী বৈজ্ঞানিক স্মৃতিতত্ত্ব আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি বলেন,—

সভ্যজাতি অপেক্ষা অসভ্য জাতির, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের, বয়স্কা অপেক্ষা বালকদের, সবল অপেক্ষা দুর্ব্বলদের, নগরবাসী অপেক্ষা পল্লীবাসীদের, শিক্ষিত অপেক্ষা অশিক্ষিতদের স্মৃতিশক্তি অধিক। বাল্যকাল হইতে ১৪।১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তৎপর হইতে হ্রাস আরম্ভ হয়। অতিরিক্ত ভোজন এবং শারীরিক পরিশ্রম দ্বারাও স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। অপরাহ্ণ হইতে পূর্ব্বাহ্ণে, শীতঋতু হইতে গ্রীষ্ম ঋতুতে, শীত প্রধান স্থান হইতে গ্রীষ্ম প্রধান স্থানে লোকের অধিক মনে থাকে।

* *
*

সঙ্গীত চর্চ্চা।—আমাদের দেশের লোকের সংস্কার, পিতা মাতা, জ্যেষ্ঠ ভাই, খুড়ো জেঠা প্রভৃতি গুরু ব্যক্তি ও সম্মানিত লোকদের সমক্ষে সঙ্গীতাদি করা বে-আদবি। আমাদের দেশে আরও একটী আশঙ্কা আছে। যে সকল ব্যক্তি সঙ্গীতের চর্চ্চা করিয়া থাকে, তাহাদিগের অধিকাংশই অসচ্চরিত্র লোক। তাই আমাদের দেশের অভিভাবকেরা ছেলে মেয়েদিগকে সঙ্গীত বাদ্য শিক্ষা করাইতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু দেশের এই সংস্কার পরিবর্ত্তিত হওয়া প্রয়োজন,—সচ্চরিত্র লোকের তত্ত্বাবধানে, অভিভাবকদের সমক্ষে ছেলে মেয়েদিগকে সঙ্গীত, বাদ্য, শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। সঙ্গীত বাদ্যের বিশুদ্ধ আমোদে লোকের চরিত্র নির্ম্মল থাকে, মনের প্রফুল্লতা বৃদ্ধি পায়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, সঙ্গীতের চর্চ্চাতে বালক ও বয়স্কদের স্বাস্থ্য উন্নত হয়; পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা এবং অনেক অভিভাবক বালক বালিকাদিগকে খেলার সময় চীৎকারাদি করিতে নিষেধ করেন। তাঁহাদের মতে, তাহাও উচিত নয়;—সেই উচ্চ কোলাহলে তাহাদের স্বাস্থ্য নাকি ভাল থাকে।

* *
*

মণিপুর বিভ্রাট।—মণিপুর ভারতের একটী প্রাচীন রাজ্য,—মহাভারতে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাজ্যের রাজবংশ আপনাদিগকে সূর্য্যবংশ সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এতকাল মণিপুর ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের একটী মিত্র রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যে গবর্ণমেণ্টের একজন রেসিডেণ্ট থাকিতেন। ইহার আভ্যন্তরীণ শাসন কার্য্যে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কোন হাত ছিল না,—রাজার সহিত লিখিত কোন সন্ধিপত্রও ছিল না। যিনি যখন রাজা হইতেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকেই রাজা বলিয়া স্বীকার করিতেন। রাজ্য লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ হইলে, তাঁহারা তাহাতেও হস্তক্ষেপ করিতেন না। এ সকল বিষয়ে মণিপুর একরূপ স্বাধীন ছিল। মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহের মৃত্যুতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরচন্দ্র সিংহ সিংহাসন আরোহণ করেন। বিগত অক্টোবর মাসে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া যুবরাজ কুলচন্দ্র সিংহ সিংহাসনারোহণ করেন। সেনাপতি টেকেন্দ্রজিৎ সিংহ যুবরাজত্বে বরিত হন। টেকেন্দ্রজিৎ বীরপুরুষ—তাঁহারই হস্তে রাজশক্তি পরিচালিত হইতেছিল। মহারাজ সুরচন্দ্র সিংহ রাজ্যচ্যুত হইয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট নূতন রাজার সহিত একটা সন্ধি করিয়া তাঁহাকেই রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে সংকল্প করিলেন। ইংরেজ মণিপুরকে যেরূপ ভাবে গ্রাস করিতে চান, রাজ্যের প্রধান শক্তি সেনাপতি টেকেন্দ্রজিৎ সিংহ রাজ্যে থাকিতে, তাহা অবাধে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। তাই তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন উদ্দেশে আসামের চীফ্ কমিসনার

কুইণ্টন সাহেব ৪৭০ জন সৈন্য ও কয়েকজন সেনাপতিসহ বিগত ২০এ মার্চ্চ মণিপুর রাজ্যে উপনীত হইলেন। তিনি যাইয়া এক দরবার বসাইলেন, রাজা ও সেনাপতিকে তাহাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। উদ্দেশ্য,—দরবার স্থানে সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করিবেন। সেনাপতি তাহা টের পাইয়াছিলেন,—তাই দরবার স্থানে আসিলেন না। টেকেন্দ্রজিৎকে ইংরেজ হস্তে সমর্পণ জন্য কুইণ্টন-প্রমুখ ইংরেজগণ রাজার উপর পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। রাজা তদনুযায়ী কার্য্য না করাতে ইংরেজ যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া টেকেন্দ্রজিৎও যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হইলেন। মণিপুর রাজ্যে ৮ হাজার নিয়মিত সৈন্য আছে, এতদ্ব্যবতীত অধীনস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূঁইয়াদের অধীনেও সৈন্যবল রহিয়াছে। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল। বিপদ গণিয়া ইংরেজ যুদ্ধে বিশ্রাম ঘোষণা করিলেন,—মণিপুর সৈন্যও বিরত হইল। তখন কুইণ্টন প্রভৃতি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। রেসিডেন্সি ছাড়িয়া তাঁহারা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না দেখিয়া, বিবি গ্রিমউড পতির অমঙ্গল চিন্তায় ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন। তখন মনিপুর সৈন্য ঘোষণা করিল, কুইণ্টন প্রভৃতি বন্দী হইয়াছেন, শীঘ্রই আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। একথা শুনিয়া সকলের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল,—প্রাণ দমিয়া গেল। বিবি গ্রিমউড ও আর ২।১ জন ইংরেজ কয়েকজন সিপাহী সঙ্গে করিয়া রেসিডেন্সি হইতে কাছাড় অভিমুখে পলায়ন করিলেন। মণিপুরী সৈন্যগণ রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়া অনেক সৈন্য হত ও তৌজিখানা লুট করিল। এদিকে বন্দীদের অদৃষ্ট ভাবিয়া ইংলণ্ড ও ভারতে মহা উদ্বিগ্নের সঞ্চার হইল। মণিপুর অভিমুখে সৈন্যবল প্রেরিত হইতে লাগিল। অবশেষে সংবাদ আসিল,—কুইণ্টন, গ্রিমউড, স্কীন, প্রভৃতিকে অমানুষিক যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা হইয়াছে। যুদ্ধে রাজ পরিবারের কতিপয় রমণী ও শিশু হত হইয়াছেন, এই ক্রোধে নাকি তাঁহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে। এখন চতুর্দ্দিক হইতে মণিপুর রাজ্য আক্রমণ জন্য,—হত্যাকারীদের সমুচিত শাস্তি বিধান উদ্দেশে সৈন্য যাইতেছে। অল্প কাল মধ্যেই মণিপুরের অদৃষ্ট নির্দ্ধারিত হইবে।

রমেশের বিদ্যালাভ।

রমেশ পাড়াগাঁয়ে এক এণ্ট্রান্স স্কুলে পড়িত। সহুরে ছেলেরা যেমন পড়া শুনায় খুব সুখ্যাতি পায়, পাড়াগাঁয়েও অনেক এমন ছেলে আছে যে, তাহারা কোন অংশে সহুরে ছেলের চেয়ে ন্যূন নহে। রমেশ খুব চালাক চতুর ছিল। তার বয়সও কম এবং সে পড়া শুনায়ও খুব ভাল ছিল। শিক্ষকেরা সকলেই তাকে ভালবাসিতেন। প্রতি বৎসর রমেশ পুরস্কারের সহিত উপরের শ্রেণীতে উঠিত। রমেশের অশেষ গুণ—সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে, উঠিয়াই হাত মুখ ধুইয়া পড়িতে বসে, পড়াটী সারা করিয়া তবে স্নানাহার করে, পরে স্কুলে যায়; স্কুলে চুপ করিয়া নিজের জায়গায় বসে, শিক্ষকের উপদেশ খুব মনোযোগের সহিত শোনে। রমেশের মুখে উঁচু কথাটী কেউ কখনও শুনে নাই।

স্কুলের বালকেরা কখনও কখনও বিদ্রূপ করিয়া তাঁহাকে ভাবুক রমেশ বলিয়া ডাকিত।

যাহা হউক রমেশের একটী দোষে, তাহার পরকাল মাটি হইল। আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই, কোন বালক বেশ ভাল ভাবে পড়া চালাইতেছে, হঠাৎ কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে তাহার উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ হইল, বিদ্যালাভ তাহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিল না। শেষে ভগ্নাশ হইয়া সংসারে পশিল, সংসারের পথও সুগম হইল না; দৈন্যতার ও চিন্তার ভার মাথায় বহিয়া বিষণ্ণ বদনে ধীর ও ক্লান্ত পদে অনন্তধামে প্রবেশ করিতে হইল। সেই অনির্দ্দিষ্ট কারণটী আমি নির্দ্দেশ করিব। রমেশের পক্ষেও সেই কারণ। সখার পাঠক পাঠিকার মধ্যে যদি কেহ রমেশের মত থাক, এখন হইতে সাবধান হও।

রমেশ খুব মনোযোগী বালক। রাত্রির আহারের পূর্ব্বেই তাহার দৈনিক নিরূপিত পাঠ অভ্যাস হইত। আহারান্তে তাহার ঠাকুরমার সঙ্গে একত্র শয়ন করিয়া উপকথা শুনিত। সকলেই জানেন, ঠাকুরমার উপকথার তহবিল হাজার খরচেও ফুরায় না। রমেশের ঠাকুরমা আবার লিখিতে পড়িতে জানিতেন; সুতরাং কত রকমের উপকথা তাঁহার স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল। উপকথার মধ্যে "দুয়া রাণী সুয়া রাণী," "হীরের গাছে সোণার ময়নার নৃত্য" প্রভৃতি ছাড়া কিরূপে কালিদাস সরস্বতীর সাক্ষাতকার লাভ করিয়া রাতারাতি কবি হইলেন, কিরূপে বাল্মীকি বিনা বিদ্যাশিক্ষায় কবিগুরু হইলেন, কিরূপে জলাবাড়ীর বিশ্বাসেরা সাতটা ধনের জালা পাইলেন, কিরূপে রাজপরীর সহিত মানুষের ভালবাসা জন্মিয়া প্রত্যহ পরী দ্বারা আনীত সোণার পাথর সে প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই সব গল্পও থাকিত। ঠাকুরমার এই সব গল্প বলিবার এমনই আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, সরল-বিশ্বাসী বালক রমেশ তাহার প্রতি বর্ণ সত্য বলিয়া জ্ঞান করিত।

উন্নতির পথে আরোহণ করা যত কঠিন, অবনতির দিকে অবতরণ করা তদপেক্ষা অনেক সহজ। একদিন রমেশের বাটীতে এক নিমন্ত্রণের আয়োজন হইল। রমেশের শিশু সহোদরের অন্নপ্রাশনের দিন, সকলেই কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত। এ দিন বৈকাল বেলায় বা রাত্রে রমেশের পড়া হইল না। পরদিন সকালে উঠিয়া রমেশ পুস্তকগুলি উল্টাইতে লাগিল। পড়া কঠিন, সময় অল্প। হতভাগ্য রমেশ যদি সকলগুলিন পুস্তকের পড়া না করিয়া সময়ে সংকুলান হয় এমন দু একখানা পুস্তকের পাঠ অভ্যাস করিত এবং অন্যান্য পুস্তকের পড়া ক্রমে সারিয়া লইত, তাহা হইলে তাহার ভবিষ্যৎ এমন মসিময় হইত না। কিন্তু রমেশের তখন সে বুদ্ধি হইল না। এই সামান্য ভ্রান্তির উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া তাহার সর্ব্বনাশের মহৎ অট্টালিকার গ্রন্থন আরম্ভ হইল। সংসারে এইরূপ ঘটনাই সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে। সামান্য হইতে বিশেষ ঘটনা হয়। এক মিনিটে যে ক্ষতি হইয়া যায়, ইহজীবনে আমরা তাহা শুধরাইয়া লইতে পারি না। বালক বালিকাগণ, তোমরা সবে সংসারের নবীন পথিক, সাবধান হইয়া হাঁটিও, যেন সামান্য কারণেও পদস্খালন না হয়। আর দেখিও যেন রমেশের মত ভ্রান্তিতে না পতিত হও। দুর্দ্দান্ত মনকে একবার লাগামশূন্য করিয়া বিপথে চালাইলে আর কখনই তাহাকে সোজা পথে আনিতে পারিবে না। যাহা হউক, যাহা বলিতেছিলাম, রমেশ বই কোলে করিয়া ভাবিতে লাগিল—মা সরস্বতী রাতারাতি কালিদাসকে পণ্ডিত করিয়া দিয়াছিলেন, আজি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার সামান্য পড়াটা কণ্ঠস্থ করিয়া দেন, তবে আর স্কুলে যাইয়া লজ্জা পাইতে

হয় না। কালিদাস বিদ্যাকূপে ডুব দিবা মাত্র ঘোরতর মূর্খ হইতে প্রধান পণ্ডিত হইয়াছিলেন, আমাদের বাগানের মধ্যের বড় কূপটা যদি সেই বিদ্যাকূপ হইত, তবে এখনি এক ডুব দিয়া সর্ব্ব-শাস্ত্র বিশারদ হইয়া পড়িতাম। তাহা হইলে আর ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস কিছুই মুখস্থ করিতে হয় না। যে কোন প্রশ্নই যে কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করুক না, সরস্বতী স্বয়ং আমার জিহ্বার উপর থাকিয়া তাহার উত্তর দিয়া দিবেন। তাহা হইলে কি মজা হয়—এমন সময় ৯টা বাজিয়া গেল। সেদিন রমেশের একটী ছত্রও পড়া হইল না। শিক্ষক মহাশয় বিস্মিত হইলেন, কারণ জিজ্ঞাসিয়া সদুত্তর পাইলেন না। যেহেতু রমেশ কি কারণ দর্শাইবে ?

এই হইতে রমেশের আর পড়া হইত না। যখনি বই খুলিত, অমনি মনে করিত হয় সরস্বতী, না হয় কোন পরী আমার পড়া মুখস্থ করাইয়া দিবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সময় চলিয়া যাইত, কিন্তু কোন দেবতাই দয়া করিয়া তাহার কণ্ঠে আবির্ভূতা হইতেন না। ক্রমে রমেশের এমনি অভ্যাস হইয়া পড়িল যে, যখন তখন সে দৈবশক্তির স্বপ্ন দেখিত। ক্লাশে বসিয়া আছে, তাহার মন কোন দেবতার অনুগ্রহ কামনায় হয়ত সপ্ত স্বর্গের কোন এক স্বর্গে বিচরণ করিতেছে। শিক্ষক মহাশয় প্রশ্ন করিলেন, রমেশের তাহা কর্ণ-গোচর হইল না। ভাবুক রমেশ কালে অমনোযোগী রমেশ বলিয়া খ্যাত হইয়া পড়িল। তিন চারি বার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। শেষে তাহার পিতা বিরক্ত হইয়া তাহাকে এক আফিসে কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। আফিসে বসিয়া রমেশ 'জলাবাড়ীর বিশ্বাস' হইত। সে ভাবিত, যেন সে নৌকায় চড়িয়া বাটী যাইতেছে, পথে একখানে বাহে গিয়া দেখে যে স্তূপাকারে কেবল মোহর পড়িয়া আছে, রমেশ নৌকা বোঝাই করিয়া সমস্ত মোহর বাটী লইয়া আসিল। গ্রামে রমেশ একজন জমীদার হইয়া পড়িল। অথবা সে ভাবিত, এক রাজপরী তাহার উপর দয়া করিয়া খাঁটী সোণা আনিয়া দিল, সে তদ্দ্বারা গ্রামে একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক হইয়া পড়িল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আফিসের কাজ আদৌ হইত না। উপরিস্থ কর্ম্ম-চারী রমেশকে কার্য্য হইতে অবসর করিয়া দিলেন। রমেশ ভগ্নমনে গৃহে ফিরিল। এ সময় রমেশের পিতা নাই। সংসারের ব্যয় রমেশকে চালাইতে হইত। রমেশ শেষে মজুরী খাটিত। কিন্তু আমরা বিশেষ জানি, মৃত্যুর পূর্ব্ব সময়েও রমেশ পরীর সাহায্যে সাতটা ধনের জালা পাইবে এরূপ আশা করিয়াছিল।

আমরা এইখানে গল্পটী শেষ করিলাম। বালক বালিকাদের মধ্যে যদি কাহারও রমেশের মত ভাব মনে থাকে, তবে এখন হইতে তাহা সংশোধন করিয়া লও। নচেৎ শেষে রমেশের মত তোমার গতি হইবে। কালিদাস রাতারাতি কবি হইয়া-ছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ আছে, সেটী কল্পনা মাত্র। কালিদাস গৃহে বিদ্যাবতী স্ত্রীর নিকট অপমানিত হইয়া মনের খেদে বনে বসিয়া বিদ্যা-দেবীর সাধনা করেন অর্থাৎ কায়মনযত্নসহকারে বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন। সাধনা করিলেই সিদ্ধ হয়। কালিদাসের দৃঢ় অধ্যবসায়ে একান্ত যত্নের ফল ফলিল। তিনি একজন কবি হইয়া সাহিত্য সংসারে অমর হইয়া আছেন। তোমরাও কায়মনযত্নসহকারে দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত সর্ব্বপ্রযত্নে অনন্যমনা হইয়া বিদ্যা শিক্ষা কর, তোমরাও কালে বড়লোক হইতে পারিবে। কেবল বাগ্‌দেবীর সাক্ষাতকার পাইয়া রাতারাতি কবি হইবার বাসনা, কদাচ মনে স্থান

দিও না। আর যে রাজপরীর কথা শোন, সে কেবল কল্পনা মাত্র। টাকা পড়িয়া পাওয়া, কথার কথা মাত্র। লোকে নিজের চেষ্টায় বড় লোক হয়, অলস লোকে বলে, টাকা পড়িয়া পাইয়াছে। মতিশীল, কৃষ্ণপান্তি প্রভৃতি কয়জনে টাকা পড়িয়া পাইয়াছিলেন। আজ কালকার ধনী রাজা দুর্গাচরণ লা প্রভৃতি কি টাকা পড়িয়া পাইয়াছেন? তবে তোমরা কখনই টাকা পাইবার আশা করিও না— বাল্যে বিদ্যা শিক্ষা কর। যৌবনে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা কায়মনে করিও, তুমি বড় লোক হইতে পারিবে। "God helps those who help themselves" "যাহারা আপন উন্নতির চেষ্টা করে, ঈশ্বর তাহাদের সহায় হন"—এই বাক্যটীর সারবত্তা সর্ব্বদা মনে রাখিও।

সূতিকাগৃহ ও তদ্বিষয়ক গুটি কতক উপদেশ।

স্ত্রীলোকের প্রসব সময় উপস্থিত হইলে সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে; কিন্তু কেন যে এ গৃহ নির্ম্মিত হয়, তাহা বোধ হয় শতকরা দশজন ব্যক্তিও জানে না। লোকের মনে মোটামুটি এক সংস্কার আছে যে, সূতিকাগৃহ অপবিত্র; সুতরাং প্রসূতিকে শয়নগৃহে স্থান দেওয়া অনুচিত। এই সংস্কার বা কুসংস্কার নিবন্ধন অনেকগুলি গুরুতর অপকার হইয়া থাকে। বালক বালিকাদিগকে সে সমস্ত বিষয়ে উপদেশ দেওয়া উচিত। বৃদ্ধ অর্থাৎ শেয়ানা ব্যক্তিকে সে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া অরণ্যে রোদন মাত্র। কুসংস্কার একবার বদ্ধমূল হইলে, কাহার সাধ্য তাহাকে নির্ম্মূলিত করে? বালক বালিকাগণের হৃদয়ে সে সম্বন্ধে কোন মতামত নাই। এখন তাহাদিগকে যাহা শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহাই শিখিবে। একবার এক মতে দীক্ষিত হইয়া পড়িলে, মতান্তর জন্মান অত্যন্ত কঠিন। এই জন্যই সখাতে আমাদিগের প্রাত্যাহিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে গুটিকতক প্রবন্ধ প্রকটিত হইবে।

প্রথমতঃ। পৃথক সূতিকাগৃহ কেন? তাহার উত্তর এই, কতকগুলি সংক্রামক পীড়া আছে। সেই পীড়াগ্রস্ত রোগীকে স্পর্শ করিলে অথবা তাহার নিকটে গমন করিলে, সুস্থ ব্যক্তিও তদ্দ্বারা আক্রান্ত হয়, যথা বসন্ত রোগ। এ কথা সকলেই অবশ্য স্বীকার করিবে।

দ্বিতীয়তঃ। দুর্ব্বলকে সকলেই আক্রমণ করে, সবলের নিকট কেহ সাহস করিয়া যায় না। পরলোকগত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এ বিষয়ে একটী চমৎকার দৃষ্টান্তদিয়াছেন। সেটী এই;

"পবন প্রতাপে হয় প্রবল পাবক
ফলে সেই বায়ু হন প্রদীপ নাশক।"

প্রসূতি যে প্রসবের পর যৎপরোনাস্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহা সকলেই জানে; সদ্য প্রসূত সন্তানও যে অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং সুস্থকায়, স্থূল কলেবর ব্যক্তি যখন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়, তখন ইহারাও যে হইবে তাহার আর বিচিত্র কি?

তৃতীয়তঃ। যে গৃহে লোকজন বহুকাল বাস করিয়া আসিতেছে, সে গৃহে অবশ্যই কাহারও না কাহারও পীড়া হইয়াছে। সে সমস্ত পীড়ার কোন না কোন বীজ সে গৃহে থাকেই। প্রসূতি ও প্রসূত উভয়েই দুর্ব্বলতাবশতঃ পীড়িত হইবার সম্ভব। এই সকল কারণে স্বতন্ত্র সূতিকাগৃহ প্রস্তুত করা আবশ্যক।

কিন্তু মূর্খতাবশতঃ এ সমস্ত বিষয়ে লোকের শৈথিল্য দেখা যায়। কোথায় সূতিকাগৃহ পবিত্র গৃহ বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহা না হইয়া লোকের মনে ধারণা হইয়াছে যে, সূতিকা গৃহ যারপরনাই অপবিত্র। পূর্ব্বে লোকে স্নান ও অগ্নিস্পর্শ করিয়া সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিত; কিন্তু আজ কাল সূতিকাগৃহ হইতে বাহির হইয়া স্নান ও অগ্নিস্পর্শ করে। ৺ তারাশঙ্কর তর্করত্ন কৃত কাদম্বরীর যে বাঙ্গালা অনুবাদ আছে, তাহার সপ্তদশ সংস্করণের ২৩ পৃষ্ঠা পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে যে, রাজা তারাপীড় সদ্য প্রসূত পুত্র মুখ দর্শনার্থ জল ও অগ্নি স্পর্শ করিয়া মন্ত্রী সমভিব্যাহারে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এ বিষয়ে যে নিয়ম ছিল, তাহা কাদম্বরীর এই স্থান পাঠ করিলে অনায়াসেই জানিতে পারা যায়।

তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার জল স্পর্শ করিলে অবশ্যই শরীর পরিষ্কার হয়; কিন্তু অগ্নি-স্পর্শের প্রয়োজন কি? তাহার উত্তর এই যে, জলে অঙ্গ ধৌত করিলেও চক্ষের অগোচর এরূপ অনেক পীড়ার বীজ শরীরে থাকিতে পারে, যাহা অগ্নিস্পর্শ ব্যতীত কোন মতেই ধ্বংস হইবার সম্ভব নাই। এ বিষয় বারান্তরে বিশেষরূপে বিবৃত হইবেক। অতএব সূতিকাগৃহ নূতন কাষ্ঠ বাঁশ দড়ি ইত্যাদিতে প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য।

সূতিকাগৃহ এমন স্থানে হওয়া উচিত, যেখানে কোন ময়লা বা দুর্গন্ধ নাই।

ঐ গৃহ হইতে যেন বায়ু দ্বারা দুর্গন্ধ ইত্যাদি সমস্ত অনিষ্টকারী পদার্থ তাড়িত হইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করা অত্যন্ত আবশ্যক।

যে সকল ব্যক্তি স্নান ও অগ্নিস্পর্শ না করিয়াছে, তাহারা যেন তথায় না যাইতে পায়।

বর্ষাকালে জল ও শীতকালে শীত যেন তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে না পায়।

আর আর যে সমস্ত বন্দোবস্ত করা উচিত, তাহা বলিলে তোমরা হঠাৎ বুঝিতে পারিবে না। বারান্তরে সুবিধা পাইলে বলিব।

মহামতি ব্রাড্‌ল সাহেব।

(৪১ পৃষ্ঠার পর।)

আয়র্লণ্ডবাসীদিগকে ইংলণ্ডের লোকে চিরকাল নির্য্যাতন নিপীড়ন করিয়া আসিতেছে। ইংলণ্ডের কঠোর শাসন আয়র্লণ্ডবাসী সহ্য করিতে না পারিয়া, ইংরেজ-দিগকে গোপনে ধ্বংস করার জন্য "ফেনিয়ান" নামে এক সম্প্রদায় গঠন করিল। তাহারা ডিনামাইট দ্বারা ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদিগকে উড়াইয়া দেওয়ার জন্য উদ্যোগ করিল। তখন ১৮৬৭ সালে আয়র্লণ্ডে বিদ্রোহের সূচনা হইয়াছিল। ব্রাড্‌ল তখন সমর-ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন,—একদিকে ইংরেজের অত্যাচার কাহিনী ঘোষণা ও অপরদিকে "ফেনি-য়ানদের" নরহত্যার তীব্র তিরস্কার করিতে লাগি-

লেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকেও ফেনিয়ান দলভুক্ত মনে করিয়া দণ্ডিত করার চেষ্টায় রহিলেন,—গুপ্তচর নিযুক্ত হইল। কিন্তু গোয়েন্দাগণ তাঁহার কোন ছিদ্র অন্বেষণ করিতে না পারিয়া নিরস্ত হইল। ১৮৮৬ সালে আয়র্লণ্ডের দুঃখকাহিনী বিবৃত করিয়া তিনি এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মহামতি গ্লাড্ষ্টোন তাঁহার সেই গ্রন্থের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ সালে তিনি আয়র্লণ্ডে যাইয়া বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। পুলিস তাঁহাকে পদে পদে বাধা দিয়াছিল,—কিন্তু তিনি যে কোন বাধাতেই প্রতিরুদ্ধ হওয়ার লোক ছিলেন না, তাহা বলা বাহুল্য। পুলিসের বাধা অমান্য করিয়াও হাজার হাজার লোক তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে ছুটিয়া আসিত।

ব্রাড্‌ল সাহেব অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। ইংলণ্ডে তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ বক্তার সংখ্যা বড় অধিক ছিল না। ব্রাড্‌লর স্বাধীন ব্যবহার সহিতে না পারিয়া রক্ষণশীল গবর্ণমেণ্ট উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি হাইডপার্কে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন, এই অপরাধে তাঁহাকে দণ্ডিত করার জন্য রাজমন্ত্রী লর্ড ডার্ব্বি ষড়যন্ত্র পাকাইয়াছিলেন; কিন্তু অভিযোগ আনিতে সাহসী হইলেন না। তিনি কোথায় কি বক্তৃতা করেন, তাহা গোপনে লিখিয়া আনার জন্য লোক নিযুক্ত করেন, তাহাতেও মনের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারিলেন না। রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের সংবাদপত্র সকল ঈশ্বর নিন্দার জন্য তাঁহার নামে অভিযোগ আনার পরামর্শ দিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাতেও সাহসী হইলেন না। গোয়েন্দাগণ তাঁহাকে ফেনিয়ান দলভুক্ত বলিয়াছিল, তাহারও প্রমাণ না পাওয়াতে গবর্ণমেণ্ট কিছু করিতে পারিলেন না। অবশেষে ১৮৭৯ সালে গবর্ণমেণ্ট খুঁজিয়া এক পুরাতন আইন বাহির করিলেন,—৬ পেনি মূল্যের নীচে কেহ কোন সংবাদপত্র বাহির করিতে পারিবে না। ব্রাড্‌লর ন্যাসনল রিফর্ম্মারের দাম ২ পেনি মাত্র ছিল। তাঁহার নামে গবর্ণমেণ্ট ৮৩ হাজার ২ শত টাকার দাবীতে মোকদ্দমা আনিলেন। গবর্ণমেণ্ট ভাবিয়াছিলেন, ব্রাড্‌ল জব্দ হইবেন,—এত টাকা দিতে পারিবেন না; তাঁহার কাগজ উঠিয়া যাইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট নিজের বোকামিতে সেই মোকদ্দমা হারিয়া গেলেন। ব্রাড্‌ল গবর্ণমেণ্টের সকল চক্রান্ত এড়াইয়া উঠিলেন।

১৮৭১ সালে ফরাসী দেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে, আভ্যন্তরীণ বিবাদে ফরাসী দেশ রসাতলে যাইতেছিল। একটী ফরাসী রমণীর একটী কথাতে ব্রাড্‌ল সাহেব সেই দেশের জন্য বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্তৃতাতে উত্তেজিত হইয়া ইংলণ্ডের অনেকে অর্থ সাহায্য ও পরামর্শ দ্বারা ফরাসীরাজ্যে শান্তি স্থাপনের সাহায্য করিয়াছিলেন। তারপর কমিউনগণ যখন গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া ফরাসীভূমি নরশোণিতে প্লাবিত করিতেছিল, তখন ব্রাড্‌ল সেই শোণিতপাত নিবারণ করিতে গিয়াছিলেন। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পূর্ব্ব উপকারের প্রতিদান স্বরূপ তাঁহাকে বন্দী করিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেন। ১৮৭৩ সালে স্পেন দেশে রাজতন্ত্র তুলিয়া দিয়া সাধারণতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা হইতেছিল। ব্রাড্‌ল সাধারণতন্ত্রীদের পক্ষ সমর্থন জন্য তখন স্পেনে গমন করিয়াছিলেন।

এই সময় তিনি যুক্তরাজ্যবাসীদের কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত যাইয়া বক্তৃতা প্রদান জন্য তথায় গমন করেন। তাঁহার উদ্দীপনা পূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া আমেরিকগণ মোহিত হইতেছিলেন, এমন সময় পার্লেমেণ্টে নর্দ্দামটনের সভ্য হওয়ার জন্য স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন।

ইতিপূর্ব্বে তিনি আর একবার তথাকার প্রতিনিধি মনোনীত হওয়ার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এবার ক্রমা-

গত দুইবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া আবার যুক্তরাজ্যে বক্তৃতা করার জন্য গমন করেন। ১৮৭৮ সনে তৃতীয়বার বক্তৃতা করিবার জন্য যুক্তরাজ্যে গিয়াছিলেন। তখন পীড়িত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন। তিনি যতবার আমেরিকাতে যাইয়া বক্তৃতা করিয়াছেন, প্রতিবারেই তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া লোকে মোহিত ও চমকিত হইয়াছে।

অবশেষে বহু চেষ্টার পর, গবর্ণমেণ্টের অনেক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া ১৮৮১ সালে তিনি পার্লমেণ্টে প্রবেশাধিকার লাভ করেন; তাঁহার প্রাণের গভীর কামনা সিদ্ধ হয়। ব্রাড্‌ল বাইবেল মানেন না, বাইবেল স্পর্শ করিয়া শপথ না করিলে পার্লেমেণ্টের সভ্য হওয়া যায় না; এই যুক্তিতে তাঁহাকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে দেওয়া হইতেছিল না। পার্লেমেণ্টের সভ্যগণ তাঁহাকে যত বাধা দিতে লাগিলেন, তাঁহার নির্ব্বাচক নর্দ্দামটন বাসীগণ তত তাঁহাকে বার বার মনোনয়ন করিতে লাগিলেন। পরাস্ত হইয়া অবশেষে ব্রাড্‌লকে সভ্যরূপে তাঁহাদের গ্রহণ করিতে হইল। তিনি যখন পার্লেমেণ্টে বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইতেন, তখন সকলে উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার কথা শ্রবণ করিত। তাঁহার বক্তৃতার তর্ক প্রাণালীতে পরাস্ত হইয়া বিপক্ষ সপক্ষ হইত, গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে প্রমাদ গণিতেন। তিনি দশবৎসর কাল এরূপভাবে স্বদেশ ও ভারতের সেবা করিয়া, ভারত বাসীদিগকে কাঁদাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি নর্দ্দামটনের সভ্য হইলেও ভারতের দুঃখ দুর্দ্দশার জন্য বদ্ধ-পরিকর ছিলেন;—এজন্য তিনি "ভারতের সভ্য" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। স্বচক্ষে ভারতের অবস্থা দর্শন জন্য তিনি কঠিন পীড়া হইতে সারিয়া উঠিয়াই ১৮৮৯ সনের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই নগরে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখনও তিনি সম্পূর্ণরূপে সারিয়া উঠিতে পারেন নাই,—তাই ভারতের নানা স্থান পরিদর্শন করিতে পারেন নাই। স্বদেশে ফিরিয়া যাইয়া এক বৎসর কাল অতীত হইতে না হইতেই, তাঁহার প্রাণের সাধের "ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা সংস্কার সংক্রান্ত আইন" মহাসভাতে আলোচিত হওয়ার পূর্ব্বেই, তিনি এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অবিনশ্বর রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন। ইহসংসারে একমাত্র কন্যাকে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। আর ভারতবাসী তাঁহার স্মৃতি কৃতজ্ঞ অন্তরে হৃদয়পটে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে।

নববর্ষ।

সবার দেখে নূতনে আদর
বিদায় নিয়ে তবে,
পুরানো বরষ মনের দুঃখে—
কাল সাগরে ডোবে।
তার সাথেতে ডুবলো গিয়ে
পুরানো রবি শশি,
লুকায়ে বুকে পুরানো কবির
পুরানো ভাব রাশি।
নূতন বরষ নবীন সাজে
বসেছে দরবারে,
নূতন রবি নূতন শশী,
তাহার চারি ধারে।

নূতন জ্ঞানের আলোক কত
মুহূর্ত্তে বিকাশে,
নূতন আশার কতই-ছবি
তাহার চারি পাশে।
এমন সময় সখায় "সখায়"
আবার দেখা হল,
দোঁহার প্রাণে উঠ্‌ল জেগে
নবীন আশা বল।
জ্ঞানের কথায় জীবন পথে
দোঁহায় চলি যাবে,
প্রাণের যাহা অভাব তাহা—
তখনি তারা পাবে।
"শিক্ষা" মন্ত্রে দীক্ষা লয়ে
জীবন সঁপে যারা,
সংসারেতে তারা কভু
হয় না পথহারা।
চল তবে ভাই, জ্ঞানের পথে
সবাই মিলে যাই;
যতন করে সাধন বলে
রতন যাতে পাই।

ভাই-ফোঁটা।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন সুরেন্দ্রের ভগিনী বিমলা ভাইফোঁটা লইবার জন্য ভ্রাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইল। সুরেন্দ্র কিন্তু ভাইফোঁটা, জামাইষষ্ঠি প্রভৃতি কুসংস্কার মনে করেন। ভগিনীর নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়াই কুসংস্কার বিনাশের কথাটা তাঁহার মনে খড়ের আগুনের মত হু হু জলিয়া উঠিল। তিনি মাতাকে জানাইলেন যে, এ সব কুসংস্কার যত দিন দেশ হইতে সমূলে উৎপাটিত না হইবে, ততদিন দেশের মঙ্গল নাই। যদি কোন দিন ভারত স্বাধীন হয়, তবে এই সব কুসংস্কারের উষ্ণ শোণিতে অভিষিক্ত হইয়াই হইবে। বিশেষ, দিদি বুঝেন না যে, আজ আমি এই কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিলে বা সহায়তা করিলে, চিরকালই লোকের নিকটে হাস্যভাজন হইব। সুরেন্দ্রের যুক্তি তর্কে মাতার মন বুঝিল না, তিনি জেদ করিয়া তাহাকে বিমলার বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। সুরেন্দ্র "রোগী যথা নিম খায় নয়ন মুদিয়া" গোচের অতি কষ্টে একটী ফোঁটা লইলেন। বিমলা একটু হাসিলেন—কিছু বলিলেন না।

ইহারই কিছুদিন পরে খ্রীষ্টানদের নববর্ষের দিন। আফিস আদালত বন্ধ। নূতন বর্ষে নূতন উৎসাহে নবীন সম্প্রদায় নবীন ভারতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। খ্রীষ্ট মাসে নূতন বর্ষের প্রথম দিনে যত আমোদ, তত আমোদ কিছুতেই হইতে পারে না। এ হেন স্ফূর্ত্তির দিনে সুরেন্দ্র নাথ একখানি "প্রফুল্ল" নাটক সুন্দর বাঁধাইয়া ভগ্নী বিমলাকে উপহার পাঠাইয়া দিলেন। উপরে লিখিয়া দিলেন, "নূতন বর্ষে ভালাবাসা ও ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ এই পুস্তক ভগিনী বিমলা দেবীকে উপহার প্রদত্ত হইল।"

যথাসময়ে বিমলা পুস্তক প্রাপ্ত হইলেন। বিমলা উপহার-প্রাপ্তি স্বীকারে নিম্নলিখিত কয়েকটী ছত্র লিখিয়া পাঠাইলেন।

স্নেহের ভ্রাতা সুরেন,—

ভাই-ফোঁটার দিনের কথা মনে করিয়া তোমার নূতন বর্ষের উপহার আমার মনোমত হইল না। তবে আমার প্রাণের কনিষ্ঠ সহোদর পাঠাইয়াছে,

বড় আহ্লাদের বিষয়। কিন্তু ভাই, জিজ্ঞাসা করি, এই যে 'নববর্ষ', এটী কি আমাদের না ইংরাজের? নিজের নববর্ষটা পরিত্যাগ করিয়া বিলাতী নববর্ষে আমোদ করাকে কি সাহেবি-আনা বলে না? একটা তোমার কাছে কুসংস্কার আর একটা কেন সুসংস্কার হইল? বুঝিয়াছি, ইংরেজের অনুকরণ করিতে গিয়া তোমরা এ ভ্রমে পতিত হও। যাউক এ সব কথা। ভাই-ফোঁটাটা তোমার এত ঘৃণার বিষয় কেন? বিশেষ অনুসন্ধান লইয়াছ যে, কেন ভাই-ফোঁটার আবশ্যকতা আছে? বোধ হয় তোমার সাহেব গুরুর কাছে ইহার উপদেশ পাও নাই। না পাইয়াছ, আজ আমি তোমাকে উপদেশ দিব। তোমার গুরু মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া ভাল মন্দ বিচার করিও। এখন আমার কথা শোন। হিন্দুর প্রধান উৎসব দুর্গোৎসব। কি ধনী কি দরিদ্র সকলেই এই সময় এই উৎসবে মত্ত হয়—প্রাণের সহিত যোগ দেয়। দূর দেশ প্রস্থিত আত্মীয় স্বজনেরা এই সময়ে বাড়ী আইসে, মহামায়ার এই পূজার দিনে কেহ বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র থাকে না। আজকাল ইংরাজের আমলে পূজার অবকাশ ১২ দিন মাত্র; কিন্তু যখন এই ভাই-ফোঁটার প্রথা প্রচলিত হয়, তখন বিদেশ প্রবাসীরা পূজার সময় এক মাসেরও অনেক অধিক কাল অবকাশ পাইতেন। তখন তাঁহারা পূজার পূর্ব্বে বাটী আসিতেন এবং ভাই-ফোঁটার পর বাটী হইতে যাইতেন। একবার পঞ্জিকাখানা উল্টাইয়া দেখিও—দুর্গা পূজার পর লক্ষ্মী পূজা, তাহার পর কালী পূজা, কালী পূজার পর জগদ্ধাত্রী পূজা। এতগুলি পূজা পর পর থাকায়, তখন সকলেই দীর্ঘকালের অবকাশ লইয়া বাটী আসিতেন। কালীপূজার পরই বাটী হইতে যাইবার উদ্যোগ হয়। আবার সম্বৎসর পরে বাটী আসিতে হইবে—এই দীর্ঘ সময় কাহার কি অবস্থায় কাটাইবে কে জানে? কাজেই বাটী হইতে যাইবার সময় সমস্ত আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছাটা স্বতঃই মনে প্রবল হইয়া উঠে। সকলের সঙ্গে বাটী আসিয়াই দেখা হয়। কিন্তু বিবাহিত ভগিনীর সঙ্গে দেখা করিতে হইলে তাহার বাটী যাইবার আবশ্যক হয়। এখন যদি ভাই-ফোঁটার বান্ধাবান্ধিটা না থাকিত, তবে প্রায় কেহই আর ভগিনীর সঙ্গে দেখা করিতে যাইত না। বান্ধাবান্ধিটা আছে, তবু তোমাদের মত লোকের দৌরাত্ম্যে প্রথাটা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ভাই বল দেখি, ভাই বোনে বাল্যকালে একত্র বাস করে—এক সঙ্গে খেলা করে—একত্র ভোজন, একত্র শয়ন—গলাগলি ভালবাসায় একত্র বাল্যকাল কর্ত্তন করে। ভাই বোনের হাস্য ধ্বনিতে যে গৃহ একদা পূর্ণ হইত, সেই গৃহে যৌবনে প্রবেশ করিয়া ভ্রাতার কি ভগিনীকে দেখিবার ইচ্ছা হয় না?

এখন বল দেখি—ভাই-ফোঁটা প্রথাটা ভাল না মন্দ?"

পত্র পাঠ করিয়া সুরেন্দ্র নাথ দেখিলেন, হিন্দুদের যে সমস্ত আচার ব্যবহারকে কুসংস্কার বলিয়া বোধ হয়, তাহার সকলগুলিই কুসংস্কার নহে।

৺ রাজা স্যার তাঞ্জোর মাধব রাও।

তিমিরাচ্ছন্ন ভারতের রাজনৈতিক আকাশ হইতে আবার একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। অভাগিনী ভারত-মাতা আজ তাঁহার এই দুর্দ্দিনে আর একটী সুসন্তান হারাইলেন। সার,টি, মাধব রাও আর ইহলোকে নাই। ইদানীং তিনি পক্ষাঘাত রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন; ৪ঠা এপ্রিল সকাল বেলা তাঁহার ব্যাধি হঠাৎ বৃদ্ধি হইয়া নিতান্ত খারাপ অবস্থায় দাঁড়াইল। সেই দিবস বেলা ১১টার সময়ই তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। মাধব রাও'র মৃত্যুতে ভারতবাসী তাঁহাদের একটী পরম বন্ধু হারাইয়াছেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, রাজকার্য্যে ও সমাজিক বিষয়ে,—তিনি একজন প্রবীণ লোক ছিলেন। কি স্বদেশে, কি বিদেশে, তাঁহার যশঃ সৌরভ সর্ব্ব স্থানেই বিস্তৃত হইয়াছিল। ইংরাজরাজ স্যার, টি, মাধবের বুদ্ধিবৃত্তি ও কার্য্য প্রণালীতে মুগ্ধ হইয়া অনেক সময় ও অনেক স্থলে তাঁহার যশোগান করিয়াছেন। মাধব রাও বস্তুতঃই রাজনীতিবিদ্‌গণের শিরোভূষণ ছিলেন। ভারত-মাতার নিতান্তই দুরদৃষ্ট যে, এমন পুত্ররত্নকে এত শীঘ্র হারাইলেন।

১৮২৮ সালে মান্দ্রাজ প্রদেশে তাঞ্জোর জেলার কুম্বকোনাম গ্রামে একটী সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশে মাধব রাও জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রঙ্গ রাও, এবং পিতৃব্য আর ভেঙ্কট রাও উভয়েই ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। শৈশব অবস্থায় কয়েক বৎসর মাধব রাও সংস্কৃত ভাষা ও মাতৃ ভাষায় শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন ত্রয়োদশ বৎসর, তখন তিনি মান্দ্রাজের হাইস্কুলে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রবেশ করেন, এবং কিছু দিন যাইতে না যাইতেই ঐ স্কুলের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ই, পি, পাউয়েল সাহেবের নিকট অতিশয় বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ ছাত্র বলিয়া পরিচিত হন। ১৮৪৬ সালে অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় মান্দ্রাজ ইউনিভারসিটি হইতে অধ্যয়নের নানা বিষয়ে ব্যুৎপত্তি-হেতু মাধব রাও এক খানি উচ্চ শ্রেণীর প্রশংসা-পত্র প্রাপ্ত হন। ইহার কিছু দিন পরে পাউয়েল সাহেব বিলাত গমন করেন; এবং এই অবকাশে তাঁহার স্থলে মাধব রাও গণিত ও প্রাকৃত-বিজ্ঞানের শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই কার্য্য তিনি খুব সুদক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া সকলেরই প্রশংসা-ভাজন হন। কয়েক মাস পরে মাধব রাও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজের একাউন্টেণ্ট-জেনারলের আফিসে একটী কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই কার্য্য প্রায় দেড়বৎসর পর্য্যন্ত বেশ দক্ষতার সহিত চালাইবার পর, ১৮৪৯ সালে ঐ আফিসে একটী উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত পদ তাঁহাকে প্রদান করার প্রস্তাব হয়। কিন্তু এই সময়ে আফিসের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ত্রিবাঙ্কুরের রাজ-পুত্রগণের শিক্ষকতা-কার্য্যের ভার তাঁহার গ্রহণ করিতে হইল। মাধব রাও পূর্ব্বে অন্যান্য কার্য্যে যেমন প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন, রাজপুত্রগণের এই শিক্ষকতা ও পরিচালনার কার্য্যে তদপেক্ষা অধিক প্রশংসা লাভ করিলেন; এবং এই কার্য্যেই তাঁহার ভবিষ্যতের সমস্ত উন্নতির আভাস পাওয়া গেল।

১৮৫৩ সালে মাধব রাও ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান পেস্কার অর্থাৎ নায়েব-দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ঐ রাজ্যের দুইটি জেলার সম্পূর্ণ স্বাধীন শাসন-ভার তিনি প্রাপ্ত হন। তাঁহার শাসনে এই জেলাদ্বয়ের সর্ব্ব স্থানেই সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল; এবং তাঁহার সুবন্দোবস্তে প্রজাগণ রাজ-ভক্ত হইয়াছিল। মহারাজা মাধব রাও'র কার্য্য-প্রণালীতে প্রীত হইয়া তাঁহার কার্য্যদক্ষতার ও সুবুদ্ধিমত্তার ভুয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৮৫৬ সালে মাধব রাও ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান নিযুক্ত হন।

তিনি ১৪ বৎসর কাল এই দেওয়ানী কার্য্য করেন; এবং এই সময়ের মধ্যে ঐ রাজ্যের সমূহ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। মাধব রাও ত্রিবাঙ্কুরের শাসন-ভার গ্রহণ করার পূর্ব্বে ঐ রাজ্যের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাজ্যের দুরবস্থা দেখিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট উহা ভারতেশ্বরীর রাজ্য-ভুক্ত করিয়া তাঁহাদের শাসনাধীনে আনিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে মাধব রাও'র কার্য্যকুশলতা এবং সুবন্দোবস্তে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা পায়। তাঁহার অধ্যবসায় গুণে ও অবিশ্রান্ত চেষ্টায় সেই রাজ্যের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। তাঁহারই উৎসাহে সেই রাজ্যের আপামর সাধারণের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। তাঁহারই চেষ্টায় ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত সম্বন্ধে ও অন্যান্য অনেক আবশ্যকীয় বিষয়ে নানাপ্রকার সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। লবণের আমদানি ও রপ্তানির শুল্কের হ্রাস তাঁহারই সময় হয়। মাধব রাও'র কার্য্যপ্রণালীতে ব্যয়-বাহুল্য ছিল বটে; কিন্তু তাঁহার সমস্ত কার্য্য এমন সুশৃঙ্খলা এবং সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইত যে, সকল ব্যয়-ভার বহন করিয়াও পরিশেষে রাজ্যের আয় তিনি অনেক বেশী দেখাইতে পারিতেন। তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতেন। তাঁহার মস্তিষ্কের ক্ষমতা অসাধরণ ছিল।

১৮৮৬ সালের এপ্রিল মাসে দেওয়ান মাধব রাও তাঁহার সমস্ত সুকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে কে, সি, এস, আই, উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭১ সালের মে মাসে স্যার টি, মাধব রাও ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ানের পদ হইতে মাসিক ৫০০৲ টাকা পেন্সনে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার পরে যে, তিনি বহু দিবস কার্য্যের ঝঞ্ঝাট হইতে দূরে থাকিয়া বিরাম ভোগ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে। ৯ মাস গত হইতে না হইতে ইন্দোরের মহারাজা হোলকার, স্যার টি, মাধব রাওকে তাঁহার প্রধান সচিবের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। ৩ বৎসরের অধিক কাল ঐ কার্য্যে তিনি থাকিবেন না, এই বন্দোবস্তে স্যার টি, মাধব রাও ইন্দোরের প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। এই মন্ত্রীর কার্য্য কালে বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক বিলাত গিয়া ফিনেন্‌স্ কমিটীর সমীপে সাক্ষ্য প্রদান পূর্ব্বক রাজস্ব সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিতে স্যার টি, মাধবকে অনুরোধ করেন। কিন্তু ইন্দোরের রাজকার্য্যের অবস্থা তখন বড় ভাল ছিল না; সুতরাং মহারাজা হোলকার সার টি, মাধবকে মন্ত্রিপদ হইতে কোন মতেই অবসর দিতে পারিলেন না। ইন্দোরের মন্ত্রিত্বের সময়ে স্যার টি, মাধব রাও যদিও তাঁহার স্বেচ্ছামত সমস্ত কাজ করিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি যাহা কিছু করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার ধীশক্তির ও কার্য্যদক্ষতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ইন্দোরেরও তিনি অনেক আভ্যন্তরিক বিষয়ের সংস্কার করিয়া রাজ্যের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

স্যার টি, মাধব রাও ৩ বৎসর কাল ইন্দোরের সচিব থাকিবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু ২ বৎসর গত হইতে না হইতে তাঁহার স্থানান্তরে ডাক পড়িল। ১৮৭৫ সালে বরদা রাজ্য দুরবস্থাপন্ন হইয়াছিল। মহারাজা মলহার রাওর রাজ্যচ্যুতির পর তথায় রাজ্য শাসনের জন্য বিশেষ বিচক্ষণ ও পরিণামদর্শী লোকের আবশ্যক পড়িল। লর্ড নর্থব্রুক মহারাজা হোল্‌কারের অনুমতি নিয়া এই কার্য্যে স্যার টি, মাধবকে মনোনয়ন করিলেন। স্যার টি, মাধব রাও বরদার সচিব নিযুক্ত হইয়া রাজ্যটীকে বাঁচাইলেন। রাজ্যের সর্ব্ব স্থানে অরাজকতা, গোল-

মাল ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছিল; স্যার টি, মাধবের শাসনাধীনে রাজ্যে লক্ষ্মীশ্রী দেখা দিল। সমস্ত গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা ঘুচিয়া গিয়া এখন চতুর্দ্দিকে কার্য্যে সুশৃঙ্খলা ও সুবন্দোবস্ত প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার সময়ে বরদায় সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের সমস্ত সুখ-স্বচ্ছন্দতা প্রজাবর্গ ভোগ করিতে লাগিল। স্যার টি, মাধব যখন সচিবের পদে অভিষিক্ত হন, তখন বরদার ধনাগার (Treasury) সম্পূর্ণ খালি ছিল, কিন্তু তিনি অবসর গ্রহণ করিবার সময় বোম্বাইয়ের ধনাগারে বরদাধিপতি গুইকওয়ারের নামে আশি লক্ষ টাকা জমা দিয়াছিলেন। বরদায় ৭ বৎসর সচিবের কাজ করিয়া ১৮৮৩ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অবসর কালে সর্ব্ব সাধারণে তাঁহার অভাবজনিত কষ্ট প্রকাশ করিয়াছিল।

এই অবসরের পর স্যার টি, মাধব রাও যে চুপ করিয়া ছিলেন তাহা নহে। দেশের উন্নতি-কল্পে সর্ব্ব সময়েই তিনি সচেষ্ট ছিলেন। ৩।৪ বৎসর হইল মান্দ্রাজে যখন জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হয়, তৎকালে স্যার টি, মাধব অসুস্থাবস্থাপন্ন থাকা সত্ত্বেও অভ্যর্থনা-সভার (Reception Committee) সভাপতি (Chairman) নিযুক্ত হইয়া ঐ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

যখন আমাদের মহারাণী "ভারতেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ করেন, তখন স্যার টি, মাধবকে রাজা উপাধি প্রদান করা হয়। তাঁহাকে একবার বড়লাটের সভায় সদস্যের পদ প্রদান করা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। রাজস্বের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে স্যার টি, মাধবের অসাধরণ ক্ষমতা ছিল। আমাদের ভারতের রাজস্বের সুবন্দোবস্ত এ পর্য্যন্ত কেহই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ভারত গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে স্যার টি, মাধবের সাহায্য একবার নিয়া দেখিলেন না, ইহাই ক্ষোভের বিষয়। ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই স্যার টি, মাধবের প্রতিভা সম্পূর্ণরূপে বিস্তার পাইতে পারিল না। ইয়োরোপে জন্ম গ্রহণ করিলে তিনি আরও কত বড় উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিতেন, বলা যায় না।

রাজা স্যার টি, মাধব রাও চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার যশঃ ও কীর্ত্তি রহিয়া গিয়াছে। ভারতবাসী চিরদিন তাঁহার নাম অনুরাগের সহিত হৃদয়ে পোষণ করিবে। তাঁহার সম্মানার্থ ত্রিবাঙ্কুর ও বরদার সমস্ত কার্য্যালয় এক দিবস বন্ধ ছিল। রাজা তিনটী পুত্র ও তিনটী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। প্রথম পুত্র মহিসুর গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি; দ্বিতীয় পুত্র মাদুরার ডেপুটী কলেক্টর; এবং তৃতীয় পুত্র বার্দ্ধক্যাবস্থায় পিতার সেবা শুশ্রূষায় ও সুখ-স্বচ্ছন্দ বিধানে নিযুক্ত ছিলেন। ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় রাজা স্যার টি, মাধব রাও মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য এবং অন্যান্য নানা সাধু সংকল্পে তিনি ৭ লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন।

বালকের জয়।

(একটী-প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।)

গ্রীষ্মকাল। সমস্ত দিবস কাঠ-ফাটা রৌদ্র গিয়াছে। বেলা অপরাহ্ণ ৪টা হইয়াছে; কিন্তু সমস্ত পৃথিবীকে দগ্ধ করিবার জন্য এখনও

সূর্য্যদেব যেন অগ্নি ঢালিতেছেন। এই অগ্নির অসহ্য উত্তাপে গাছ পালা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। কত মানুষ, গরু, ঘোড়া ইত্যাদি মারা যাইতেছে। এ আগুনে ধনীর বিশেষ কিছু আসে যায় না; কারণ ইহার উত্তাপ নিবারণ করিবার উপায় তাঁহাদের আছে। তাঁহাদের দশজন দাস দাসী আছে; বাহিরের কাজকর্ম্ম দেখিবার লোকজন আছে। মঞ্চোপরে সুকোমল শয্যায় পাখার সুশীতল বাতাসে সুনিদ্রায় তাঁহাদের সময় কাটিয়া যাইতেছে। এ অগ্নির উত্তাপে মরণ দুঃখী গরীবের, মরণ শ্রমজীবীদের, এবং ততোধিক মরণ গরু, ঘোড়া প্রভৃতি ইতর জন্তুর। কারণ এই বাক্‌শক্তিহীন প্রাণীগণের সাহায্যেই অধিকাংশ শ্রমজীবী তাহাদের উপজীবিকা সংগ্রহ করে। যাঁহারা কলিকাতা কিম্বা অন্য কোন বাণিজ্য ব্যবসাপূর্ণ প্রধান নগর দেখিয়াছেন, তাঁহারা গ্রীষ্মকালে গরু ঘোড়ার কি কষ্ট, তাহা নিশ্চয়ই অনুভব করিয়াছেন।

আজ বৈশাখ মাসের বেলা অপরাহ্ণ ৪টার সময় এক গাড়োয়ান তাহার গাড়ীখানি ইষ্টকে পূর্ণ করিয়া কলিকাতার একটী বড় রাস্তা দিয়া টেঙ্গস্ টেঙ্গস্ করিতে করিতে যাইতেছে। গাড়ীর গরু দুইটী সমস্ত দিন খাটিয়া এখন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের চলিবার শক্তি আর নাই। কিন্তু তাহাদের এ কষ্ট বুঝিবে কে? সেরূপ হৃদয়ই বা কয়জন লোকের আছে! গরু দুইটীর আর পা চলিতেছে না বটে; কিন্তু এ দিকে সেই গাড়োয়ান গাড়ী দ্রুতগতিতে চালাইবার জন্য বারম্বার তাহাদের পৃষ্ঠে ভয়ানক প্রহার করিতে লাগিল। আহা! একে সমস্ত দিনের বিষম খাটুনিতে হতভাগাদের শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর আবার নিষ্ঠুর গাড়োয়ানের প্রহারে তাহাদের প্রাণ বাহির হইতেছিল; কিন্তু তাহাদের এমন বাক্‌শক্তি নাই যে তাহাদের কষ্ট প্রকাশ করে—সেই নির্দ্দয় গাড়োয়ানকে বুঝাইয়া বলে,—"প্রভু, আর প্রহার-যন্ত্রণা দিও না; সমস্ত দিনের খাটুনিতে শরীর আমাদের অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, আর আমরা পারি না।"

যে কারখানায় ইট নিয়া যাইবার কথা, তাহা আর বড় অধিক দূরে ছিল না। কিছু কালের মধ্যেই গাড়োয়ান গরু দুইটীকে আধ-মড়া করিয়া কোন মতে ইষ্টকপূর্ণ গাড়ী খানি সেই কারখানার নিকট উপস্থিত করিল। কিন্তু এতক্ষণে আবার আর এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। রাস্তার সমতল হইতে সেই কারখানা ভূমি একটু উচু ছিল; সুতরাং সেই রাস্তা হইতে গাড়ীখানি কারখানাভূমির মধ্যে নিতে হইলে খানিকটা উচুদিকে টানিয়া তুলিবার আবশ্যক। কিন্তু সেই বিষম-বোঝাই-গাড়ী উচুতে টানিয়া তুলিবার শক্তি গরু দুইটীর আর এখন কিছুমাত্র ছিল না। কারখানার দরজার সম্মুখে আসিয়া ২। ৩ বার প্রথমতঃ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া একটুও উচুতে তুলিতে না পারিয়া, সেই হতভাগ্য পশুদ্বয় গা ছাড়িয়া দিল। এদিকে সেই নিষ্ঠুর গাড়োয়ানের অবিশ্রান্ত কশাঘাতে তাহাদের সর্ব্বশরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত হইল। এই নিষ্ঠুরাচরণ দেখিয়া চতুর্দ্দিকে লোক জড় হইল, অনেকে গাড়োয়ানকে তিরস্কার ও কটূক্তি করিতে লাগিল; কিন্তু সেই ইতর গাড়োয়ান তাহা সুদে আসলে ফিরাইয়া দিতে লাগিল, এবং ক্রোধান্ধ হইয়া গরু দুইটীকে আরও প্রহার করিতে আরম্ভ করিল।

ক্রমশঃ।

স্থানাভাবে ধাঁধার উত্তর এবং নূতন ধাঁধা দেওয়া গেল না।
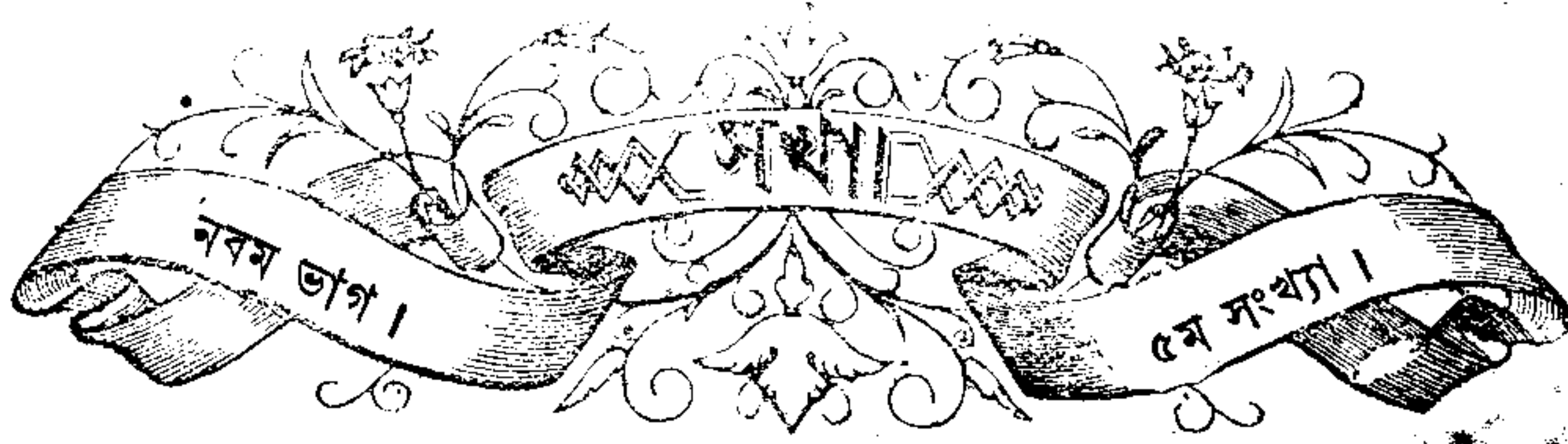
সখা
নবম ভাগ। ৫ম সংখ্যা।
মে, ১৮৯১।
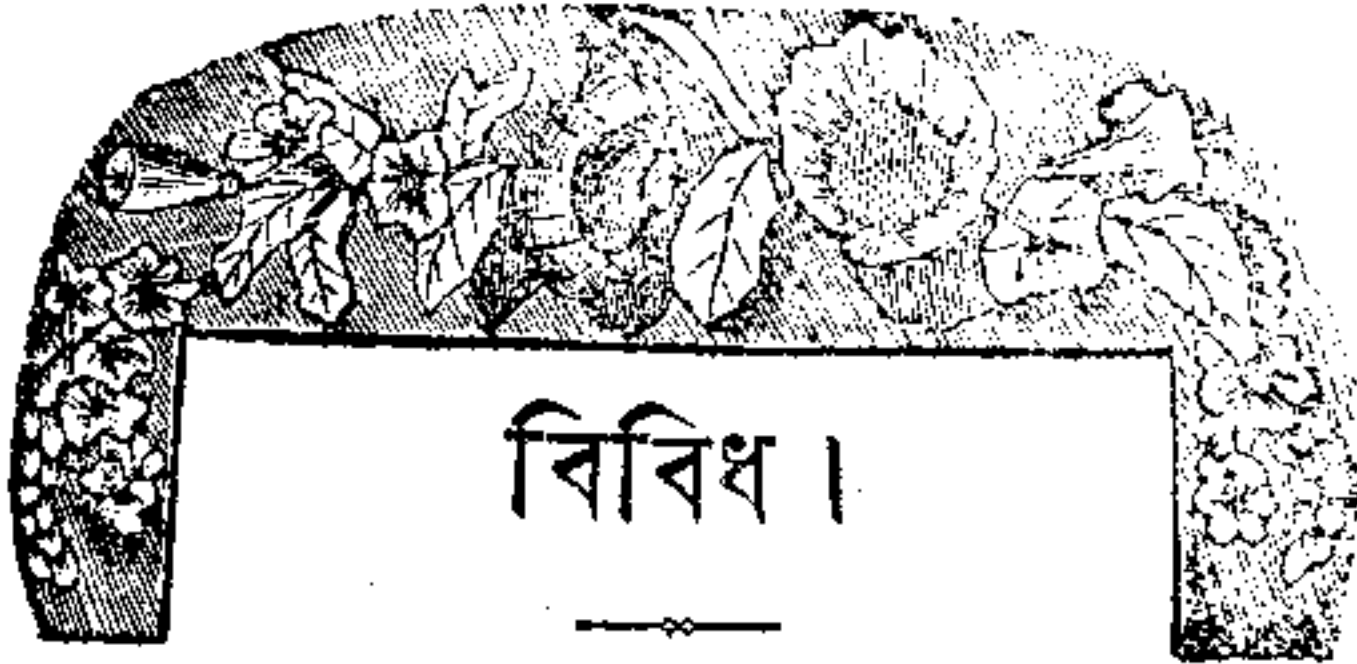
বিবিধ।

বাঙ্গালীর স্বার্থত্যাগ।—কলিকাতা নিবাসী বাবু নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মুন্সেফের কাজ করিতেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি বোম্বাইএর কোন লাইফ ইনসিয়রেন্স কোম্পানিতে পঁচিশ হাজার টাকার 'জীবন বিমা' করেন। কিছু কাল পর তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন। রুগ্ন অবস্থায় তাঁহার মনে এরূপ চিন্তার উদয় হইল যে, অল্প দিন পূর্ব্বে তিনি যে জীবন বিমা করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তখন হইতেই ব্যারামের সূত্রপাত্র হইয়াছে। এরূপ ধারণা হওয়াতেই তিনি টাকা গ্রহণ করা অন্যায় বলিয়া উপলব্ধি করিলেন। বলা বাহুল্য, ডাক্তার শরীর পরীক্ষা করিয়া যখন নিরোগী বলিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন এবং কোম্পানি জীবন বিমা গ্রাহ্য করিয়াছেন, তখন জীবন বিমা হওয়ার পর অল্প দিন মধ্যে মৃত্যু হইলেও কোম্পানি চুক্তি অনুসারে টাকা দিতে বাধ্য। কিন্তু তিনি স্বর্গীয় আদেশে অণুপ্রাণিত হইয়া জীবন বিমা কোম্পানিকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর জীবন বিমার পঁচিশ হাজার টাকা যেন উত্তরাধিকারীদিগকে দেওয়া না হয়। জীবন বিমা কোম্পানি মহাত্মা নীলমাধবের এই সাধুতা ও স্বার্থত্যাগ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। ইহার অল্প দিন পরেই এই মহাপুরুষ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

* *
*

মণিপুরের সংবাদ।—মণিপুর রাজ্য সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ-রাজের কর-কবলিত হইয়াছে। রাজা ও তাঁহার তিন ভ্রাতা সকলেই ইংরেজ সৈন্যের আগমনে পলায়ন করিয়াছিলেন। রাজা কুলচন্দ্র সিংহ, সেনাপতি টেকেন্দ্রজিৎ সিংহ, তাঁহাদের দুই ভ্রাতা অঙ্গ সিংহ ও জেলা গুণ্ডা ইংরেজ হস্তে বন্দি হইয়াছেন। কুইণ্টন সাহেবদের হত্যাকাণ্ডে আর আর যাহারা সংসৃষ্ট ছিল, তাহারাও ধৃত হইয়াছে। হত্যাকাণ্ডে সংসৃষ্ট ব্যক্তিদের বিচার জন্য কয়েকজন বিচারক নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা মণিপুরে বসিয়া বিচার করিতেছেন। যাঁহাদের ফাঁসীর হুকুম হইতেছে, ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া তাঁহাদের ফাঁসী হইবে। কুইণ্টন সাহেব টেকেন্দ্রজিৎ বাহাদুরকে বন্দী করার জন্য যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য হইয়াছিল বলিয়া বিলাতের লোকে ভারত গবর্ণমেণ্ট ও কুইণ্টন

সাহেবকে অনুযোগ করিতেছেন। তাহা লইয়া মহা-সভা পার্লেমেণ্টে তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে।

* *
*

কৃষ্ণপর্ব্বত ও মিরণজাই সংগ্রাম।—কৃষ্ণপর্ব্বত ও মিরণজাইতে যে সকল পার্ব্বত্য জাতি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা ইংরেজের গোলার প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। এই দুই স্থানের লড়াই একরূপ শেষ হইয়াছে,—সৈন্যগণ ফিরিয়া আসিতেছে।

* *
*

বন্য যুবক।—অষ্ট্রেলিয়া দেশে ইনক্‌স্ অন্তরীপের জঙ্গলের মধ্যে একটী ১৬ বৎসরের মানুষ পাওয়া গিয়াছে। তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রীতিমত বিকশিত হইয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ৪ ইঞ্চ লম্বা লোমে আবৃত; চুল ৪ ফুট ও হাতপার নখ এক একটা ৫ ইঞ্চ লম্বা। তাহাকে ধরার জন্য অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই,—সহজেই ধরা দিয়াছিল। সে এখনও কথা কহিতে পারে না,—সুতরাং তাহার সম্বন্ধে কোনও কথাই জানা যায় নাই। শীঘ্রই কথা বলিতে সমর্থ হইবে বলিয়া আশা করা যায়,—তাহার সে চেষ্টা জন্মিয়াছে।

বিধিলিপি।

(৪৭ পৃষ্ঠার পর।)

শিবু।—"যাও যাও ঐ দিকে যাও, তোমার কথা কৈতে হ'বে না। খেলার মধ্যে ওসব কথা কেন?"

মাতা।—"ওসব যদি খেলা হয়, তবে আমি একটা সত্যি কথা বলি। ঘরে আজ খাবার কিছুই নেই; চাল, ডাল, লুণ, তেল সব যেন কে হরে নিয়ে গিয়েছে। বাজারে গিয়ে জিনিস পত্র আন্‌বে, তবে আজ রাত্রে উনুন জ্বল্‌বে।" এই কথা বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। কথাগুলি অবশ্যই উচ্চ গলায় বলেন নাই, ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিয়াছিলেন বটে; কিন্তু এরূপ ফিস্ ফিস্ যে জামাতা যেন সমস্তই সম্যকরূপে বুঝিতে পারেন।

জামাতা কহিলেন—"রেখে দিন শিব বাবু আর খেলায় কাজ নাই; চলুন আমরা একবার বাজার দেখে আসি। দুটা ছাতা আনুন, আর বাটীর ভিতর আমার 'কুরিয়ার' ব্যাগ আছে, সেটা আনুন।"

শিবু—"এখন এ বৃষ্টিতে কোথায় যাব?" কিন্তু এই কথা ও ইহার আনুসঙ্গিক আর দু এক কথা বলিতে বলিতে ছাতা, ব্যাগ আনিয়া জামাতার সম্মুখে রাখিলেন। অনন্তর উভয়ে বাজারে গিয়া অন্তত এক মাস চলে এরূপ খাদ্য দ্রব্যাদি আনয়ন করিলেন। জামাতা যৎকালে শিব বাবুর সহিত বাজারে যান, তখন শ্বশুর মহাশয় দু এক বার "এত বৃষ্টিতে বাজারে যাওয়া কেন, এত বৃষ্টিতে বাজারে যাওয়া কেন?" কহিলেন; কিন্তু পাছে যদ্বলিতং তৎ ফলিতং হয়, এজন্য আর অধিকবার সে অমঙ্গল সূচক বাক্য উচ্চারণ করিলেন না।

সে দিবস রাত্রে জামাই জামাই-আদরে আহার করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সম্বন্ধ।

বাজার হইতে দ্রব্যাদি আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ায়, সকলের আহার করিতে বসিতেও বিলম্ব হইল। কিন্তু এরূপ আহার্য্য দ্রব্য থাকিলে কিঞ্চিৎ বিলম্বে কেহই বিচলিত হয় না। ডাল, মাছের ঝোল, মাছের কালিয়া, মাছভাজা, এ সমস্তগুলি আবার সুন্দররূপে রন্ধন করা। জামাতা যদি নূতন হইতেন, বোধ হয় তাহা হইলে এ সমস্ত খাদ্য দ্রব্যের ক্রিয়াগত যথা বিহিত সমাদর করিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি এতবার আসিয়াছেন যে, তাহাকে বাটীর পরিবারস্থ একজন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অন্যান্য চারিজন জামাতা আসিতেন বটে, কিন্তু ওরূপ সর্ব্বদা নহে। বোধ হয় আদরের তারতম্য লক্ষিত হইত বলিয়া তাহারা আসিতেন না।

আহার করিতে করিতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় রায় মহাশয়ের অবিবাহিতা কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কহিলেন,—"সুখদা ত বিবাহের যোগ্য হইয়াছে, অথবা কিঞ্চিৎ ছাড়াইয়া গিয়াছে বলিলেও বলা যাইতে পারে। এক্ষণে আমার বিবেচনায় যত শীঘ্র হয়, তাহার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।"

শ্বশুর মহাশয় উত্তর করিলেন,—"আমার কি সে বিষয়ে যত্ন নাই? কত স্থান হইতে কত রূপ কথা আসিতেছে, তার ঠিক নাই। কিন্তু কোন জায়গায় পাত্রের অবস্থা ভাল নয়, কোন জায়গায় পাত্রটী দেখিতে খারাপ, এইরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ বিবাহটা দেরি হইয়া গিয়াছে। তোমাদিগের ওঅঞ্চলে যদি একটী দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল, সদ্‌ব্রাহ্মণের পুত্র অথচ কিঞ্চিৎ সংগতি আছে এরূপ পাত্র খুঁজিয়া পাও, তবে বড়ই ভাল হয়। তোমাদিগের দেশে ধানের ও মাছের অসদ্ভাব নাই, দুই অজচ্ছল মেলে।"

পাত্রের অসদ্ভাবে যে এত কাল বিবাহ বন্ধ আছে, তাহা নহে। প্রকৃত কারণ টাকা। রায় মহাশয় গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া রাখিয়াছেন যে, এক কন্যা হইতে উভয় কন্যার মূল্য উশুল করিবেন। কন্যা একটু বয়স্থা না হইলে সেটী কোন রূপেই সংঘটিত হইতে পারে না। তাহাদিগের বিবেচনা যে পাকা, বৎসর বৎসর তাহার পরিচয় পাইয়া আসিতেছেন। ৭ বৎসরের সময় কন্যাটীর ৪ শত টাকা দাম হইয়াছিল, পরে বৎসর বৎসর এক শত করিয়া বৃদ্ধি হইতেছে। এক্ষণে তাহার বয়স ১৪ বৎসর, মূল্যও ৯০০৲ টাকা হইয়াছে। বোধ হয়, এই কন্যাটী এবং ইহারই পিতা মাতাকে লক্ষ করিয়া "নয়শ রূপেয়া" লেখা হইয়াছিল।

শ্বশুর মহাশয়ের কথা শুনিয়া জামাতা ক্ষণকাল মৌনভাবে রহিলেন। পরে মুখ তুলিয়া কহিলেন,—"আমার একটী খুড়তুতো ভাই আছে। তাহার বয়স যে অধিক তা নয়, তবে কি না তাহার প্রথম স্ত্রী মারা পড়িয়াছে। তাহাদিগের অবস্থাও নিতান্ত মন্দ নয়, আমারই অর্দ্ধেক সরিক। আমি এখানে আসিবার সময় সে এ কথার প্রস্তাব করিতে বলিয়াছিল।"

রায় মহাশয় মনে মনে নিজ মনকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"মন স্থির হও, তুমি যাহা চাহিতেছিলে, জামাতা বাবাজী তাহারি প্রস্তাব করিয়াছেন।" বস্তুত জামাতার বাটীতে আর একটী কন্যাকে বিবাহ দিবেন, এ তাঁহার বহুকালের বাঞ্ছনীয় কথা। জামাতার খুল্যতাত ভ্রাতা যে

গৃহ শূন্য হইয়াছেন, এ কথা পূর্ব্বেই জানিতেন, এবং তদবধি স্ত্রী পুরুষে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন, যদি ঐ সম্বন্ধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আর অন্যত্রে কন্যার বিবাহ দিবেন না। তাহার কারণ, তাঁহারা অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নহে। জামাতার নিকট হইতে আট শত টাকা লইয়াছিলেন। অধিকন্তু ক্রয় বিক্রয় কার্য্যে বিবাহের পরদিন হইতে শ্বশুর বাটীর সহিত জামাতার আর কোন সংশ্রব থাকে না, কিন্তু তাঁহার জামাতা সেরূপ নহেন। তিনি প্রতি বৎসর একবার তাহার স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেন। যথাসময়ে শিব বাবু একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া ভগিনীকে আনিতে যান। প্রত্যাগমন সময়ে নৌকাখানি নানাবিধ দ্রব্যে পূর্ণ করিয়া লইয়া আইসেন। যাতায়াতের নৌকাভাড়া জামাতা দিয়া থাকেন। এক মাস, দেড় মাস পরে জামাতা নিজে তাঁহার স্ত্রীকে লইতে আইসেন। তিনিও আসিবার সময় নৌকাখানি পূর্ণ করিয়া আনেন। ইহাতে তাঁহার অধিক ব্যয় ছিল না। তাঁহারা চাষী গৃহস্থ, সুতরাং ক্ষেতের ধান, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের সরিষা দিতে তাঁহাদিগের আর কষ্ট কি?

জামাতার প্রস্তাব শুনিয়া রায় মহাশয় ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"তাতে ক্ষতি কি? কিন্তু কথাটা এই যে, আমরা একটী হারাইয়াছি। আমরা জন্মান্তরে যে কতই পাপ করিয়াছিলাম, তাহা বলা যায় না। শ্রোত্রীয়ের গৃহে জন্মিয়া শ্রোত্রীয়ের কাজ করিতে পারি না, একি কম দুঃখের বিষয়? কুলক্রিয়া করাই শ্রোত্রীয়দিগের জাতিধর্ম্ম, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদিগের অদৃষ্টে তাহা সহিল না। সেই জন্যই তো আমাদিগের এরূপ কুক্রিয়া করিতে হয়। বোধ হয় লোকে আমাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, কিন্তু কি করি, সন্তান শোক যে কি শোক, তাহা তো যারা ঠাট্টা করে, তারা জানে না। পরমেশ্বর যেন জান্তেও না দেন।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। জামাতাও ঢাকের সঙ্গে কাঁশী স্বরূপ একটী "খর্ব্ব" দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"মহাশয় অদৃষ্টের ফল কার সাধ্য খণ্ডায়? দেখুন, রাম রাজা হবেন বলে সমস্ত আয়োজন। নিজে বশিষ্ট শুভ দিন দেখিয়া দিলেন, কিন্তু অদৃষ্ট বশে তাঁকে বনে যেতে হলো, দশরথ প্রাণত্যাগ কর্‌লেন। শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠানে কি এ সকল ঘটা উচিত? তার পর তো সীতা হরণ ইত্যাদি আপনি সকলি জানেন। ধনঞ্জয়ের পুত্র সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয়, তাঁকেও অকালে মরিতে হইল।" জামাতা চুপ করিলেন। শ্বশুর একবার "হা" করিলেন। দ্বারের অন্তরালে শাশুড়ী ঠাকুরুণ অঞ্চল দ্বারা নাসিকা সংস্কার করিলেন। পরে ক্ষণকাল সকলেই নিস্তব্ধ। এই ভাবে প্রায় দু মিনিট কাটিয়া গেল। শিব বাবু আর একটু কালিয়া চাহিলেন। তাঁহার জননী কালিয়ার থালা দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া রঙ্গভূমিতে প্রবেশিয়া সর্ব্বসমক্ষে একবার অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মার্জ্জন করিয়া পুত্রের থালায় কালিয়া দিয়া, সকলেই শুনিতে পায় এইরূপ ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন,—"শিবু রান্না কেমন হয়েছে? জিজ্ঞাসা কর, জামাইকে আর একটু দেব?" শিবুর গালে এক গাল ভাত, সেগুলি না গিলিয়া যুগপৎ দুই কার্য্য করিতে পারেন না। কিন্তু সে জন্য কোন ক্ষতি হইল না। জামাতা কহিলেন,—"যদি দেন, তবে আমাকেও আর একটু দিন; অন্ন ব্যঞ্জন অতি পরিপাটী হয়েছে।" জামাতাকে দিয়া নিজ "সহধর্ম্মাকেও" ভুলিলেন না। তাঁহাকেও কিঞ্চিৎ দিলেন। তিনিও রন্ধনাদি ভালই হইয়াছে স্বীকার করিলেন।

পরে রন্ধনাদি সম্বন্ধে দুই চারি কথা হইয়া গেল। পরিশেষে দুগ্ধের বাটী ভোজন পাত্র সন্নিহিত সমা-

গত হইলে, জামাতা কহিলেন,—"মহাশয় এবার আর আমার অধিক দিবস থাকা হইবে না। যে প্রস্তাব করিলাম, তাহার কোন একটা জবাব পাইলে, আমি সত্বর গিয়া আমার খুড়তুতো ভাইকে বলিতে পারি।"

"এত ব্যস্ত কেন? তুমি ত আর কল্য প্রাতেই যাচ্ছ না?"

"আচ্ছা প্রাতে না যাই, কল্য বৈকালে অবশ্যই যেতে হবে?"

"এই বৃষ্টিতে?"

"কি করি মহাশয়? আমরা চাষী গৃহস্থ, আমাদের এ দিনে বসে থাক্‌বার সময় নয়।"

"আচ্ছা, পরামর্শ করে কাল যা হয় বল্‌ব?"

রাত্রিতে কর্ত্তা ও গৃহিণী নানাবিধ পরামর্শ করিলেন। রাবণ কুম্ভকর্ণে যেরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, অদ্যও তাঁহাদিগের মধ্যে সেইরূপ হইল। "কুম্ভকর্ণ বলে রাম হবে ব্রহ্মচারী; রাবণ বলে, তবে তার সঙ্গে কেন নারী? কুম্ভকর্ণ বলে, রাম হবে রাজার ব্যাটা; রাবণ বলে, তবে তার মাথায় কেন জটা"—ইত্যাদি। কখন রায় মহাশয় কুম্ভকর্ণ হন, রায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী রাবণ হন; কখন বা ঠিক তাহার বিপরীত রূপ ঘটনা হয়। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর, এই স্থির হইল, জামাতা নিজের বিবাহে ৮০০৲ দিয়াছিলেন, যদি এ বিবাহেও তাহাই দেন, তবে তাঁহার ভ্রাতার সহিত তাঁহাদিগের কন্যার বিবাহ হইবে না। কারণ নিজ গ্রামে দেখিতে শুনিতে সুন্দর, সুশিক্ষিত একটী পাত্র ঐ কন্যার জন্য লালায়িত হইয়াছে। তাহার পিতা মাতা ৮০০৲ টাকা দিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা নিতান্ত অসম্মত। কিন্তু এ কার্য্য করিলে কন্যা নিকটে থাকিবেক, যখন তখন ইচ্ছা হইলে দেখা যাইবেক। ও বিবাহে সেই ৮০০৲ টাকা অথচ কন্যা দূরে, কালে ভদ্রে দেখা যাইবে কিন্তু তাহারও ঠিক নাই, কারণ জামাতার খুল্যতাত ভ্রাতার গৃহে অপর আর কোন স্ত্রীলোক নাই।

পর দিবস প্রাতে সকলে বহির্বাটীর বারান্দায় উপবিষ্ট আছেন। ভৃত্য ঘুঁটের আগুনে মুহুর্ম্মুহু তামাক দিতেছে। কিন্তু বর্ষার প্রভাবে দু একবার হুকা টানিতে শৈথিল্য হইলেই নিবিয়া যাইতেছে। আবার তামাক দিতেছে, আবার ঘুঁটের আগুন কলিকায় সাজাইতেছে, আবার নিবিতেছে ইত্যাদি। অর্থাৎ কথাটা মিষ্ট করিবার জন্য যতবার উপর্য্যুপরি বলিবার দরকার, পাঠকবর্গ নিজ নিজ প্রয়োজনানুসারে ততবার পড়িয়া লইবেন। কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া, আমি আর অধিকবার এক কথা লিখিলাম না। শ্বশুর ধূমপান করিয়া হুকাটী জামাতার হস্তে দিতেছেন, কিন্তু জামাতা খুঁটীর আড়ালে যাইতে না যাইতে আগুন নিবিয়া যাইতেছে। আবার দিতেছেন, আবার আগুন নিবিতেছে ইত্যাদি। শিব বাবু বিছানার একধারে বসিয়া সহোদরের জন্য একটী তালপাতার পাখী প্রস্তুত করিতেছেন। ভৃত্য বারান্দার অপর পার্শ্বে বসিয়া তালপত্র দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আসন প্রস্তুত করিতেছে। এদিকে বৃষ্টিও হইতেছে, কিন্তু অদ্য পূর্ব্বকার ন্যায় বেগে নয়। পাঠক বোধ হয় জিজ্ঞাসিবেন, এত তালপত্র কোথা হইতে আসিল? তাহার উত্তর এই, জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠীর অগ্রে সকলেই নিজ নিজ বৃক্ষের ফল কর্ত্তন করে ও তৎসহ বৃক্ষের পত্রাদিও কাটিয়া ফেলে। ঐ পত্র হইতে বালকদিগের লিখিবার পত্র হয়, খেলনা হয় ও আসন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্ষণকাল সকলে নিঃশব্দে থাকিয়া, জামাতা জিজ্ঞাসিলেন,—"আমার প্রস্তাবের কি কিছু বিবেচনা করা হ'য়েছে?"

শ্বশুর। "হাঁ বাপু, আমিও সেই কথা উত্থাপন করিব মনে করিতেছিলাম। তোমাদিগের ঘরে কন্যা যাইবে, কন্যার পক্ষে অন্ততঃ সৌভাগ্যের কথা, তার ভুল নাই। দুই ভগিনী এক স্থানে এক গৃহে থাকিবে, বাপ মায়ের পক্ষে এ ভিন্ন আর কি সুখের কথা হইতে পারে? কিন্তু বাপু, একটা কথা এই, একে ত আমরা শ্রোত্রীয়ের অনুচিত কার্য্য করিতেছি—পাপ করিতেছি বলিলেই হয়। এ সমস্ত অদৃষ্টের কথা ও পূর্ব্ব জন্মের দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ মাত্র। কিন্তু যেখানে দেই, যাতে পেপ্‌টা ভরে তা দেখা উচিত। এখানে এক ব্যক্তি ৮০০৲ টাকা দিতে রাজী আছে, তোমার খুড়তুতো ভাই যদি কিঞ্চিৎ অধিক না দেন, তবে ব্রাহ্মণীর ইচ্ছা, এই খানেই কার্য্য করা। কারণ তা'হ'লে মেয়েটীকে রোজ রোজ দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। সেই যে কন্যাটা মারা পড়েছে, সেই অবধি আর তিনি করুকে কাছ ছাড়া করিতে চান না। জানতো মেয়ে মানুষ কত অবুঝ? তবে পেটে খেলে পিঠে সয়, বুঝলে কি না?"

ক্রমশঃ।

স্বর্ণলতা-প্রণেতা।

ভিখারী ভ্রমর।

১

"কি বলিব, গুণ গুণ গুণ—
অভাগার কপালে আগুন!
যূথি, জাতি, গন্ধরাজ,
কর করুণার কাজ,
তোমরাই চিরদিন দয়ায় নিপুণ,
দুয়ারে গরীব ডাকে হও সকরুণ!

২

গুণ গুণ—কি বলিব আর,
কা'ল মোটে জোটেনি আহার!
গিয়েছিনু ঘুরে ঘুরে,
আকন্দ ধুতুরা পুরে,
দেখিনু ভাণ্ডার খালি তাঁহা সবাকার,
গুণ গুণ—কা'ল মোটে জোটেনি আহার!

৩

গুণ গুণ—পারি না থাকিতে,
তাই, ভিক্ষা এসেছি মাগিতে;
এ অধম অভাগার
কেবা আছে আপনার,
তোমরা রাজার ছেলে, রাজার দুহিতে,
তোমরাই আসিয়াছ কাঙ্গালে তুষিতে!

৪

গিয়াছিনু কেতকীর বাড়ী,
তিনি শুধু করিলেন আড়ি!—
দয়া মায়া পরিশূন্য
শুধু নিঠুরতা পুর্ণ,
ক্ষুধার্ত্ত ভিখারী গায়ে দেন কাঁটা বাড়ি!—
ভয়েতে প্রণমি তাঁরে আসিয়াছি ছাড়ি!

৫

নিঠুরের নিঠুর পরাণ,
দুখী দেখি করে কত ভাণ!
তোমরা দয়ার নিধি,
গড়েছে দয়াল বিধি,
ভিখারীর স্নেহ, সুখ আরামের স্থান;
গুণ গুণ—তোমাদের গুণ করি গান।

৬

যবে আসি এ সুখ-ভবনে,
দেখা হ'ল মৌ-মাছির সনে;
ভায়ারা চতুর ভারি,
গাঁথিছে প্রকাণ্ড বাড়ী,
দেখিয়া "উন্নতি" বড় সুখ হ'ল মনে—
আমিই পেটের দায়ে ফিরি বনে বনে!

৭

কি বলিব—গুণ গুণ গুণ,
ভিখারীর কপালে আগুন!
গোলাপ, বকুল, বেলা,
কাঙ্গালে করো না হেলা,
দুয়ারে ডাকিছে দাস হও সকরুণ,
ভুলিব না এজনমে তোমাদের গুণ!"

৮

সে করুণ মিনতি শুনিয়া,
ফুল কুল উঠিল জাগিয়া;
এক বিন্দু মধু তরে
দীন অলি ভিক্ষা করে,
স্নেহের নয়নে তারে দেখিল চাহিয়া,
আনন্দে অমিয় দিল যতন করিয়া।

৯

কাঙ্গালেরে দয়া যেই করে,
সুখে তার মন প্রাণ ভরে;
আমার স্নেহের ধন,
পাঠক পাঠিকাগণ,
তোরাও রাখিস দয়া কাঙ্গালের প'রে,
"নিঠুর" অখ্যাতি যেন কেউ নাহি করে।

বালকের জয়।

প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

(৬৩ পৃষ্ঠার পর।)

গরু দুইটীর দুর্দ্দশা দেখিয়া যাহাদের মনে একটু দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল, এবং যাহারা সেই বাক-শক্তিহীন পশুদ্বয়ের কষ্ট নিবারণের জন্য গাড়োয়ানকে দুই এক কথা বলিয়াছিল, এখন প্রত্যুত্তরে তাহার মিষ্ট বচন শুনিয়া তাহারা আর অন্য কোন উপায় অবলম্বন না করিয়া রাগতঃ ভাবে সরিয়া পড়িল। লাঞ্ছনা পাইবার সম্ভব থাকিলে লোকে বন্ধু বান্ধবের দুঃখ কষ্ট নিবারণ করিতে প্রয়াস পায় না,—তাহাতে এই ইতর জন্তুদ্বয়ের কষ্ট নিবারণের জন্য কাহার এমন মাথা-ব্যথা হইয়াছে? গাড়োয়ান তাহার নিজের গরু নিজে মারিবে, তাহাতে তোমার আমার কি? তুমি কেন তোমার নিজের কাজে যাও না? গাড়োয়ানের নিষ্ঠুরতা দেখিয়া সেখানে যত লোক জড় হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই ঐরূপ বুঝিয়া স্ব স্ব কার্য্যে গমন করিল।

কিন্তু সকলে সমান বোঝে না; সকলে সব বিষয় সমান চক্ষে দেখে না। তাহা ছাড়া, পরের দুঃখে যাহাদের প্রাণ কাঁদে, তাহারা সকল সময়ে যুক্তি মানে না, কিম্বা নিজের স্বার্থ এবং সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকেও চাহে না। এইরূপ পরদুঃখে কাঁদিবার লোক আছে বলিয়াই এ নিষ্ঠুরতা পরিপূর্ণ পৃথিবীতে সুখ-শান্তির ছায়া মাঝে মাঝে পড়ে, এবং এত দুঃখ কষ্ট পাইয়াও লোকে বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা করে। এই যে এত লোক সেই রাস্তা দিয়া যাওয়া আসা করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে কতজনে কতভাবে গাড়োয়ানের সেই নিষ্ঠুর ব্যবহার বুঝিয়া গেল। কেহ বা সেই গাড়োয়ানকে রাগ

করিয়া দুইটা শক্ত বলিয়া গেল; কেহ বা একটু বকাবকি করিয়া গেল; কেহ বা একবার "আহা আহা" করিয়া গেল। আর কেহ বা দন্তবিকসিত করিয়া হাস্য করিয়া গেল। দশ বৎসরের বালক নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্কুল হইতে সেই রাস্তা দিয়া বাড়ী যাইতেছিল। তাহার প্রাণে কিন্তু গাড়োয়ানের সেই নিষ্ঠুর ব্যবহার বড়ই লাগিল। গরু দুইটীর দুর্গতি ও দারুণ কষ্ট দেখিয়া তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

সমস্ত স্কুল এখন ছুটি হইয়াছে। রাস্তার দুই ধার দিয়া স্কুলের ছাত্র পঙ্গপালের ন্যায় চলিয়াছে। নগেন ও তাহার অনেক সমপাঠী একত্র গল্প করিতে করিতে বাড়ী যাইতেছিল। সেই কারখানার কাছে আসিয়া রাস্তা হইতে গাড়ী কারখানার মধ্যে টানিয়া তুলিবার জন্য গাড়োয়ান গরু দুইটীকে অমন ভয়ানক প্রহার করিতেছে দেখিয়া সে বড় মর্ম্মপীড়িত হইল; এবং একটী সমপাঠীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"আহা! সুরেন, দেখেছ নিষ্ঠুর গাড়োয়ান গরু দুইটীকে কেমন করে মার্‌ছে? আহা! প্রহারে ওদের পিঠ ফেটে রক্ত পড়্‌ছে; তবুও নির্দ্দয় পামরের মনে একটু দয়া হচ্ছে না! এস, আমরা ওকে বলে কয়ে যদি নিরস্ত কত্তে পারি।"

সুরেন।—"আমরা কি করব বল? ও ছোট লোক। ওকে এক কথা বল্লে দু'কথা শুনাবে। আমাদের কোন কথায় কি ওর মনে দয়ার সঞ্চার হবে? বরং রেগে গরু দু'টোকে আরও অধিক মার্‌তে আরম্ভ করবে।"

নগেন।—"তাই বলে কি, ভাই, একবার চেষ্টা করে দেখ্‌ব না? আহা! বোবা-পশু; উহারা কথা বল্‌তে পারে না বলে কি ওদের প্রাণ নাই,—শরীরে ব্যথা নাই? দেখ্‌ছ না প্রহারে প্রহারে ওদের সমস্ত শরীর রক্তময় হয়েছে।" রাজেন্ নামে, নগেনের আর একটী সমপাঠী ছিল। নগেনের এই কথা শুনিয়া একটু রাগতভাবে বলিল,—"নগেন! তোমার বাপু সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি। সব গাড়োয়ানই তা'দের গরু অমন মেরে থাকে। গাড়ী না টানিলেই মারে। সে নিজে ত আর গাড়ী টেনে নিতে পারে না? অনেক গরু ঘোড়া বজ্জাতি করেও টানে না। তুমি এখন গাড়োয়ানকে গিয়ে কি বল্‌বে? আর তুমি ওকে কিছু বল্‌তেই বা কে? 'ওর পাঁটা যদি ও লেজে কাটে?' তোমার তাতে কি? যাও, দু'কথা বলে—তুমিও দু-ঘা অমনি ঐ ছোটলোকের হাতে খাও।"

রাজেনের এই মমতা-শূন্য কথাগুলি শুনিয়া নগেন ভারি চটিয়া গেল। সক্রোধে ও ঘৃণাসূচক স্বরে রাজেনকে সম্বোধন করিয়া নগেন বলিল,—"রাজেন্, তুমি কি? তোমার কি হৃদয় নাই? চক্ষুও নাই? গরু দু'টীর দুর্দ্দশা তুমি চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছ না? ওদের কি টান্‌বার শক্তি আছে যে, গাড়ী টেনে ঐ উঁচু জায়গায় তুল্‌বে? আর যাদের দৃষ্টান্ত তুমি দিলে, তারা কি বড় ভাল কাজ করে? তারা এই গরু ঘোড়া অপেক্ষাও অনেক অধম-পশু। ভাই, তোমরা একটু অপেক্ষা কর। আমি গাড়োয়ানকে কিছু বলিব। আমায় ও মারে মারুক। আহা! এমন করেও জীবজন্তুকে কষ্ট দেয়?" এই বলিয়া নগেন অগ্রসর হইয়া গাড়োয়ানের কাছে গিয়া বলিল,—"ভাই, গাড়োয়ান।"—গাড়োয়ান নগেনের সম্বোধন শুনিয়াই যেন তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। হস্তের চাবুক নগেনের উপর উঠাইয়া আরক্ত নয়নদ্বয় ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল,—"তুমি কি চাও? তোমাদের কি কোন কাজ নাই? আমায় দেক্ না ক'রে কি তোমরা থাক্‌তে পার না?" এবং আরও রাগে রাগে গরু দুইটীকে মারিতে লাগিল।

নগেন।—"ভাই গাড়োয়ান, একটু থাম",—

গাড়োয়ান।—"আরে মলো যা। থাম্‌ব কেন? থাম্‌লে তোরা কি আমায় কাজ করে দিবি?"

নগেন।—"ভাই, তোমার কি দয়া মায়া নেই?" দেখ্‌ছ না, তোমার এ গরু দু'টীর কি এখন আর কিছুমাত্র শক্তি আছে যে, তোমার গাড়ী টেনে তুল্‌বে? কেন ওদের ওরূপ প্রহার কচ্ছ? আহা! তোমার কশাঘাতে ওদের সমস্ত শরীর ফেটে ফেটে রক্ত পড়্‌ছে। ভাই, তোমার চক্ষু নেই? গরু দু'টী মর্‌লে ত তোমারই সর্ব্বস্ব যাবে,—আর কা'র কি হবে? এই গরু দু'টীই ত তোমার উপজীবিকার সম্বল। তোমার নিজের শরীরের যেমন যত্ন কর, এদেরও সেইরূপ যত্ন করা উচিত। তুমি ক্রোধান্ধ হ'য়ে আজ তোমার পরিবারের উপজীবিকার একমাত্র সম্বল এই গরু দু'টীকে একেবারে মেরে ফেল্‌তে উদ্যত হয়েছ! ভাই, তুমি সমস্ত দিন খেটে খেটে পরিশ্রান্ত হয়েছ। তুমি একটু ব'স—সুস্থির হও। আর ততক্ষণ আমরা এই এত স্কুলের ছাত্র আছি, হাতে হাতে তোমার গাড়ী খালি ক'রে, ইট্ক খানি কারখানায় তুলে' দিচ্ছি। আর না হয় ত বল, এই পথের লোক দশ-পাঁচজনের পা ধরে অনুরোধ করে, তোমার এই গাড়ী ঠেলে ঐ কারখানা ভূমিতে তুলে দিচ্ছি।"

নগেনের সেই সকরুণ মিষ্ট, অথচ তীব্র ভর্ৎসনা-সূচক বাক্যের প্রত্যেকটী সেই গাড়োয়ানের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিল। বালকের এই দয়ার কথা শুনিয়া এবং তাহার পরদুঃখে-ছল-ছল চক্ষু দুইটী দেখিয়া, সে কাঁদিয়া ফেলিল। অতঃপর তাহার পাষাণ হৃদয় গলিল। হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নগেনকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"ভাই, তুই কা'দের ছেলে? তোর কথায় কি যাদু আছে; তুই আর একটু পূর্ব্বে দেখা দিলে আমার গরু দু'টীর এ দশা হ'তো না। আহা, বাছাদের আমি মেরে ফেলেছি। সত্যই ভাই, এরাই আমার জীবিকার সম্বল, এদের হ'তে আমি যে উপার্জ্জন করি, তা'তেই আমার ছেলেপিলে খেয়ে বাঁচে। সমস্ত দিন খেটে খেটে আমার মাথা গরম হয়ে গেছে, স্বভাব খিট্‌খিটে হয়ে পড়েছে। এত লোক এ রাস্তায় গেল, ভাই, তোর মত দয়ার কথা কেউ বল্লে না, তোর মত মিষ্টি কথায় আমার চক্ ফুটিয়ে কেউ দিলে না। বরং আমায় আরও রাগিয়ে, ক্ষেপিয়ে আমার এই গরু দুইটীর উপর অধিক নিষ্ঠুরাচরণ কত্তে প্রবৃত্ত করে গেল। আহা! ভাই, তোর এত দয়া? তুই কাদের ছেলে? তোর গলায় পৈতে রয়েছে। দে, তোর পায়ের ধুল আমায় দে।" এই বলে গাড়োয়ান কেবল তাহার গরু দুইটীর রক্তময় শরীরের দিকে বারম্বার দৃষ্টি করিতে লাগিল। আর হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পাষাণ ফাটিয়া স্রোত বহিল।

এদিকে সেখানে যে সমস্ত লোক জড় হইয়াছিল, এই করুণদৃশ্য দেখিয়া তাহাদের হৃদয় গলিয়া গেল। নগেনের শেষোক্ত প্রস্তাবের অনুসরণ করিয়া, একটু বলিষ্ঠ রকমের এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া, অন্যান্য সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"এস ত হে ভাই সকল, এই বেচারীর গাড়ীর চাকা দুইটী একটু ঠেলে দি, তা'হলেই গাড়ীখানি ঐ কারখানার মধ্যে উঠে যাবে।" এই কথায় একেবারে ৭।৮ জন অগ্রসর হইল, এবং গাড়ীর চাকা ধরিয়া একটু ঠেলিতেই গরু দুইটী সহজেই গাড়ীখানি কারখানার মধ্যে টানিয়া তুলিল। স্কুলের ছেলেদের মধ্যে আনন্দ কোলাহল পড়িয়া গেল। কতকগুলি ছেলে একত্র হইয়া নগেনকে স্কন্ধে তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইল। বালকের জয় হইল। রাজেন এই ঘটনার পর

প্রতিজ্ঞা করিল যে, আর কখনও সে নিষ্ঠুর ভাবে কিছু দেখিবে না। আর গাড়োয়ান এখন সেই কারখানায় তাহার গাড়ী খালি করিতে লাগিল এবং তাহার গরুদ্বয়ের দুর্দ্দশা দেখিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

পাঠক পাঠিকা, মিষ্ট বচনের কত গুণ।

আধমণি কৈলাস ও ভীমসেন।

যশোহর জেলার অন্তর্গত ... ... নিবাসী স্বনাম প্রসিদ্ধ কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিতান্ত ভোক্তা বলিয়া দেশ বিদেশে বিখ্যাত। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একটী বিশেষণ আছে। প্রবন্ধের শিরোভাগে নামের পূর্ব্বে যে আধমণি শব্দটি দেখিতেছ, উহাই তাঁহার বিশেষণ। চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে দাঁড়ি পাল্লায় চাপাইয়া দিলে, তাঁহার ওজন আধমণ হয়, এরূপ মনে করিও না। একটি সামান্য বালককে ওজন করিলেও আধমণ হইতে পারে। আধমণ আহার করেন বলিয়াই ইনি উল্লিখিত বিশেষণে ভূষিত। একটি লোক যদি প্রতি সন্ধ্যায় অর্দ্ধ সের আহার করে, তবে বিশ দিনে আধমণ আহার করিতে পারে। কিন্তু তোমরা শুনিয়া ভীত হইবে, ইনি আধমণ আহারীয় দ্রব্য এককালে উদরস্থ করিতে পারেন। তাই ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত আধমণি কৈলাস! তোমরা ভাবিতেছ, যে লোকটা আধমণ আহার করে, না জানি তাহার পেটটা কত বড়, তাহার আকৃতিই বা কেমন। তাহার জীর্ণশক্তিই বা কি প্রকার। না জানি, লোকটার কতই বল। আমি শ্রীযুতকে চাক্ষুষ করিয়াছি, তাঁহার পেটটি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি, উহা দেখিবার জিনিসও বটে; তোমরা আর আর যে সকল বিষয়ের কল্পনা করিতেছ, তাহার কিছুই তাঁহাতে নাই।

যখন তিনি আহার করিয়া বিশ্রামার্থ শয়ন করেন, তখন সহসা যদি কেহ আসিয়া তাঁহাকে দেখে, তবে তাহার নিশ্চয় মনে হইবে, বিছানার উপর একটা প্রকাণ্ড তুলা বোঝাই করা তাকিয়া পড়িয়া রহিয়াছে; পরক্ষণেই তাহার সে ভ্রম ঘুচিয়া যাইবে, দেখিবে, ঐ তাকিয়াটির দুদিকে কাটি কাটি হাত পা চারিখানা পড়িয়া রহিয়াছে, এবং একটি গোলাকার ক্ষুদ্র মস্তক রহিয়াছে। তখনই দর্শকের মনে হইবে, এ তাকিয়া নহে, আমাদের সেই কৈলাস বাবুর পেট। শ্রীমানের শরীরে রক্তের লেশ নাই, মুখখানা ফ্যাকাসে, পেটটির চারিদিকে কাল কাল শিরাগুলি ভাসমান; শরীরে এত বল যে, একটি বালকে ধাক্কা দিলে পড়িয়া যান। তোমাদের মনে সহজেই এই প্রশ্নের উদয় হইতেছে যে, যিনি এত আহার করেন, তাঁহার শরীরের এ দুর্গতি কেন? এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতেছি। যে দিন তোমাদের একটু গুরুতর ভোজন হয়, সে দিন তোমাদের শরীরের অবস্থা কিরূপ হয়? সর্ব্বদা শরীর জড় ভাবাক্রান্ত বোধ হয়, নড়িতে চড়িতে

ইচ্ছা করে না, শরীরে বল থাকে না, সুতরাং মনেও স্ফূর্ত্তি থাকে না, কোন কার্য্যে উৎসাহ হয় না। অতএব অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছ, গুরু-ভোজনটি সুখকর, স্বাস্থ্যকর বা বলকর নহে। আহারীয় দ্রব্যের পরিপাক হইলে, তাহার সারাংশ দ্বারা শরীরের ক্ষয়িত অংশের পূরণ হয়। যদি ভুক্ত দ্রব্য অপকাবস্থায় নির্গত হইয়া যায়, তবে শরীরে রক্তই বা কিরূপে জন্মিবে?—পুষ্টি এবং বলই বা কিরূপে হইবে?

একটা দীপ শিখার তাপে এক হাঁড়ি জল গরম করার আশা দুরাশা মাত্র। এক চামচ জল ধর, দেখিবে শীঘ্রই জল উত্তপ্ত হইবে। যাহার উদরাগ্নি যেমন, তাহাকে তদনুরূপ আহার করিতে হইবে। যে ছেলের পেটে সাগু বার্লি জীর্ণ হইবার শক্তি নাই, তাহাকে উপবাস দেওয়াই কর্ত্তব্য। অনেকে জিহ্বার দোষে অজীর্ণ সত্ত্বে পুনঃ পুনঃ আহার করিয়া উদরাগ্নিকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে, এবং চিরজীবনের জন্য নানাবিধ পীড়াগ্রস্ত ও এক-বারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। আহারের উদ্দেশ্য দেহ রক্ষা করা; যে আহারে দেহ নষ্ট হয়, চিররোগা হইয়া যাবজ্জীবন ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, সে আহার করা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে। অজীর্ণা ব্যক্তি কোন দ্রব্য আহার করিয়া, স্বাদ গ্রহণ জন্য যে একটা সুখ, তাহাও প্রাপ্ত হয় না। কেবল অজীর্ণ বশতঃ রাশি রাশি দ্রব্য উদরস্থ করে, আর অপকাব-স্থায় ঐ সকল দ্রব্য ত্যাগ করে।

একটা হাঁড়িতে অতিরিক্ত পরিমাণে চাউল জল বোঝাই করিয়া রান্না করিতে থাক, দেখিতে পাইবে, চাউল ফুটিতে ফুটিতে উতুলিয়া হাঁড়ি হইতে পড়িয়া যাইবে, কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবে না; যাহা থাকিবে, তাহার অর্দ্ধেক হয়ত সিদ্ধ হইয়াছে, অর্দ্ধেক হয়ত সিদ্ধ হয় নাই, ভাতের এইরূপ দুর্গতি হইবে। অতিরিক্ত আহারেও এরূপ ঘটিয়া থাকে। তোমরা অনেকেই হয়ত দেখিয়াছ, কোন ছেলে গুরুতর নিমন্ত্রণ ভোজন করিয়া ন্যাকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কাহারও বা ভেদ হইতেছে। উদররূপ হাঁড়িতে যে দ্রব্য ধরিত, ছেলেটা কিন্তু তাহার অতিরিক্ত বোঝাই করিয়া আসিয়াছে, যাই উদরাগ্নিতে রান্না আরম্ভ হইয়াছে, অমনি উতুলিয়া অর্থাৎ ন্যাকার হইয়া পড়িতেছে, অথবা অপকাব-স্থায় ভেদ হইয়া যাইতেছে। আমাদের চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রায়ই এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। তা তাঁহার শরীরের অবস্থা এরূপ কেন না হইবে?

তোমরা তোমাদের ঠাকুর মাতার নিকট দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেনের ভোজনের কথা শুনিয়া থাকিবে। তিনিও অতিশয় ভোক্তা ছিলেন। খাবার পাইলে ভীম ভায়ার বড়ই আনন্দ হইত, যত পাইতেন সমস্ত উদরসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেন; তাঁহার তাহাতে নিষেধ ছিল না। জতুগৃহ দাহের পর কুন্তী দেবী, শ্রীমান্ পাণ্ডবদিগকে লইয়া, কোন এক রাজ্যে ব্রাহ্মণ বাটীতে গোপনে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেই রাজ্যে একটা রাক্ষস আসিয়া নিয়ত উপদ্রব করিত; প্রজাদিগকে ধরিয়া ধরিয়া খাইয়া ফেলিত, রাজ্য মধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রাজা কিছুতেই সেই দুর্দ্দান্ত রাক্ষসকে দমন করিতে না পারিয়া, এই নিয়মে তাহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন যে, রাক্ষস মহাশয় সকল প্রজার প্রতি উপদ্রব করিবেন না। তাহার উদর পূর্ত্তির উপ-যোগী নানাবিধ উপাদেয় চব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি রসনা তৃপ্তিকর খাদ্য এবং মাংসের জন্য একটি মনুষ্য দিবেন। প্রজাবর্গের সহিত এই নিয়ম হইল যে, তাহারা এক এক দিন পালাক্রমে একটি মনুষ্য দিবে। যে ব্যক্তি পালামতে লোক দিতে অসম্মত হইবে, রাজা তাহার প্রাণদণ্ড করি-

বেন। যে বাটীতে কুন্তী দেবী পুত্রগণসহ বাস করিতেছিলেন, সেই বাটীতে এক ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পত্নী বাস করেন; তাঁহাদের মাত্র একটি শিশু সন্তান। অদ্য তাঁহাদের সেই ভয়ানক রাক্ষসকে মানুষ যোগাইবার পালা। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী উভয়েই আকুল, এখন কে রাক্ষসের মুখে যাইবে। ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, ব্রাহ্মণী আমি যাই, তুমি গেলে এ বালকের কে যত্ন করিবে? তাহা হইলে বালকটিও অযত্নে মারা যাইবে। ব্রাহ্মণী বলিতেছেন, ঠাকুর আমার যাওয়াই শ্রেয়ঃ, তুমি গেলে আমাকে বিধবা হইয়া কাল কাটাইতে হইবে। স্ত্রীলোকের বৈধব্য অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ। আর তুমি গেলে কে আমাদিগকে উপার্জ্জন করিয়া প্রতিপালন করিবে? তোমার অভাবে আমরা উভয়েই তোমার শোকে মারা যাইব। এইরূপ উভয়ে দারুণ শোকাকুল হৃদয়ে বাত বিতণ্ডা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহাদের শিশু ছেলেটি হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া আসিয়া মাতার গলদেশ ধারণ করিল। অন্যদিন এরূপ ভাবে আসিলে সে উভয়ের নিকট যেরূপ আদর লাভ করিত, আজ আর সেরূপ আদর পাইল না, দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া পিতা মাতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাঁহারা অসহ্য শোকদুঃখভারে আক্রান্ত। বালক অত্যন্ত কাতর হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মাতা বালকের আগ্রহ দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া সমস্ত বলিতে লাগিলেন। বালক ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল, আমি যাব, আর সেই নাক্ষসটাকে মেরে খুন্ খুন্ ক'র্‌ব। বালকের অস্ফুট কথায় মাতার শোকপ্রবাহ আরও বর্দ্ধিত হইল। কুন্তী দেবী অন্তরালে থাকিয়া ইহাদের সমস্ত কথা শুনিতে পাইলেন। তিনি অত্যন্ত দয়াশীলা ছিলেন। তিনি ভাবিলেন, আমাদের আশ্রয়দাতা নিরুপায় ব্রাহ্মণদের প্রত্যুপকারের দিন আজ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি নিজ পুত্র ভীমসেনের বলবিক্রম জানিতেন। তাই তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনাদের সমস্ত কথোপকথন এবং উপস্থিত বিপদের বিষয় আমি শুনিয়াছি, আপনারা স্বামী স্ত্রীর যিনিই রাক্ষসের ভোজনার্থ গমন করিবেন, তাহাতেই আপনাদের সংসারের ক্ষতি। আমার ঈশ্বর কৃপায় পাঁচটি ছেলে, উহার একটিকে রাক্ষস মুখে দিয়া আপনারা যে আশ্রয় দানরূপ মহাঋণে আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিতে ইচ্ছা করি। কুন্তী দেবীর এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মভীরু ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ পত্নী উভয়েই এক সময়ে বলিয়া উঠিলেন, তাহা কখনই হইবে না। আমরা আশ্রিত অতিথিকে এরূপে বিপন্ন করিয়া ঘোর নরকগামী হইতে পারিব না। কুন্তী অত্যন্ত জিদ করাতে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী অগত্যা বাধ্য হইয়া সম্মত হইলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজা সেই ভয়ানক রাক্ষসের আহারোপযোগী প্রচুর দ্রব্য সামগ্রী পাঠাইয়া দিলেন, ভীমসেনও প্রেরিত হইলেন। ভীম যথাস্থানে ঐ সকল খাদ্য সামগ্রী আগুলিয়া বসিয়া আছেন। যথাসময় সেই বিরাট রাক্ষস মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দূর হইতেই প্রকাণ্ডকায় ভীমসেনকে দেখিয়া আহ্লাদে আটখানা হইলেন, ভাবিলেন রোজ রোজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানুষ খাই, তাহাতে মাংসের স্বাদও পাই না, আজ এই প্রকাণ্ড মানুষটাকে খাইয়া মাংস ভোজনের সাধ মিটাইব। এ দিকে ভীমসেন রাক্ষসকে দেখিয়া বড় বড় গ্রাসে আহার সামগ্রী উদরস্থ করিতে লাগিলেন। ভীমসেনের শরীরে অত্যন্ত বল ছিল, তাঁহার তুল্য শারীরিক বলশালী কেহ জন্মিয়াছেন, বলিয়া শুনা যায় না। কথায় বলে "ভীমের বল।" ভীমসেন বলশালী কোন প্রাণী দেখিলে বড়ই

আমোদিত হইতেন, এবং তাহার বল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেন। তিনি নাকি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাতী সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিতেন। এই বলবান্ রাক্ষসকে দেখিয়া তাঁহার বড়ই আমোদ হইল, তিনি তাড়াতাড়ি ভোজন সমাপন করিয়া তাহার সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। রাক্ষস দেখিল, ভীমসেন যেন তাহাকে উপেক্ষা করিয়াই আহারীয় দ্রব্যজাত উদরস্থ করিতেছেন। তখন সে ক্রোধে অধীর হইয়া ভীমের উপর আপতিত হইল। ভীমসেনও তাহাকে আক্রমণ করিলেন। দুর্দ্দান্ত রাক্ষস তাঁহার পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিল।
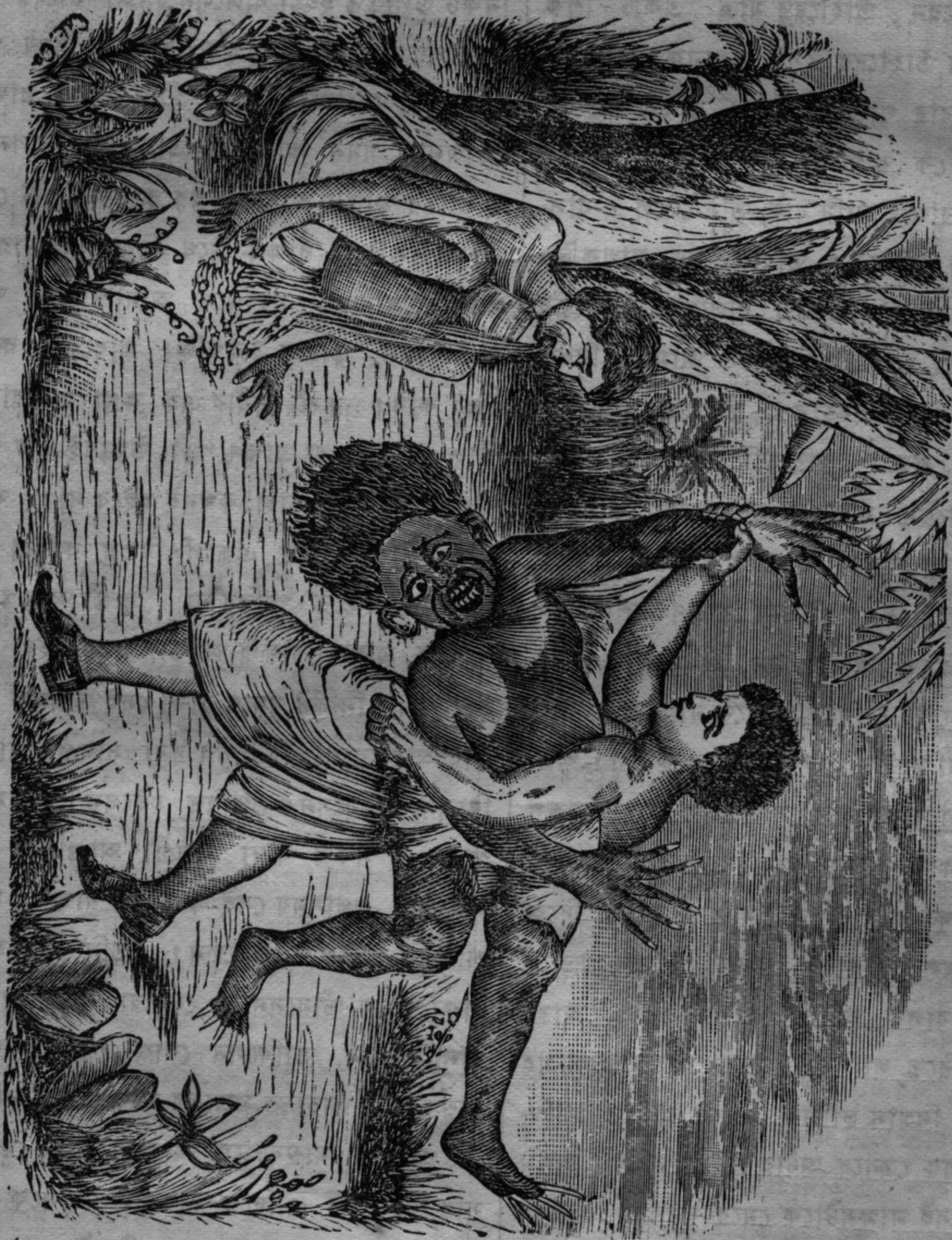
তোমাদের সমক্ষে ছুটি ভোজন-পটু মনুষ্য চিত্র অঙ্কিত করা হইল। একজন সংসারে সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য ভোজন-সর্ব্বস্ব। অপরজন শারীরিক বলে বলীয়ান বীরাগ্রগণ্য। ভীমসেন যখন ভীষণ পদ হস্তে মর্-মর্ শব্দে শত্রুমণ্ডলীর সম্মুখে মহাপ্রলয়ের ঝড়ের ন্যায় উপস্থিত হইতেন, তখন ভয়ে তাঁহাদের দেহ-পিঞ্জর হইতে প্রাণপাখী উড়িয়া পলায়ন করিত। প্রথম জন কেন তদ্রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত তাহা তোমাদের বুঝিতে বাকি নাই। দ্বিতীয় ভীমসেন যদিও অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ভোজন করিতেন; কিন্তু তাহা তাঁহার নিকট অপরিমিত হইত না, অনায়াসে জীর্ণ হইয়া যাইত। সুতরাং আহারীয় দ্রব্যের সমস্ত সারাংশ তাঁহার দেহের বল, সামর্থ্য এবং পুষ্টি বর্দ্ধন করিত। তজ্জন্যই তিনি যেমন নামে ভীম ছিলেন, তেমনি পরাক্রমেও ভীম ছিলেন।

দেখ দেখ লৌহকায় বীর ভীম ভাই।
খেয়ে দেয়ে মোটা সোটা করিছে লড়াই॥
রাক্ষসের ছট্‌ফটি প্রাণ অস্ত হলো।
ভীমের বগল তলে পড়ি ম'লো ম'লো॥
ভাবিতেছে মাংস আজ খেনু ভাল ক'রে।
মোর খাওয়া দূরে যাক, এ যে খায় মোরে॥
"কেমন রাক্ষস ভায়া! মজাটি কেমন!!।
তৃপ্তি করি মাংস আজ কর না ভোজন?"
বলি হারি ভীম তব সার্থক ভোজন।
যার বলে কর তুমি রাক্ষস দমন॥
এদিকেতে দেখ দেখ আধমণি ভায়া।
না ছাড়েন ভরাপেটে কাঁচা গোল্লা মায়া॥
বন্ধুদের বাড়ী অতি ফলাহার করি।
শয্যায় পড়িয়া অই যান গড়াগড়ি॥
হস্তপদ কাটি কাটি পেটটি তাকিয়া।
ভরাপেট আরো আজ উঠিছে ফাঁপিয়া॥
পেটের ভিতর শুন হুড়হুড়ি ধ্বনি।
শরতের মেঘে যেন ডাকিছে অশনি॥
হেউ হেউ করি ছাড়ে ভীষণ উদ্গার।
ওয়াক করিয়া তুলে বিষম হ্যাকার॥
পেটটি পাতল হ'লো কৈলাস ভাবিছে।
অপরাহ্ণে নিমন্ত্রণ বুঝিবা জুটিছে॥
এ খাওয়ার মুখে ছাই যাতে বল নাই।
যাতে চির রোগা করে মনুষ্যত্ব নাই॥
স্মৃতি বুদ্ধি বল বিদ্যা যাতে নষ্ট হয়।
এমন আহার করা যুক্তি যুক্ত নয়॥
জীর্ণ অন্নে কত বল দেখ ভীমে চেয়ে।
আধমণি মারা যান অতিরিক্ত খেয়ে॥

ফুল।

(বয়স্কদিগের জন্য।)

প্রিয় পাঠিকাগণ! তোমরা প্রবন্ধের "ফুল" নাম শুনিয়া হয়ত কিছু মধুর কবিত্বের কথা শুনিবার আগ্রহ করিবে, কিন্তু তোমাদিগকে সে সুখে বঞ্চিত করিয়া ফুলটী জিনিস কি, কিরূপে হয় এবং তাহাতে কি কি থাকে সেই বিষয় সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিব। যদিও আপাততঃ দেখিতে বোধ হইবে যে আমার প্রবন্ধ দ্বারা ফুলের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের হ্রাস হইতেছে, তথাপি ফুলটীকে বিশেষরূপে অবগত হইতে হইবে

যাহা যাহা জানা আবশ্যক তাহার সম্বন্ধে তোমাদিগের কিছু জ্ঞান লাভ হইলে ফুলের ভিতর যে সৌন্দর্য্য লুক্কায়িত আছে তাহা দেখিয়া মোহিত হইবে।

প্রথমতঃ—ফুল জিনিসটা কি? তোমরা হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে যে, ফুল আর পাতার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ফুল পাতার রূপান্তর মাত্র। যদি তোমাদিগের কেহ ফুলের কুঁড়ি লইয়া ভাল করিয়া দেখিয়া থাক, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে কুঁড়ির অবস্থায় ফুলকে পাতা হইতে পৃথক করা বড় সম্ভব নহে। এই কুঁড়ির ভিতর ফুলের সমস্ত অঙ্গগুলি অপরিস্ফুট অবস্থায় থাকে, যেমন কুঁড়ি বর্দ্ধিত হয়, ঐ অঙ্গগুলিও বর্দ্ধিত হইয়া বিকশিত কুসুমের আকার ধারণ করে। এক্ষণে ফুলের অঙ্গগুলি কি কি তাহা বিশেষরূপে বর্ণনা করিব। ফুলের অঙ্গগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় ভাগ। আবশ্যকীয় ভাগে দুই প্রকার অঙ্গ থাকে, তন্মধ্যে একটী পুংলিঙ্গ ও অন্যটী স্ত্রীলিঙ্গ। পুং ইন্দ্রিয়টীকে ইংরাজিতে "ষ্ট্যামেন্‌স" ও স্ত্রী ইন্দ্রিয়টীকে ইংরাজিতে "পিষ্টিল" কহিয়া থাকে। এই দুই প্রকার ইন্দ্রিয়ই ফুলের অত্যাবশ্যকীয় ভাগের মধ্যে ধরা হয়। অনেক ফুলে এই দুই প্রকার ইন্দ্রিয়ই এক সঙ্গে থাকে। স্ত্রী ইন্দ্রিয়টী সংখ্যায় অনেক স্থলে প্রায় একটী ও পুং ইন্দ্রিয় পাঁচ, দশ বা ততোধিক হইয়া থাকে। মোটামুটি পুং ইন্দ্রিয় সংখ্যায় অধিক ও স্ত্রী ইন্দ্রিয়ের চতুঃপার্শ্ব বেষ্টন করিয়া থাকে, কিন্তু স্ত্রী ইন্দ্রিয় এক বা তদোধিক, এবং ফুলের সর্ব্ব অভ্যন্তরীণ ভাগে অবস্থিতি করে। এইত গেল আবশ্যকীয় ভাগ। অনাবশ্যকীয় ভাগের মধ্যে আবার দুই প্রকার জিনিস থাকে, আমরা সহজ কথায় যাহাকে পাপড়ি বলি, তাহা এই অনাবশ্যকীয় ভাগের একটী অংশ। যদি একটী ফুল লইয়া ভাল করিয়া দেখ, তবে দেখিতে পাইবে, পাপ্‌ড়িগুলি বেষ্টন করিয়া অনেকটা সবুজ রঙ্গের অবিকল পাপ্‌ড়ির আকারে যে বহির্ভাগটী থাকে, ইহাই ফুলের বাহিরের প্রথম অঙ্গ। ইহার ভিতরে পাপ্‌ড়ি অর্থাৎ সাদা, লাল প্রভৃতি নানাবিধ রঙ্গে রঞ্জিত যে ভাগ। পাপ্‌ড়িগুলি সংখ্যাই প্রায়ই অধিক, ৫ টী হইতে আরম্ভ করিয়া গণনায় অসংখ্য হইতে পারে। সকল ফুলের পাপ্‌ড়ি সংখ্যায় সমান নহে। তোমরা যে জবা ফুল দেখিয়া থাক, তাহাতে প্রায় পাঁচটী থাকে। আমি ফুলের যে কয়টী অঙ্গের কথা বলিলাম যদি ভাল করিয়া দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তবে একটী জবা বা ধুতুরা ফুল তুলিয়া লইয়া দেখিতে পার। জবা ফুল বা ধুতুরা ফুল দুটীতেই বহির্ভাগে সবুজ রং বিশিষ্ট প্রায় পাঁচভাগে বিভক্ত ফুলের যে অঙ্গটী দেখিবে উহাই ফুলের প্রথম অঙ্গ। এটী অনাবশ্যকীয় ভাগের মধ্যে পরিগণিত। এই ভাগটী প্রায়ই ফুলের নিম্নভাগে থাকে এবং ফুলের অবশিষ্ট ভাগ হইতে সহজে ছাড়াইয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহার ভিতরে ফুলের দ্বিতীয় অঙ্গ, তাহাই পাপড়ি। জবা ফুলে পাঁচটী পাপড়ি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র থাকে, এবং লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট। কিন্তু ধুতুরা ফুলে এই পাঁচটী পাপড়ি একত্র সংলগ্ন হইয়া চোঙ্গের মত হইয়া থাকে এবং সাদা রংঙ্গের হয়। এই দুইটী অঙ্গই অনাবশ্যকীয় ভাগের মধ্যে ধরা হয়, কারণ অনেক সময় ইহাদিগের অভাব হইলেও ফুলের কার্য্যের কোন ব্যাঘাত হয় না। এই অনাবশ্যকীয় ভাগ আবশ্যকীয় ভাগের বহিঃ আবরণ ভাবে অবস্থিতি করে। তারপর ফুলের আবশ্যকীয় ভাগ, এ ভাগটীর দ্বারাই ফুলের ফলোৎপাদন শক্তির কার্য্য সম্পন্ন হয়। এস্থলে যদি পুনরায় জবা বা ধুতুরার দৃষ্টান্ত ধরা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে ফুলের তৃতীয় অঙ্গটীর নাম

পুং ইন্দ্রিয়। এ গুলি আকারে কখনও সূক্ষ্ম চুলের মত, আর কখনও আকারে স্থূল ছুঁচের মত ও লম্বা। এই পুং ইন্দ্রিয়গুলিকে ফুলের কেশর বলা যাইতে পারে। এইগুলির অগ্রভাগে ফুলের রেণু-গুলি অবস্থিত। ফুলের ভিতরেও সর্ব্ব অভ্যন্তরীন-ভাগে স্ত্রীলিংঙ্গ, ইহা সংখ্যায় প্রায় একটী। এইটীর ভিতর ফুলের গর্ব্ভাশয় অবস্থিত। ইহার অগ্রভাগ কখনও দুই বা বহুভাগে বিভক্ত, এবং কখনও সূক্ষ্ম এবং কখনও স্থূল হয়। এই অগ্রভাগে একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে, তাহার ভিতর দিয়া ফুলের কেশর হইতে রেণু আসিয়া গর্ব্ভাশয়ে প্রবেশ করে ও ফল উৎপাদন করে।—এ বিষয়ে পরে বিস্তৃতরূপে বলিব।

ধাঁধা।

মার্চ্চ মাসের ধাঁধার উত্তর।

১ম। বামন।
২য়। বকুল।
৩য়। বাতাস।

নিম্নলিখিত গ্রাহকগণের মার্চ্চ মাসের তিনটী ধাঁধার উত্তরই ঠিক হইয়াছে।—

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী, চাঁইবাসা।
শ্রীপ্রফুল্ল রঞ্জন দাস, ভবানীপুর।
শ্রীযতীন্দ্রকুমার বসু, মেদিনীপুর।
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ঢাকা।
শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষ, বহরমপুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, মেহেরপুর।
শ্রীচিন্তাহরণ চন্দ্র, ঢাকা।
শ্রীভূতনাথ চক্রবর্ত্তী, মজীলপুর।
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু, নড়াইল।
শ্রীঅখিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।
ছাত্র সমিতির সভ্যবর্গ, মালদহ।
শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন গুপ্ত, সেনহাটী।

নূতন ধাঁধা।

(১) তুরগ শূন্যেতে ধায় হয়ে বেগবান্।
ভূতলেতে আসোয়ার ধরয়ে লাগাম্॥
মাটিতে সে নাহি পারে একপদ যেতে।
ছেড়ে দিলে পারে কিন্তু আকাশে উঠিতে॥
এখন বলহে সবে হইয়ে সত্বর।
সে তুরগ কেবা এই অবনী ভিতর॥

(২) পৃথিবীর সর্ব্বদেশে দেখিবারে পাই।
যাতায়াত করে কিন্তু হস্ত পদ নাই॥
তাকে ত্যজি লোক কভু বাঁচিতে না পারে।
কাঁদিলে দেখিতে পাবে নিজ কলেবরে॥
এখন বলহ সবে এবা কোনজন।
হস্ত পদ বিনা করে এ ভবে গমন॥

(৩) ভালবাসি তবু দেখা পাই না তাহার।
মেটে ঘরে বাস করে জানে চরাচর॥
পুরাতন হলে পরে, কিম্বা দৈব ঝড়ে।
কভু যদি ভগ্ন হয়ে সেই ঘর পড়ে॥
ভাল বাসা তোলা থাকে মুখে দিয়ে ছাই।
নিমিষে পলায় কোথা দেখা নাহি পাই॥
অতঃপর বল দেখি করিয়া বিচার।
কোন জন থাকে সেই ঘরের ভিতর॥

সখা

নবম ভাগ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

জুন, ১৮৯১।

বিবিধ।
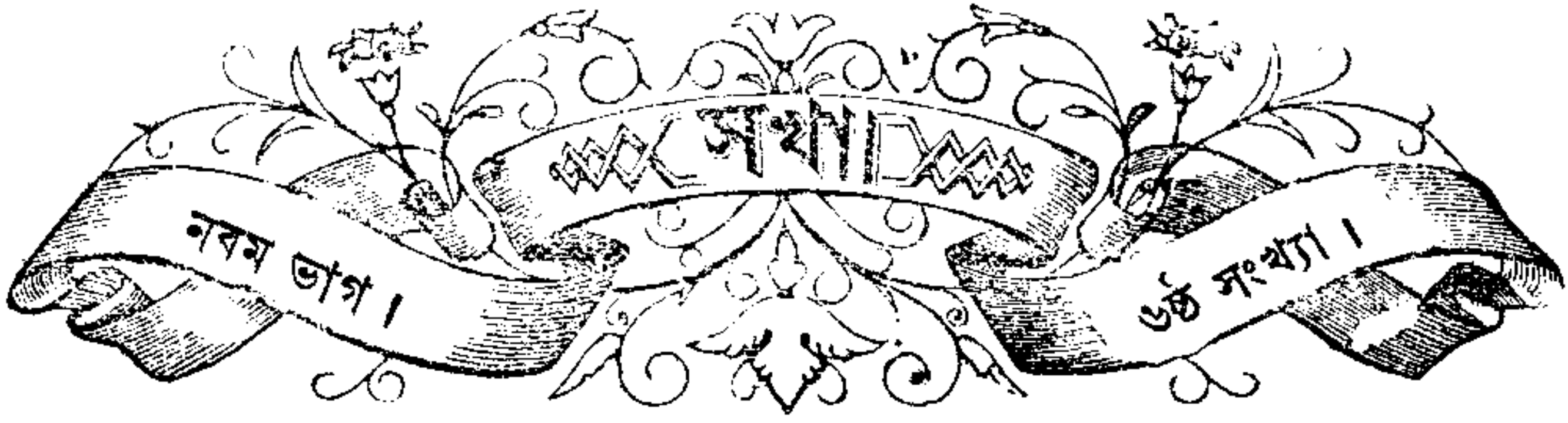
স্বজাতি প্রেম।—রুষ গবর্ণমেণ্ট য়িহুদী প্রজাদের উপর বড়ই অসহ্য উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছেন। য়িহুদীদিগকে রুষ রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়াই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। রুষিয়ার অত্যাচরিত য়িহুদীদের জন্য কোন নিরাপদ স্থানে এক উপনিবেশ স্থাপনের সাহায্যার্থ, য়িহুদী অভিজাত বেরণ হার্সেক ৩০ কোটি টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

* *
*

চোরধরা কল।—আমেরিকা আজ কাল প্রায় সকল বিষয়েই অন্যান্য দেশের উপর টেক্কা দিয়াছে। যা কিছু অদ্ভুত জিনিস, তাহার অধিকাংশই মার্কিন-দের দ্বারা আবিষ্কৃত হইতেছে। সম্প্রতি চোরধরার এক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কোন মার্কিন বৈজ্ঞানিক এক কল আবিষ্কার করিয়াছেন। চোর সিঁধ কাটিয়া ঘরে ঢুকিলেই তাড়িতের বলে একটী ঘণ্টা বাজিয়া উঠে,—অমনি বিদ্যুতালোক প্রতিভাত হয়। সেই আলোকের সাহায্যে এক গুপ্ত ফটোগ্রাফ যন্ত্রে তৎক্ষণাৎ চোরের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়া থাকে। তৎপর, সেই ফটোগ্রাফের ছবি দেখিয়া পুলিস চোরকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয়।

* *
*

কলিকাতাতে পশুশালা।—পশুর প্রতি অত্যাচার নিবারণ জন্য কলিকাতাতে এক সভা আছে। রুগ্ন, অসমর্থ গো, অশ্ব প্রভৃতির দ্বারা গাড়োয়ানগণ জোর করিয়া কাজ করায়। সেই সকল বাক্‌শক্তিহীন পশুদিগকে গাড়োয়ানদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করাই, এই সভার উদ্দেশ্য। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী সোদপুর নামক স্থানে জৈনদিগের এক "পিঞ্জরা পোল" আছে। রুগ্ন গোরুদিগকে তাহাতে রাখিয়া লালনপালন করা হয়; বাটা গাভীগুলিকে কিনিয়া নিয়া কসাইদের হাত হইতে রক্ষা করা হয়। কিন্তু এত বড় সহর কলিকাতাতে—সমগ্র ভারতের রাজধানীতে, পশু চিকিৎসার জন্য এপর্য্যন্ত কোন বন্দোবস্তই ছিল না। বোম্বাইর পার্সিধনী সার দীনসা মানকজি পেটিট এই অভাব দূরীকরণ জন্য ২৫ হাজার টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

* *
*

দীর্ঘজীবী পরিবার।—১৮৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সভ্য জগতের প্রায় সর্ব্বত্র জন সংখ্যা গৃহীত হইয়াছে। এই জন সংখ্যা গণনাতে অনেক দেশে

অনেক অদ্ভুত বিবরণ প্রকাশ পাইয়াছে। আমেরিকাতে এক দীর্ঘজীবী পরিবারের কথা জানা গিয়াছে। সেই পরিবারে পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত জীবিত আছেন। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠার নাম বিবি কেথারিণ সার্প, ১১৪ বৎসরে পা দিয়াছেন, বেশ সুস্থ ও সবল আছেন। তাঁহার কন্যা বিবি স্মিথের বয়স ৭৩ বৎসর, তাঁহাকে দেখিতে অর্দ্ধবয়স্কা বলিয়া মনে হয়। তাঁহার কন্যা বিবি উইলসনের বয়স ৪১ বৎসর, তাঁহার কপালে একটীও বয়সের রেখা পড়ে নাই। তাঁহার কন্যা বিবি মেরি ওয়েমারিসের বয়স ২১ বৎসর, দেখিতে যেন ১৫। ১৬ বৎসরের বালিকা। এইযুবতীর দুইটী কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে।

* *
*

আশ্চর্য্য যন্ত্র।—বিজ্ঞান বলে জগতে কত অদ্ভুত যন্ত্রের সৃষ্টি হইতেছে! রেলওয়ের গাড়ী, টেলিগ্রাফের তার, বাষ্পীয়পোত পরিচালন,—এ সকলই বিজ্ঞানের কৌশল বলে সম্পাদিত হইতেছে। এডিসন নামে এক মার্কিন বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি ফনোগ্রাফ নামে এক যন্ত্র অবিষ্কার করিয়াছেন; তাহার বলে এক স্থানের কথা, বক্তৃতা, গান বাদ্য অন্যত্র লইয়া যাওয়া যায়। তুমি যেরূপ স্বরে কথা বলিবে, বক্তৃতা দিবে, গান গাহিবে; সেই যন্ত্রের সাহায্যে ঠিক অবিকল তাহা অন্যত্র বহন করিয়া নিতে পারা যায়; শ্রোতাগণ শুনিতে পাইবে, যেন তুমি তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া কথা বলিতেছ, বক্তৃতা দিতেছ, গান গাহিতেছ। এডিসন সাহেবই বর্ত্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকদের মধ্যে অগ্রণী। তিনি আর এক অদ্ভুত যন্ত্র প্রস্তুত করিতেছেন, তাহার সাহায্যে তুমি ২ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে থাকিয়া নাট্যশালার অভিনেতাদিগের অভিনয় ও গান বাদ্য শ্রবণ করিতে পারিবে; তোমার ঘরে একখানা সাদা পরদা টাঙ্গাইয়া দিলে, তাহাতে অভিনয়কারীদের অভিনয় ও চিত্রপটের দৃশ্য পর্য্যন্ত প্রতিফলিত দেখিতে পাইবে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া একদিকে মনে হয়, মনুষ্য বুদ্ধির অসাধ্য কার্য্য বুঝি কিছু নাই, অপরদিকে পরমেশ্বরের অপার দানের কথা ভাবিয়া কৃতজ্ঞতাভরে মস্তক তাঁহার চরণতলে অবনত হয়।

বালক সিন্ধু।

রাজা দশরথ আজ মৃগয়া করিতে যাইবেন। অযোধ্যা নগরীতে মহা হুল স্থূল পড়িয়া গিয়াছে। অক্ষৌহিণী সেনা নায়ক হইতে সামান্য পদাতিক সৈনিক, সকলেই মৃগয়ায় যাইতে প্রস্তুত ও সজ্জীকৃত হইতেছে। ঘরে ঘরে মঙ্গল কোলাহল হইতেছে। ঘরে ঘরে স্ত্রীলোকেরা রাজার মঙ্গল কামনায় দেব-পূজা করিতেছে। সেকালে মৃগয়া বড় আদরের জিনিস ছিল। মৃগয়া (নিরপরাধী বন্য পশু হনন) প্রথাটী ভাল কি মন্দ, সে বিষয়ের বিচারের ভার বালক বালিকাদের উপর দিয়া, আমরা কেবল একটী সিদ্ধান্ত বলিব। মৃগয়া বাস্তবিক আদরের দ্রব্য হওয়াই সঙ্গত। রাজ্যে শান্তি, প্রজার ঘরে অন্নের সচ্ছলতা, রাজার শারীরিক ও মানসিক কুশলতা না থাকিলে, কোন রাজাই কোন

কালেই মৃগয়ায় হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। রাজ্যের চারিদিকে বিদ্রোহ—চারিদিকে অশান্তি—প্রজার ঘরে হা অন্ন হা অন্ন ধ্বনি, বৈদেশিক আক্রমণ ভয়ে সদাভীতচিত্ত রাজা যে রাজ্যে, সেখানে মৃগয়ার নাম শুনা কখনই যায় না, অধিক কথায় প্রয়োজন কি? দশরথের রাজ্য শান্তিপূর্ণ ছিল, প্রজার ঘরে অন্ন ছিল—সব দিকে সুপ্রতুল ছিল—তাই মহারাজের মৃগয়ার উপর আন্তরিক টান ছিল।

রাজা দশরথ মৃগয়ায় যাইবেন। সীমান্ত রাজ্যের ক্ষুদ্র রাজারা মহারাজ রাজ্যে উপস্থিত হইলে কিরূপে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে হইবে, তাহার আয়োজন করিতে লাগিল। যথা সময়ে অসংখ্য সৈন্য সঙ্গে মহারাজা মৃগয়ায় বহির্গত হইলেন। বাদ্যধ্বনিতে দশদিক পূরিয়া গেল। সৈন্যের কোলাহল, অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহিত শব্দে বনভূমি কম্পিত হইল। বন্য পশু সকল সভয়ে আশ্রয় স্থান পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইল। হস্তীর সহিত সিংহের, ব্যাঘ্রের সহিত বৃষের পরস্পর শত্রুতা; কিন্তু আজ সে শত্রুতা কোথায়? একত্র হইয়া সকলেই প্রাণ-ভয়ে পলায়ন করিতেছে। সাধারণ বিপদে পড়িয়া ব্যক্তিগত হিংসাবৃত্তি আজ কাহারও মনে নাই—সম্মুখে হরিণী পলাইতেছে, পশ্চাতে ব্যাঘ্র দৌড়াইতেছে, হরিণী আজ বাঘের ভয়ে ভীতা নহে। ব্যাঘ্র আজ হরিণীর কোমল মাংস লোলুপ নহে। জগতের ধর্ম্মই এই, আমরা শান্তির সময় গৃহ বিবাদে ব্যস্ত থাকি; কিন্তু যখন কোন সাধারণ বিপদ উপস্থিত হয়, তখন সে গৃহ বিবাদ বিস্মৃত হইয়া সকলে একত্রে সেই বিপদের হাত হইতে এড়াইবার যত্ন করি। যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, আত্ম বিচ্ছেদ কালে আমরা পাঁচ ভাই, দুর্য্যোধনেরা একশত ভাই; আর পরের সঙ্গে যখন বিবাদ, তখন আমরা একশত পাঁচ ভাই। সখার পাঠক পাঠিকাগণ, তোমরা নিজের মধ্যেই দেখ না কেন, এক স্কুলে এক শ্রেণীর বালকের সঙ্গে অপর শ্রেণীর বালকের অসদ্ভাব দৃষ্ট হয়; কিন্তু যখন অন্য স্কুলের সহিত আড়ি চলে, তখন সকল শ্রেণীর বালকই এক জুট। এটা প্রাকৃতিক, সুতরাং প্রশংসার; কিন্তু শান্তির সময় যদি আত্ম-বিচ্ছেদ না থাকিত, এক পরিবারের ভ্রাতায় ভগিনীতে মনোমালিন্য না ঘটিত, এক গ্রামের সমবয়স্ক বালকদিগের মধ্যে চির সম্প্রীতি বিরাজ করিত, এক স্কুলের সমস্ত বালকদিগের মধ্যে যদি সামান্য কারণেও কথান্তর না হইত, সমব্যবসায়ীর মধ্যে কোন প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ না থাকিত, তবে সংসার কি সুখের স্থান হইত! একটু সহিষ্ণুতার অভাবে—সামান্য ক্ষমার অভাবে, পৃথিবী হইতে এ শান্তিটুকু—এ সুখটুকু চির অন্তর্হিত হইয়াছে। সখার পাঠক পাঠিকারা, তোমরা সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার আশ্রয় লও, দেখিবে সংসার কেমন সুখে অতি-বাহিত হইয়া যাইবে।

দশরথ প্রাতে মৃগয়ায় বাহির হইয়া, সারা দিন বন হইতে বনান্তরে বন্য পশুর অনুসরণ করিয়া, ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া, সঙ্গীগণ-পরিত্যক্ত শ্রান্ত-অবসন্ন দেহে বেলাবসনে এক নির্ঝরিণীর অনতি-দূরে বনলতাকুঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সময় সন্ধ্যা ধীরে ধীরে পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়া শ্রান্ত জীবগণের উপর ক্লান্ত ধরণীর অঙ্গে কাল বসন ঢাকা দিতেছিল। সূর্য্যের অস্ত গমনের প্রারম্ভেই বনভাগ আঁধারময় হইয়া উঠিল। ক্রমে সেই আধার গাঢ় হইয়া সম্মুখের বস্তু ও নয়নের দৃষ্টির মধ্যে একখানি কাল পরদা ফেলিয়া দিল। চক্ষে আর দৃষ্টি চলে না, রাজা দশরথ এই আঁধারের মধ্যে লতাকুঞ্জের আশ্রয় লইয়া কতক্ষণ ছিলেন কে বলিবে? তাঁহার মনে তখন কি ভাব উদিত, অপসারিত ও পুনরুদিত হইতেছিল, কে জানে?

হঠাৎ নিকটবর্ত্তী নির্ঝরিণীতে কোন অপূর্ব্ব জ্ঞাত শব্দে তাঁহার চিন্তার শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার বোধ হইল, নির্ঝরিণীতে হস্তীশাবক জলপান করিতেছে। মৃগয়ায় নিবিষ্টচিত্ত দশরথের আগ্রহ বাড়িয়া উঠিল। হস্তীশাবক বধ করিবার অভিপ্রায়ে, অন্ধকারে অলক্ষ্যে শব্দ লক্ষ্য করিয়া শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিলেন। শর নিক্ষেপ মাত্র, বাল-কণ্ঠ-নিঃসৃত কাতর মর্ম্মভেদীস্বর তাঁহার কর্ণগোচর হইল। "হায়! আমি ভ্রমে পতিত হইয়া কি করিলাম!" এই বলিয়া মহারাজা দ্রুতপদ বিক্ষেপে নির্ঝরিণী সমীপে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল—হৃদয় বসিয়া গেল, চারি দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, একটী মুনি বালক শরবিদ্ধ হৃদয়ে রক্ত বমন করিতেছে। অগণিত পশুহনন করা যাঁহার মৃগয়ার প্রধান অঙ্গ, নির্দ্দোষী পশুরক্তে বনভাগ রঞ্জিত দেখা যাঁহার চির অভ্যাস—যুদ্ধক্ষেত্রে নরশোণিতে নদী বহমান দেখা যাঁহার অভ্যাস, আজ এই মুনি বালককে রক্তবমন করিতে দেখিয়া, তাহাকে রুধিরাপ্লুত কলেবরে ধরায় অবলুণ্ঠিত দেখিয়া, সেই পাষাণ-হৃদয় মহারাজারও মনে দারুণ বিভীষিকা উপস্থিত হইল। এ দৃশ্য তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া থাকিতে পারিলেন না—স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না, কি এক অসহ্য মানসিক কষ্টে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি অজ্ঞাতসারে সেই সুকুমার বালকের পাশে বসিয়া পড়িলেন। মনুষ্যের আগমন জানিতে পারিয়া, বাণবিদ্ধ বালক করুণস্বরে বলিতে লাগিল,—"হায়, কোন পাপাত্মা আজ আমার জীবন হরণ করিল! আমি ত কাহার কোন ক্ষতি করি নাই, বনে থাকি, বন ফল খাই, নির্ঝরিণীর জলপান করি—পিতা মাতার সেবা সুশ্রূষা করি। জ্ঞান গোচরে কোনদিন লোকালয়ে যাই নাই, কারো কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করি নাই, পিতা মাতা ছাড়া অন্য কোন মনুষ্য আছে কি না তাহাও জানি না, তবে আমি কার নিকট অপরাধী, কে আজ আমার এদশা করিল। সে কোন্ পাষাণ-হৃদয়? বালক বলিয়া তার মনে কি একটুও দয়া হইল না। উঃ প্রাণ যায়, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায়! কে তুমি আমার কাছে এসেছ, আমাকে একটু জল দাও, আর আমাকে আমার মা বাপের নিকট লইয়া যাও।" দশরথ বালকের এবম্বিধ কাতরোক্তি শুনিয়া বিষণ্ন মনে তাড়াতাড়ি নির্ঝরিণী হইতে অঞ্জলি পূরিয়া জল আনিলেন এবং বালককে পান করিতে বলিলেন। বালক জলপান করিল না—কাতরস্বরে বলিল,—"আপনি কে? আপনার দয়ায় বড় বাধিত হইলাম, কিন্তু আমি জলপান করিতে পারিব না। আমার পিতা মাতা অন্ধ, আমি তাঁদের সর্ব্বস্ব। আমি তাঁদের আহার মুখে তুলে দেই, আমি তাঁদের মুখের কাছে পানপাত্র ধরিলে, তবে তাঁহারা জলপান করেন। আমিই বনে বনে বন্যবৃক্ষ হইতে ফল, নির্ঝরিণী হইতে জল আহরণ করি, তাঁহারা আহার না করিলে আমি আহার করি না। কি জানি, পাছে ভাল ভাল ফলগুলির লোভ সামলাইতে না পারি। আজ আমি যদি আগে আহার করি, তবে যে আমার মহাপাতক হইবে, পিতা মাতার আহারান্তে তাঁহাদের প্রসাদ খাওয়াই ত পুত্রের কার্য্য। আপনি কে জানি না, কিন্তু আপনাকে একটী নিবেদন, আজ সারাদিন বনে বনে বেড়াইয়াছি, একটী ফলও পাই নাই। মহারাজা মৃগয়ায় আসিয়াছেন, তাঁহার সৈন্যেরা সব ফল খাইয়া ফেলিয়াছে, পিতা মাতা আমার ক্ষুধায় ছটফট করিতেছেন, তৃষ্ণায় তাঁদের প্রাণ যায় যায় হইয়াছে—আমি হতভাগ্য জল লইতে আসিয়া-

ছিলাম, জল লইয়া যাইতে পারিলাম না, পিতা মাতার শুষ্ককণ্ঠে একটু জল দিতে পারিলাম না—কোন্ প্রাণে নিজের মুখে জল দিব। আমার প্রাণ যায়, প্রাণ যাবার আগে আর একবার জন্মের মত মা বাপের পাদপদ্ম দেখিতে পাইলাম না, আর এ জীবনে তাঁহাদের মুখে খাদ্য তুলিয়া দিব না। মহাশয়,আমাকে আমার পিতার নিকট লইয়া চলুন, আর যদি পারেন একটু জল লইয়া যান তাঁদের মুখে দিবেন। আপনি বড় দয়ালু, আপনি কে? দেবতা না মানব?" দশরথ নৃপতির বাক্‌শক্তি বোধ হয় তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছিল, না হলে আজ তাঁহার মুখে একটী কথাও নাই কেন? যাহা হউক, অতি কষ্টে মহারাজ বলিলেন,—"আমি পাপিষ্ঠ নরাধম ব্রহ্মঘাতী, আমিই তোমার প্রাণহরণ করিয়াছি, আমিই হতভাগ্য দশরথ।" বালকের জীবনের আলো ক্রমে ক্ষীণ হইতেছিল, মৃত্যুর ছায়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিতেছিল, অতি কষ্টে বলিল "মহারাজ! আপনি !! আমি কি অপরাধ করিয়াছিলাম? শুনিয়াছি, আপনি প্রজার সুখের জন্য সব করিতে পারেন। আমি কি প্রজা নই? তবে কেন আমার জীবনের সামান্য সুখটুকু হইতে আমাকে বঞ্চিত করিলেন? আমি ধন চাই না, মান সম্ভ্রমে আমার প্রয়োজন কি? নশ্বর মনুষ্য জীবন লইয়া পিতা মাতার সেবা করাই পরমধর্ম্ম এবং আমার একমাত্র কর্ম্ম। পিতা মাতা আমার দেবতা, আমি অন্য দেবতা জানিনা। মহারাজ, আপনারা বড় মানুষ; পিতা মাতার সেবা নিজেরা না করিলেও পারেন, অর্থ আছে দাস দাসী রাখিয়া তাঁদের সুশ্রূষা করাইতে পারেন; কিন্তু আমার পিতা মাতার আমি ছাড়া আর কেহ নাই, আমার জীবনের সঙ্গে যে তাঁহাদের জীবন এক সূত্রে গ্রথিত। আজ হইতে তাঁহারাও আর বাঁচিবেন না। মহারাজ,শেষ ভিক্ষা বাবা আমার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া আছেন, মা কত কান্দিতেছেন, আমাকে শীঘ্র তাঁদের নিকট লইয়া চলুন।" বলিতে বলিতে বালকের প্রাণবায়ু তাহার দেহ হইতে চলিয়া গেল।

তারপর আর লিখিতে ইচ্ছা নাই। পুত্রশোকে অন্ধ ও তৎপত্নীর মৃত্যু। দশরথের প্রতি অভিশাপ বর্ণনে প্রয়োজন কি? উপসংহারে মাত্র একটী কথা সখার পাঠক পাঠিকাদিগকে বলিব। এসংসারে পিতা মাতা হইতে আমরা মানব জীবন পাইয়াছি। চাঁদের শীতল আলো, সূর্য্যের প্রখর কিরণ, স্রোতস্বিনী নদী, ফল ফুলে শোভিত তরুলতা, প্রকৃতির মনোহারী ছবি, সুনীল আকাশপটে তারার শোভা, এ সমস্ত যাঁহাদের প্রসাদে দেখিতে পাই; ভাবিয়া দেখ, তাঁহারা আমাদের কেমন আরাধ্য, তাঁহাদের সেবা করা,তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করা, কিসে তাঁহারা সুখে থাকিবেন সতত কায়মনোবাক্যে সেই চেষ্টা করা, কি আমাদের একমাত্র কার্য্য হওয়া উচিত নয়? যে পুত্র পিতা মাতার মনে কষ্টের কারণ হয়? সে কি নরকের কৃমিকীট অপেক্ষা অধম নয়? আর যিনি সেই পিতা মাতার মনে স্নেহ ঢালিয়া দিয়াছেন, যাঁহার স্নেহের কণিকামাত্র লইয়া মাতা আহার নিদ্রা ভুলিয়া সন্তানের লালন পালন করেন, নিজের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া রুগ্ন সন্তানের রোগ শয্যা পার্শ্বে দিন রাত বসিয়া কাটান, সেই জগৎ জননীর চরণে স্থির-ভক্তি, দৃঢ়-বিশ্বাস রাখা কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়? সেই দেবাদিদেবের চরণে, এস আমরা প্রণাম করি, তিনি আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়ে বল দিন্ যেন সংসারের প্রলোভনে পড়িয়া, পিতা মাতার চরণ পূজা করিতে, তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে ভুলিয়া না যাই, পিতা মাতার শুশ্রূষায় যেন আমরা মুনিবালক সিন্ধু মত হই। সিন্ধু বালক; বাল্যে তাহার জীবনলীলা

ফুরাইয়াছিল; কিন্তু পিতা মাতার প্রতি তাহার যে অবিচলিত অনুরাগ ছিল, তাহারই বলে আজ সে অমর। কত কত প্রথিত নামা যশোধাম লোকের সহিত তাহার নাম স্বর্ণাক্ষরে রামায়ণে গ্রথিত আছে।

বিধিলিপি।

(৭০ পৃষ্ঠার পর।)

জামাতা মুহূর্ত্তমাত্রও চিন্তা করিলেন না, কারণ শ্বশুর যাহা বলিলেন, ঠিক তাহাই যে বলিবেন,তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। সুতরাং শ্বশুরের কথা শেষ না হইতেই কহিলেন,—"সে বিষয় মহাশয় কোন চিন্তা করিবেন না। কিঞ্চিৎ অধিক অর্থ দিতে হইলেও আমরা অসম্মত নহি। অতএব যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া কি লইবেন বলেন, তাহা হইলে হয় তো আমি আমার ভ্রাতাকে কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়া একাকীই জবাব দিতে পারি। স্পষ্ট করিয়া বলিতেই বা কি হানি আছে, তিনি আমাকে নয় শত টাকা পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে অনুমতি দিয়াছেন।"

রায় মহাশয় একটু হাসিয়া কহিলেন, "তোমরা তো অবুঝ নও; যা বলেছ ঠিক বটে; কিন্তু ওর উপর একটা শাক আঁটি দিলেই আমি চরিতার্থ হই। শাক আঁটি বল্লাম কেন, তার মানে এই লোকে বলে বোঝার উপর শাক আঁটি বৈতে আর কষ্ট কি? আর একশ টাকা দাও যে আর কারু মনে কোন কথা না থাকে।" যেন একশত টাকা কম লইলে রায় মহাশয়ের যেরূপ দুঃখ, পাত্রেরও সেইরূপ দুঃখ হইবে।

জামাতা ঠিক সেই এক হাজার পর্য্যন্ত স্বীকার করিবার ভার পাইয়াছিলেন, কিন্তু তবু যতদূর কম হয় ততদূর কম করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। শ্বশুরের কথা শুনিয়া তিনি আর একবার হুঁকাটী লইয়া খুঁটীর অন্তরালে গমন করিলেন। শ্বশুরের মনে ভয় হইতে লাগিল, বুঝি তিনি লেবু অধিক কচ্‌লাইয়াছেন; কিন্তু তিনি নূতন ব্রতী নন; সুতরাং বলিতে লাগিলেন, "আমাদের গ্রামের পাত্রটী যেমন লেখা পড়ায় মজবুত, তেমনি দেখিতে শুনিতে অতি সুন্দর। অদৃষ্ট মন্দ, তা না হলে কি আর এমন গ্রামের পাত্র ত্যাগ করিয়া কেহ অন্যত্র যায়?"

জামাতা তামাক সেবন করিয়া আসিয়া কহিলেন,—"আচ্ছা আপনার কথাই রহিল, বোধ হয় রাই ভায়া আমার কথায় অসম্মত হবেন না।" রাই ভায়া তাঁহার সেই খুল্লতাত ভ্রাতা—নাম রাইমোহন।

শ্বশুর। বাবা,তুমি যে কার্য্যে লিপ্ত আছ,তাতে আর কি কেহ সন্দেহ করিতে পারে?

জামাতা। সে যাহা হউক, তবে অদ্যই একটা পত্রাপত্রি হউক, দিনও ভাল আছে। আমি আজ না গিয়া নয় কল্যই যাইব।

পত্রাপত্রির বিষয় উভয় পক্ষ সম্মত হওয়ায় সেই রাত্রিতেই দশজনকে ডাকাইয়া বিনা ব্যাঘাতে সে শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া গেল। বিন্দুমাত্র গোল হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাহাতে কোন পক্ষের কোন ক্ষতিই হয় নাই। গোলটী এই,রায় মহাশয়ের প্রতিবেশী কলেজে পড়া একটী যুবক পত্রখানি লিখিতেছিলেন। সমস্ত লেখা পড়া সমাপ্ত হইলে, তিনি

জিজ্ঞাসিলেন, "আর কি কিছু আছে?" শুনিয়া অপর একজন প্রতিবেশী কহিলেন, "না, আর কিছু নাই, এখন 'ইতি' দাও।" এই কথা শুনিয়া পুরোহিত মহাশয় কহিলেন "না, না, না, এ বিবাহের কথা, এ ক্ষেত্রে "ইতি লেখা উচিত নয়। ওখানে 'মিতি' লেখ।" 'মিতি' লেখা হইলে যথাবিধি চন্দনাভিষিক্ত রজতখণ্ড দ্বারা পত্রিকা চিত্রিত হইলে ইতিওয়ালা প্রতিবেশী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যে এক আটি দূর্ব্বা আছে, এর কি হবে?" লেখক কহিলেন "যিনি 'মিতি' লিখিতে বলিয়াছিলেন, তাহার সম্মুখে দিন, তিনিই খাইয়া ফেলিবেন।" ইহাতে পুরোহিত মহাশয় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। জামাতা তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য টাকার এক টাকা অধিক দিয়া তাঁহার রাগের নিরাকরণ করিলেন; কিন্তু মনে মনে শুভ কর্ম্মে গোলযোগ দেখিয়া তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। শ্বশুর মহাশয়েরও কিঞ্চিৎ মন খারাপ হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তা শূন্য ক্রিয়া।

আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোক, ঢেঁকি, কুলা, থালা, ঘটী, বাটী ইত্যাদি আবশ্যকীয় দ্রব্যের মধ্যে একটী অন্যতম দ্রব্য; অন্ততঃ যত দিন তাহারা স্বাধীন হইয়া আপনার মুখ না ধরিতে পারে। অদ্য সুখদার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া গেল, সরল হৃদয় সুখদা তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিল না। তাহার জানিবার দরকার কি? ঢেঁকি, কুলা, ঘটী, বাটী ও সুখদা সকলি সমান। ঢেঁকি কুলা কি বিচার করিয়া দেখে, কে তাহাদিগকে খরিদ করিল? তবে সুখদা কেন সে বিষয় লইয়া বিচার করিবে? প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ঘটিবেই ঘটিবে—যাহার হাঁড়িতে সুখদা চাউল দিয়া আসিয়াছে, তাহার গৃহে যাইবেই যাইবে। তবে পিতা মাতা কেবল সেই গৃহে যাইবার পথ দেখাইয়া দেন, এবং পারিতোষিক স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ পাইয়া থাকেন!

বাটী উৎসবময়, লোকজন আনন্দে ভাসিতেছে, আহূত প্রতিবাসীবর্গকে সন্দেশ ইত্যাদি আহার্য্য (জামতার ব্যয়ে কিন্তু) দেওয়া হইতেছে। বহু দিবসের পর বৃষ্টি থামিয়াছে। সূর্য্য এত দিন উঠেন নাই, তাহার ক্ষতিপূরণার্থ চন্দ্র পূর্ণাবয়ব ধারণ করিয়া যেন পৃথিবীর মলিনতা ধৌত করিয়া দিতেছেন। সুখদা বৈকাল হইতে নিদ্রিত ছিলেন। লোকের কোলাহলে জাগিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "একি, এত গোল কেন?"

প্রাণের কনিষ্ঠ সহোদরের নিদ্রা ইত্যাগ্রেই ভঙ্গ হইয়াছিল, চক্ষের এ কোণে ও কোণে যেটুকু ছিল তাহা সন্দেশের আঘ্রাণে দিগদিগন্ত দূরীভূত হইল। তিনি ভগিনীর নিকটে আসিয়া কহিলেন, "ছোটদিদি তোর্ বিয়ে।" পথিক পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ সর্প দেখিয়া যেরূপ চমকিয়া উঠে, সুখদা নিজের বিবাহের কথা শুনিয়া সেইরূপ চমকিয়া উঠিলেন, ভাবিলেন কি জানি অদ্যই বুঝি সে কার্য্য সম্পাদিত হইয়া যায়। তিনি ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, এইরূপও কখন কখন হইয়া থাকে। তখন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কি হইয়াছে জানিবার জন্য জননীর নিকট গমন করিলেন।

জননীর নিকট আসিয়া কথাপ্রসঙ্গে শুনিলেন তাঁহার নিদ্রাবস্থায় তাঁহার ভগিনিপতির ভ্রাতার সহিত তাঁহার বিবাহের পত্র হইয়া গিয়াছে। তিনি ইতিপূর্ব্বে মাতার নিকট শুনিয়া ছিলেন যে, তাহাদের গ্রামস্থ পাত্র প্রিয়নাথের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবেক। তদবধি আর কাহারও নাম উক্ত বিবাহের

সংস্পর্শে কেহ কখন উল্লেখ করে নাই। এইরূপ স্থির জানিতে পারিয়া এবং এক্ষণে এই অশুভসংবাদ শ্রবণ করিয়া অবলার মনে যে সমস্ত ভাবের আবির্ভাব হইল,তাহা অনায়াসে অনুভব করা যাইতে পারে; কিন্তু বর্ণনা করা কোনমতে তাদৃশ সহজ নহে।

প্রিয়নাথদিগের বাটী ঐ গ্রামের উত্তর পল্লিতে। কিন্তু সে পল্লিতে পাঠশালা না থাকায় প্রিয়নাথ রায় মহাশয়ের বাটীর নিকটবর্ত্তী পাঠশালায় লেখা পড়া শিখিবার জন্য যাইতেন। সকালে ও বৈকালে যখন গুরু মহাশয় পাঠশালায় না থাকিতেন, তখন যে বাটী পাঠশালা সেই বাটীর বালক বালিকারা, ও রায় মহাশয়ের বাটীর বালক বালিকারা ইত্যাদি সকলে একত্র হইয়া নানা বিধ খেলা করিত। গুরু মহাশয় আসিতেছেন কি না চৌকি দিবার জন্য পালা করিয়া এক এক জন রাস্তার ধারে গিয়া চৌকি দিত। দূর হইতে গুরু মহাশয়ের নানাবিধ রঙ্গের তালি দেওয়া ছাতারূপ পতাকা দেখিতে পাইলেই, সে সঙ্কেত দ্বারা উক্ত বিপদ বিজ্ঞাপন করাইত। অমনি মুহূর্ত্ত মধ্যে যে যাহার স্থানে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে পড়িয়া পড়িয়া লিখিতে আরম্ভ করিত। যে কোন কারণে হউক প্রিয়নাথ ও সুখদা প্রায়ই এক দলে পড়িয়া যাইত। যে দিবস সেরূপ না ঘটিত, সে দিবস কাহারই খেলায় মন লাগিত না। এইরূপে উভয়েরি উভয়ের উপর ভালবাসা জন্মিয়া ছিল। দুয়ের এক জন অনুপস্থিত থাকিলে অপরের নিকট বোধ হইত যেন সে দিবস কেহই খেলিতে আইসে নাই। কালক্রমে যখন তাহাদিগের পরস্পরের বিবাহের কথা উত্থাপিত হইল, তখন উভয়েই পরস্পর যেন পরভাব ধারণ করিতে লাগিল। প্রিয়নাথ সুখদাকে খেলা করিবার সময় না দেখিতে পাইলে অত্যন্ত চঞ্চল চিত্ত হইত। প্রিয়নাথকে না দেখিতে পাইলে সুখদারও ঠিক সেইরূপ ঘটিত। পূর্ব্বে অপর অপর সঙ্গিরা উপস্থিত না থাকিলে দুই জনেই খেলা আরম্ভ করিয়া দিত, অপর কাহার প্রতীক্ষা করিত না। কিন্তু এক্ষণে আর সেরূপ ঘটে না। দুইজনে পরস্পর দেখা হয়, এ দুজনেরি ইচ্ছা; কিন্তু তৃতীয় এক ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে আর উভয়ে একত্র বসিত না বা খেলিত না। তাহাদিগের মধ্যে যে এরূপ ভাবান্তর হইয়াছে, তাহা তাহারা উভয়েই বিলক্ষণ বুঝিয়াছে; কিন্তু এ কথা তাহারা কখনও একত্র হইয়া বলাবলি করে নাই। আর আর বালক বালিকারা সকলেই নিজ নিজ খেলা লইয়াই ব্যস্ত, অপর বালক বালিকারা কে কি করিতেছে,তাহার অনুসন্ধান রাখিত না। ক্রমে যখন বিবাহের কথা একরূপ পাকাপাকী হইয়া গেল, তখন প্রিয়নাথ আর তথায় খেলা করিতে যাওয়া বন্ধ করিল, অথচ পাঠশালে যাওয়া বন্ধ হইল না। কিন্তু পাঠশালায় যাইবার ও আসিবার সময় এদিকে ওদিকে তাকাইয়া দেখে, যদি একবার সুখদাকে দেখিতে পায়। সুখদা নিজেও সেইরূপ করিতে লাগিল। সংক্ষেপত উভয় পক্ষের পিতা মাতা পুত্র কন্যাকে বিবাহ দিবার অগ্রেই বালক বালিকারা আপনারা সে সম্বন্ধ স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিল।

ক্রমশঃ।

ধূর্ত্ত বিড়াল।

দুষ্টু বিড়াল দুষ্টু ছেলের
কেমন স্বভাব ভাই।
লোভের বেলা সাম্‌লে নিতে
কাউকে দেখি নাই।
দুপুর রোদে আধেক পুড়ে
একটী পাখি এসে,
ঘুমচ্ছিল গাছের ডালে
নিঝুম মেরে বসে।
কখন জাগে, কখন মুদে
অলস ভরে আঁখি,
কি সুখে ছিল নুয়ায়ে মাথা
বুকের ভিতর রাখি।
এমন সময় একটী বিড়াল
দাওয়ায় শুয়ে থেকে
আলিস্যি ছেড়ে উঠল ঝেঁকে
দেখ্‌তে পেয়ে তাকে!
লেজটী ফুলে উঠ্‌ল বেঁকে
ধনুর মত হয়ে,
থাবাটী দিয়ে মুখটী পুছে
বস্‌ল দুটী পায়ে।
আড়চোখেতে চেয়ে নিলে
একটী হাই তুলি,
খাড়া হয়ে উঠ্‌ল জেগে
মুখের লোমগুলি।
কেমন ধীরে দাওয়া হতে
একটী লাফে নেমে
গাছের তলা লক্ষ্য করি
চল্‌ল ক্রমে ক্রমে।

আড়াল থেকে উঁকি মেরে
তাহায় দেখে নিয়ে
হেঁট মাথায় বস্‌ল শেষে
গাছের গোড়ায় গিয়ে।
তারপরেতে সেখান থেকে
আপন মনে মেপে—
নিমেষ মাঝে ধরল পাখি,
একটী মৃদু লাফে।

দুহাত দিয়ে ধরেছে তারে
মাঝে গাছের ডাল
বিপদ শেষে যাদুমণির
নামিবার কাল।
দুহাত ছেড়ে নামতে গেলে
পাখি পালায় উড়ে,
পেটে খিদে মুখ বাড়িয়ে
তবুও খেতে নারে।

অনেক সময় দুষ্ট ছেলে
 গাছের উপর চড়ে'
এম্‌নিধারা হয়ে থাকে
 শেষে ফল পেড়ে'।
উঠ্‌বার সময় তাড়াতাড়ি
 যাহক্‌ করে উঠে
নাম্‌বার সময় ভয়ে আকুল
 আঁখির জল ছুটে।
তাইতে বলি শেষটা ভেবে
 লোভটা করা ভাল
নইলে পরে বিড়াল মণির
 পাখি ধরার ফল।

ভাইব'ন।

(৩৮ পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নিরাশ্রয়ে।

মুরলা অবিলম্বে নেপালকে নিয়া মায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। স্কুলের পর আজ বাড়ী ফিরিতে তাহার কেন এত দেরি হইয়াছে তাহার কারণ বিস্তারিত বুঝাইয়া বলিলেন। সেই গাড়োয়ানের সহৃদয়তার কথা শুনিয়া মুরলার মাতার চক্ষে জল আসিল, তিনি নেপালের মুখচুম্বন করিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—"বাবা নেপাল, তুমি স্কুলের পর কোথায়ও কোনদিন দেরি কর না; আজ তোমার এত বিলম্ব দেখিয়া বড়ই অস্থির হইয়াছিলাম। আজ আমার অসুখ যেরূপ বাড়িয়াছে, তাহাতে আর অধিক দিন আমার রক্ষা পাইবার আশা নাই। বাবা সর্ব্বদা এখন আমার কাছে থাকিও; মৃত্যু কালে তোমার হাতের জল যেন একটু আমার মুখে পড়ে। জানিনা ঐ গাড়োয়ান আমাদের কে। তাহার দয়াতেই কিন্তু আজ আমার বেদানা খাইবার সাধ মিটাইতে পারিলে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন তোমার এমন দয়ালু বন্ধুর মঙ্গল করেন।" এই কয়টী কথা বলিয়া নেপালের মাতা বড় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। মুরলা বেদানার দানা ছাড়াইয়া মাতাকে খাওয়াইতেছিলেন। হঠাৎ মায়ের এরূপ অবস্থা দেখিয়া বড় উদ্বিগ্ন হইলেন। নেপাল কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, অমন হইয়া পড়িলে যে? তোমার অসুখ কি খুব বেশী বোধ করিতেছ? শরীর কেমন লাগে এখন? মা, আর বেদানা খাবে না?" নেপালের মাতা অতিশয় মৃদুস্বরে শরীরের অসহ্য যন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"বাবা, বেদানা ত এই অনেক খাইলাম। আর খাব না। অমার শরীরের মধ্যে বড়ই খারাপ বোধ হইতেছে। বুকের মধ্যে ধরফর করিতেছে। হঠাৎ কেন এমন হইল জানি না। আমি বোধ হয় আজ রক্ষা পাইব না। মুরলা, মা আমার, নেপালকে দেখিও। আমি আর কথা বলিতে পারিতেছি না। শরীর বড় অবসন্ন বোধ করিতেছি। শীঘ্রই বোধ হয় চৈতন্য-শূণ্য হইয়া পড়িব।

ভাই ভগিনী মায়ের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া বড়ই অস্থির হইয়া পড়িলেন। মুরলা অশ্রুসিক্তা নয়নে নেপালের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ভাই, ঝিকে নিয়া শীঘ্র একবার ডাক্তার বাবুর নিকট যাও; মা বুঝি আজ আর রক্ষা পান না।" নেপাল

তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া দিদির কথামত ঝিকে নিয়া ডাক্তারের নিকট গিয়া মায়ের অবস্থা জানাইল। অবস্থা শুনিয়াই ডাক্তার বুঝিলেন যে, আজ আর বামন দাস বাবুর স্ত্রীর রক্ষা নাই। যথা সময়ে তিনি রোগীকে গিয়া দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া আসিলেন। আসিবার সময় মুরলাকে স্পষ্ট বলিয়া আসিলেন যে, যেরূপ অবস্থা এখন দাঁড়াইয়াছে তাহাতে রক্ষা পাইবার আশা খুব কম, ঐ রাত্রিতেও হয় ত তাঁহার মাতার প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে। মুরলা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভাই ভগ্নী উভয়ে মাতার পার্শ্বে বসিয়া শেষ সময়ে তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। দুই এক জন পাড়াপ্রতিবাসী আসিয়াও তাঁহাদের সাহায্যে নিযুক্ত হইলেন। মুরলার মাতার জ্ঞান আছে; কিন্তু কথা বলিবার শক্তি আর এখন নাই। কাতরতাপূর্ণ ও সকরুণ দৃষ্টিতে তিনি বারম্বার মুরলা ও নেপালের দিকে চাহিতেছিলেন এবং তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অনবরত জলধারা বহিতেছিল। মুরলা ও নেপালের অবস্থা মনে করিয়াই যে তিনি শেষ সময়ে অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা স্পষ্টই সকলে বুঝিতে পারিলেন। মুরলা মাতার মন কতকটা সুস্থির করিবার জন্য বলিলেন,—"মা, ভগবানকে ডাক, তিনি দুঃখী গরীবের বন্ধু। এ সংসারে তিনিই আমাদের আনিয়াছেন, তিনিই রক্ষা করিবেন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া আমরা সকল দুঃখ কষ্ট বহন করিতে চেষ্টা করিব। আমাদের জন্য তোমার কোন ভাবনা নাই। আর আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, আমার প্রাণের ভাই নেপালের কোন অযত্ন হইবে না। মা, তুমি এখন সুস্থির হইয়া ভগবানের নাম কর, সেই মঙ্গলময়ের শরণাগত হও।" মুরলার এই সমস্ত আশ্বাস-বাক্যে তাঁহার মাতা কতকটা যেন সুস্থির হইলেন। আর এখন তাঁহার বিশেষ যাতনার লক্ষণ দেখা গেল না। চুপ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন।

সেই দিবসই রাত্রি-শেষে মুরলার মাতা সমস্ত দুঃখ কষ্টের হাত এড়াইলেন। মাতাকে প্রবোধ দিবার জন্য মুখে যাহাই বলুন না কেন, মাতার মৃত্যুতে মুরলা বড়ই অস্থির হইয়া পড়িলেন। এ বয়সে ছোট ভাইটীকে নিয়া এখন কাহার আশ্রয়ে দাঁড়ান। নানারূপ কাতরোক্তি করিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। নেপাল ছেলে মানুষ;—সে আরও অধিক অস্থির হইয়া পড়িল। পাড়া-প্রতিবাসী যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, সকলেই নানা প্রকার সান্ত্বনা দিয়া নিতান্ত দুর্ভাগ্য ভ্রাতাভগ্নিদ্বয়কে সুস্থির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মুরলা দেখিলেন যে, তিনি সুস্থির না হইলে নেপাল কিছুতেই শান্ত হইবে না। অতএব পাষাণে বুক বান্ধিয়া তিনি শান্ত ও স্থির হইয়া নেপালকে সুস্থির করিলেন। বন্ধু বান্ধবের সাহায্যে যথাসময়ে মাতার মৃতদেহের সৎকার সমাধা হইল। দিনের পর দিন যেমন কাটিতে লাগিল সমস্ত দুঃখকষ্ট মুরলা ও নেপালের অল্পে অল্পে সহিয়া আসিতে লাগিল। যথাসময়ে বামন দাস বাবুর স্ত্রীর শ্রাদ্ধ শান্তি সম্পন্ন হইয়া গেল। মুরলা এখন তাঁহাদের ভবিষ্যতের উপজীবিকার ও বস বাসের স্থির করিবার জন্য উৎকণ্ঠিতা হইলেন। মঙ্গলার্থী বন্ধু বান্ধব সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, আপাততঃ নেপাল যেরূপ স্কুলে পড়িতেছে সেইরূপই পড়িবে। মুরলার যাহা কিছু টাকা আছে তদ্দ্বারা কোন মতে চালাইবেন; পরে জগদীশ্বর যে ভাবে রাখেন সেই ভাবেই থাকিবেন। নিরাশ্রয়ের ভগবানই একমাত্র আশ্রয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নেপালের পীড়া।

দুই বৎসর এইভাবে কাটিয়া গেল। মুরলার হাতের টাকা কয়েকটী শেষ হইয়া আসিল। নেপাল এখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। এক বৎসর পরেই এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবে। ক্লাশের সে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছেলে। শিক্ষক প্রভৃতি সকলেরই বিশ্বাস যে, নেপাল খুব ভালরকম পাশ হইয়া বৃত্তি পাইতে পারিবে। কিন্তু পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়া চালানই এখন তাহার কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। দুইটী ভাইব'ন এক গৃহে থাকে; অবলম্বন কেবল একটী বিশ্বাসী ঝি। ঝির মাহিয়ানা, নেপালের স্কুলের বেতন, সকলের খাওয়া-পরা ইত্যাদি গত দুই বৎসর কোন মতে চলিয়া আসিয়াছে। মুরলার হাতে এখন যাহা কিছু আছে তাহাতে আর মাসেক দুই মাস অতি কষ্টে চলিতে পারে। তাহার পরে কি হইবে সেই ভাবনা। মুরলার হাতে যাহা কিছু ছিল শুধু তাহাতে এত দিন কোনমতেই চলিত না। তিনি অবকাশমতে শিল্প কার্য্যাদি করিতেন,—অনেক রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া মোজা, কম্ফার্টার ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেন,—এবং সেই সকল দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করাইয়া যাহা পাইতেন তাহাতে সংসারের অনেক সহায়তা হইত। এইরূপ কঠিন পরিশ্রমে মুরলা যে, সংসারের সহায়তা অনেক দিন হইতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা পাঠকপাঠিকা বোধ হয় জানেন। পূর্ব্বেও অনেক ইহার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু মুরলার হাতের জিনিস এখন বাজারে বড় একটা কাটে না। বিলাতি দ্রব্যের আমদানি হওয়াতে তাহাই সকলে সস্তায় ক্রয় করে। দিদির হাতের টাকা যে, ফুরাইয়া আসিয়াছে তাহা নেপাল জানে। তাহার মাথায় এখন বিষম ভাবনা ঢুকিয়াছে। সর্ব্বদা সে এখন ভাবে কি করিয়া আর তাহাদের দিন কাটিবে, কি করিয়াই বা তাহার পড়াশুনা চলিবে। ভাবনায় চিন্তায় নেপালের মুখে কালিমা পড়িল। শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গেল। পড়াশুনা বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

মুরলা নেপালের অবস্থা দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। নেপালকে নানারূপে বুঝাইতে লাগিলেন। "ভাই, কেন ওরূপ ভাবনায় চিন্তায় শরীর নষ্ট করিতেছ। ভগবান যখন পৃথিবীতে আনিয়াছেন, তখন আমাদের জন্য দু-মুঠা মাপিয়াছেনও। তুমি ভাবিয়া ভাবিয়া পড়াশুনা কেন নষ্ট করিতেছ? ভালরূপ পড়িয়া যাহাতে আগামী বৎসর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইতে পার তাহার চেষ্টা কর। এখন তোমার উন্নতির উপর আমাদের অবস্থার উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তুমি গা ছাড়িয়া দিলে সব দিক নষ্ট হইবে।" নেপাল সাশ্রুনয়নে উত্তর করিল,—"দিদি, আমার আর হাতে পায়ে জোর পাই না, মন স্থির রাখিতে পারি না। তোমার এত কষ্ট, এত পরিশ্রমের কথা যখন ভাবি তখন আর আমার লেখাপড়ায় মন যায় না। আমার মনে হয় যে, আমি ব্রাহ্মণের ছেলে,—কাহারও বাড়ীতে রাঁধুনি-বামন হইয়া তোমার কষ্টের লাঘব করি। দিদি, আমাকে একটু ভালরূপ রান্ধিতে শিখাও। আমার লেখাপড়ায় কাজ নাই। আমি রাঁধুনি-বামনের কর্ম্ম নিব।" নেপালের কথা শুনিয়া মুরলার দুই চক্ষু দিয়া জলধারা বহিল। নেপালকে আশ্বস্ত করিবার জন্য তিনি বলিলেন,—"ওরূপ পাগলামি করিও না ভাই। রাঁধুনি-বামন ত শেষেও হইতে পারিবে। উহা ত হাতেই আছে। ওকার্য্য তুমিও করিতে পারিবে আমিও পারিব। কিন্তু যতদিন তাহা না করিয়া এই ভাবে কষ্টে-শ্রেষ্ঠেও চালাইতে পারি তাহার চেষ্টা করা উচিত।

ভাই, তুমি পড়ায় মন দেও। ভাবিয়া ভাবিয়া তোমার শীঘ্রই একটা ভয়ানক পীড়া হইবে দেখিতে পাইতেছি। তুমি এখন ব্যারামে পড়িলেই মহা বিপদে পড়িব। ভগবানকে ডাক, আশ্বস্ত হও। 'নিজের চেষ্টা যে নিজে করে, ভগবান তাহার সহায় হন।'"

মুরলার আশ্বাস-বাক্যে নেপাল মনে কতকটা বল পাইল বটে, কিন্তু তাহার ভাবনা চিন্তা বিশেষ দূর হইল না। তাহার স্কুলের বেতন চলা ভার হইয়া উঠিল। বাড়ীতে ঝির মাহিয়ানা প্রায় দুই মাস বন্ধ আছে। সকল দিন সকলের পেট ভরিয়া খাওয়া হয় না। দিদির খাওয়ার বড়ই কষ্ট হয়। এক বেলা আধ-পেটা খাইয়া লোক কত দিন বাঁচে। নেপালের ভাবনা চিন্তা দূর হইবার নহে। স্কুলের পর হঠাৎ একদিন আসিয়া সে জর জর করিয়া শুইল। রাত্রিতে মুরলা গায়ে হাত দিয়া দেখেন জ্বরে গা পুড়িয়া যাইতেছে। পরদিবস জ্বর আরও বৃদ্ধি পাইল। নেপালের বিকার দেখা দিল, মাথায় দোষ দাঁড়াইল। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিলেন, "জ্বর বড় খারাপ রকমের হইয়াছে। অত্যন্ত সাবধানে রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে।" আহার নাই—নিদ্রা নাই—মুরলা রাত্রিদিন প্রাণের ভাই নেপালের শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিতেন। বাড়ীর ঝিটী বড় ভাল মানুষ। সে সময় সময় বলিত,—"মা, আমি একটু বসি, তুমি চট করিয়া দুইটি রান্ধিয়া খাইয়া নেও। অনাহারে অনিদ্রায় শরীর কত দিন টিকিবে।" সব সময়ে ঝিয়ের কথায় মুরলা সম্মত হইতেন না। ঝিকে প্রায় কোথায়ও হইতে খাইয়া আসিবার জন্য পয়সা দিতেন, এবং নিজে একটু জল খাইয়া থাকিতেন। আর যেদিন নেপালকে একটু ভাল দেখিতেন ঝিকে শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়া চট্ করিয়া দুইটি রান্ধিয়া খাইয়া নিতেন। সময় সময় নেপালের অবস্থা এত খারাপ হইত যে, তাহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিতে হইত। নেপালের শরীরের যাতনা ও কষ্ট দেখিয়া মুরলা অবিশ্রান্ত কেবল অশ্রুপাত করিতেন আর ভগবানকে ডাকিতেন। ২১ দিনের দিন নেপালের জ্বর কম পড়িল, জ্ঞান ও কতকটা হইল। মুরলার প্রাণে বল আসিল। অতিশয় যত্ন সহকারে নেপালের পথ্যাদি চালাইতে লাগিলেন। অল্পে অল্পে নেপাল সারিয়া উঠিল। নেপাল যে দিন প্রথম কথা বলিতে পারিল মুরলা আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন। ৩২ দিনের পর নেপালকে অন্নমণ্ড দিলেন। আপাততঃ এত দিনের পর মুরলার মুখে হাঁসি দেখা দিল। মুরলা মনে মনে পরমেশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন।

ক্রমশঃ।

সোহাগ।

(১)

বল্ দেখি যাদুমণি কেন তোরে ভালবাসি?
দেখিলে ওমুখ তোর, প্রাণ যেন হয় ভোর,
হৃদয়ে উথুলে উঠে স্বরগের সুখ-রাশি!
বল্ দেখি যাদু তোরে কেন এত ভালবাসি?

(২)

কোথাকার ধন তুই এলি এথা কি ভাবিয়া?
এ হৃদয় পুড়ে ছাই হ'তেছিল, দেখি তাই

আসিলি কি জুড়াইতে সুধা-রাশি বরষিয়া!
শীতল হইল প্রাণ চাঁদ-মুখ নিরখিয়া!

(৩)

এ বয়সে এত গুণ দিল তোরে কোন্ জন?
ভাবিতাম আমি হায়, এ ধরা মরুর প্রায়!
সহসা করিলি তায় মনোহর উপবন!
বহালি অমৃত-নদী ভুলাইলি দু-নয়ন!

(৪)

যে দেশেতে ছিলি তুই সে দেশে এমন ধারা,
আছে কিরে তোর মত, অমূল্য রতন কত
সুধায় পালিত সবে তোমার মতন তারা!
জুড়ায় তাপিত-প্রাণ, মুছায় নয়ন-ধারা!

(৫)

যবে তুই আধ-আধ সুধার-মধুর-স্বরে
"মা" "মা" ব'লে গলাধ'রে, ডাকিস্ সোহাগ ক'রে
কি জানি কি সুখে যেন প্রাণ-মন যায় ভ'রে!
আপনারে হারা হই তোরে এই বুকে ক'রে

(৬)

আয় তবে আয় এথা আমার জীবন-ধন!
দু-হাতে গলাটি ধরে, আধ-আধ সুধা-স্বরে,
"মা" বলিয়া ডাক দেখি—ভুলে যাই এ ভুবন!
স্বর্গের বিমল-সুখে হই আমি নিমগন!

গ্রীষ্মের ছুটি।

হরিচরণ কলিকাতার একটি স্কুলে পড়ে। এক মাস পূর্ব্বে গ্রীষ্মের ছুটি হইয়াছিল,—হরিচরণ বাড়ীতে গিয়াছিল। আমরা কিন্তু এখন ছুটির আগের কথাই বলি।

একটি রবিবার আধটি শনিবার, বৎসরান্তে একটি রমজান বা গুড্‌ফ্রইডে, দৈবযোগে একটি সোজা রথ বা আধটি উল্টা রথের ছুটিতেই হরিচরণের যে আনন্দ, তাহাতে একেবারে থোক এক মাস ছয় দিনের ছুটির কথা শুনিয়া সে যে কি পর্য্যন্ত খুসি হইয়াছিল, তাহা আর কি বলিব! যে দিন তাহার ছুটি হইবার কথা ছিল, তাহার আগের দিন সে ভাল করিয়া ঘুমায় নাই; ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া জাগিয়া কেবল ছুটির কথাই ভাবিয়াছিল।

রাত্রি প্রভাত হইলে হরিচরণ যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছিল। আর আর দিন সূর্য্য উঠিলেই হরিচরণের পড়া মুখস্ত করিবার ভাবনা জাগিয়া উঠিত, আজ সে ভাবনা নাই। স্কুলে যাইবার আঠাই বা কত! কলিকাতায় হরিচরণ মাসীর কাছে থাকিত, মাসীকে সকালে সকালে ভাতের যোগাড় করিতে বলিল। ভাত হইল; তরকারি হইতে তর সহিল না, তাড়াতাড়ি আলুভাতে দিয়া খাইয়াই ৯ টার আগেই স্কুলে চলিয়া গেল। হরি চরণের মাসতুতো ভাই তাহার সঙ্গে স্কুলে যাইত, হরিচরণ আজ তাহার অপেক্ষা করিতে পারিল না—ছোট ভাইটীকে ফেলিয়া একাই চলিয়া গেল।

স্কুলের সময় উপস্থিত হইলে শিক্ষক মহাশয় ক্লাশের আসিলেন। বালকেরা আনন্দে ও উৎসাহের সহিত তাঁহার নিকট ছুটির পড়া দেখাইয়া লইতে লাগিল। তিনিও, কিরূপে কার্য্য করিলে তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে ছুটির কয় দিন কাটাইতে পারিবে, তাহাই তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। হরিচরণ কিন্তু তাঁহার একটি কথাতেও কান দিল না। সে কেবল কাহার ঘাড়ে চিমটি কাটিবে, কাহার মাথায় কাগজ কুঁচাইয়া দিবে কেবল ইহারই সুবিধা খুঁজিতে ছিল। যাহা হউক, তাহাতে হরিচরণের ছুটির কোনও ব্যাঘাত হইল না।

হরিচরণ একমাস ছয় দিনের ছুটি পাইল। ছুটির পর দিনই হরিচরণ বাড়ী চলিয়া গেল। হরিচরণের

পড়াশুনায় আগ্রহ না থাকিলেও বইগুলি ফেলিয়া গেল না—সঙ্গে লইয়া গেল। বাড়ী গিয়া খেলায় মত্ত হইল।

হরিচরণ ছুটিতে মোটেই পড়িবে না, এমনটা কিছু তাহার প্রতিজ্ঞা ছিল না, বরং ছুটিতে পুরাতন পড়াগুলা ভাল করিয়া দেখিয়া লইবে, এ ইচ্ছাই ছিল। তবে প্রথম দিন কতক যে মোটেই বই ছুঁইবেনা—নিরবচ্ছিন্ন খেলিবে, এটি সে মনে মনে ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিল।

যাহা হউক তাহার "প্রথম দিন কতক" ত গেল। তখন হরিচরণ আরও দিন কতক সময় বাড়াইয়া লইতে মনস্থ করিল। সে ঠিক করিল, আরও দিন কতক খেলি, ইহার পর প্রতিদিন একটু বেশী বেশী করিয়া পড়িলেই চলিবে। হরিচরণ তাহাই করিল, আরও দিন কতক কাটিয়া গেল। হরিচরণের খেলার আশা কিন্তু এখনও নিবৃত্তি হয়-নাই, কাজেই সে পুনরায় সময় বাড়াইয়া লইতে বাধ্য হইল। ভাবিল আরত কিছু দিন খেলি, তার পর খেলা একেবারেই ছাড়িয়া দিব ও দিবারাত্র বসিয়া পড়িব, তাহা হইলে এ কয় দিনের ক্ষতি পূরণ হইয়া যাইবে। হরিচরণ তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইল। ছুটি প্রায় কাটিয়া গেল। এখন অতি অল্প দিনই বাকী। হরিচরণ ভাবিল, এ কয় দিনে কি বই পড়িব আর কি বই না পড়িব, অতএব আর পড়িয়া কাজ নাই,—যা হয় স্কুলে গিয়াই হইবে। হরিচরণ খেলিতে লাগিল, কিন্তু শীঘ্রই স্কুল খুলিবে ভাবিয়া মনটা কিছু অসুখী হইয়া পড়িল।

হরিচরণের স্কুল খুলিতে আর ৩ দিন আছে। প্রকাশ হরিচরণকে লইতে আসিয়াছে। হরিচরণ বাড়ী আসিয়া জানালার সংলগ্ন একখানি চৌকিতে বইগুলি রাখিয়া ছিলেন, তাহার আর কোনও খোঁজ খবর ছিল না। আজ সেই বইগুলি গুছাইতে গেলেন। গিয়া দেখিলেন ব্যাপার বড় ভাল নয়। তিন চারি দিন উপরি উপরি বৃষ্টি হইয়াছিল, পুস্তকে জলের ঝাটও লাগিয়াছিল। সুতরাং পুস্তকে হরিচরণের সম্পূর্ণ অমনোযোগ থাকিলেও কতকগুলি উই সপরিবারে উহাতে বিলক্ষণ মনো-যোগ দিয়াছিল। হরিচরণ পুস্তকের দুরবস্থা দেখিয়া পুনঃপুনঃ তাহার মাতাকে দোষ দিতে লাগিল। হরিচরণের ছোট বোন্‌টি দাদার বই গুছান দেখিতে আসিয়াছিল। শ্লেট ও পেন্সিল উইএর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে দেখিয়া সে আনন্দের সহিত তাহার মাতাকে উহা দেখাইতে লাগিল। বইএর একখানা উইএ কাটা পাতায় আধখানা ঘোড়ার ছবি দেখা যাইতেছিল। হরিচরণের বোন্‌টি উহা হাতে করিয়া লইল। হরিচরণ জিজ্ঞাসিল, "ও কি লইতেছ?" বালিকা তাহার উপর লাল কালীর যে হাতের লেখা ছিল উহা পড়িয়া বলিল, "হরি——ণ চ——র্ত্তী।" হরিচরণ তাহাকে একটা চড় মারিয়া পাতাখানি কাড়িয়া লইল। দেখিল, "হরি——ণ চ——র্ত্তী"ই বটে, "হরিচরণ চক্রবর্ত্তী"র বাকী অক্ষরগুলি উইএ কাটিয়া দিয়াছে!

বই কাটায় স্কুল বন্ধ হয় না; হরিচরণ স্কুলে গেল। স্কুলের ছেলেরা কিন্তু তাহাকে "হরিণ চর্ত্তী হরিণ চর্ত্তী" করিয়া ব্যস্ত করিয়া তুলিল। স্কুলে একথা কে তুলিল আমরা তাহা জানি না, হরিচরণ কিন্তু বলে, "এ প্রকাশের কর্ম্ম!"

পত্রপ্রেরকদের প্রতি।

শ্রীঅনুকূল চন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা।—ভাল করিয়া লিখিতে চেষ্টা করুন। ইহা ছাপানের উপযুক্ত হয় নাই।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ, আড়রাকুমেজ।—হিয়ালীর সঙ্গে তাহার উত্তর পাঠান নাই। হিয়ালী অথবা ধাঁধার সঙ্গে উত্তর না পাঠাইলে আমরা ধাঁধা সখায় বাহির করি না।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দেওয়ানগঞ্জ।—আপনার প্রেরিত ধাঁধার সহিতও উত্তর নাই, সুতরাং প্রকাশিত হইল না।

ধাঁধা।

গত বারের ধাঁধার উত্তর।

১ ম। ঘুঁড়ি।

২ য়। জল।

৩ য়। আত্মা বা প্রাণ।

নিম্নলিখিত সখার গ্রাহকগণের উপরি লিখিত ৩টী উত্তরই ঠিক হইয়াছে।

শ্রীমতী প্রিয়বালা দেবী, বাবু অবিনাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু শশীভূষণ ভৌমিক, শ্রীমতী বসুমতী দেবী, বাবু যতীন্দ্রনাথ বসু, বাবু প্যারী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু সুরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, বাবু সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীমতী গিরিবালা দেবী, বাবু বিনয় ভূষণ ঘোষ, শ্রীমতী জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী, শ্রীমতী মৃণালিণী গুপ্তা, বাবু এককড়ি দে, বাবু যতীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী, বাবু যতীন্দ্রনাথ দত্ত, মকদমপুর ছাত্রসমিতির সভ্যবর্গ, বাবু যতীন্দ্র নাথ গুপ্ত, বাবু যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বাবু ললিত মোহন ঘোষ, বাবু দেবেন্দ্রনাথ সেন, বাবু ললিত মোহন সেন, বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু ললিত মোহন সাহা, বাবু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীমতী সুভাষিণী গুপ্তা, বাবু হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নূতন ধাঁধা।

সখায় প্রকাশার্থ কয়েকটী ধাঁধা আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা সাদরে তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

১। অস্থি নাই মাংস নাই চর্ম্মমাত্র সার,
ঊর্দ্ধ মুখে চলে সে যে চক্ষু নাই তার।
কহ ভ্রাতা ভগ্নিগণ হিয়ালির শ্রেষ্ঠ,
চরণ উদরে করি হাঁটি যায় পৃষ্ঠ।

শ্রীমোহিনীমোহন রায় (ময়মনসিংহ)

২। তিন অক্ষরে নাম মোর বড় উপকারী,
বিদ্যালয়ের সহ সদা বিচরণ করি।
প্রথম অক্ষর মোর যদি ছেড়ে দাও।
পৃষ্ঠেতে চড়িয়া মোর কত মজা পাও
মধ্যাক্ষর যদি মোর ছেড়ে দেওয়া যায়।
আমায় সাধন করি কত সুখ হয়।
শেষ অক্ষর যদি ছেড়ে দাও ভাই।
প্রভাতে গাহিয়ে আমি জগৎ জাগাই।
বল দেখি ভাই বোন কেবা আমি হই
লৌহের জাতায় আমি বড় কষ্ট পাই।

কুমারী সুভাষিণী গুপ্তা (বেজগাঁ)

৩। রজনীতে জন্ম তার মুখ দুই খান,
জন্মিয়া জন্মদাতা পিতারে করে পান
যার ঘরে জন্ম হয় সেই বসে' কান্দে।
রজনী প্রভাত হলে মুখ দুইখান বাঁধে।

শ্রীমতী হেমলতা সেন গুপ্তা (নোয়াখালী)

সখা

নবম ভাগ। ৭ম সংখ্যা।

জুলাই, ১৮৯১।

বিবিধ।
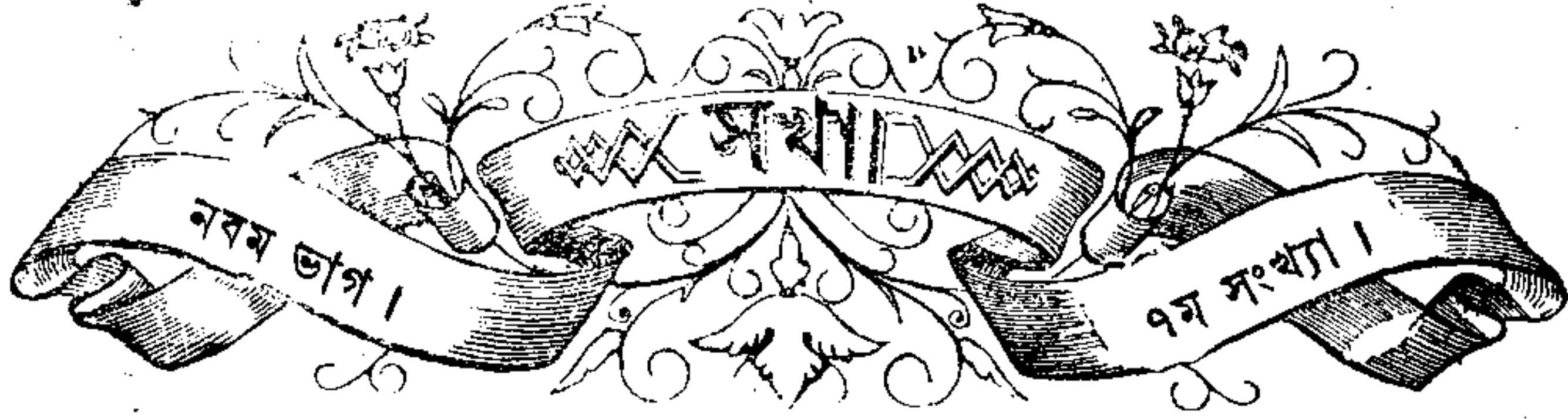
অন্ধের বিদ্যালাভ।—একটী অন্ধ বালিকা মেলবোরণ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছে। বালিকাটী দরিদ্রের সন্তান, এক মহিলা-সমিতি তাহার কলেজে পড়ার ব্যয়ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

* *
*

বাঙ্গলার জেলাস্কুল।—এইরূপ শুনা যায় যে, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের অধিকাংশ জেলা স্কুল মিউনিসিপালিটীর হাতে দিতে সংকল্প করিয়াছেন। জেলা স্কুলগুলি অন্যান্য সমুদয় স্কুলের আদর্শ স্থল অধিকার করিয়া রহিয়াছে—এগুলির দুর্দ্দশা হইলে দেশের বড়ই অমঙ্গল হইবে। ব্যয় লাঘবই এরূপ অনিষ্টের হেতু।

* *
*

হিন্দুস্কুল।—কলিকাতায় হিন্দুস্কুল একটী প্রধান স্কুল। মাসিক আয় হইতে ব্যয় বেশী পড়ে বলিয়া এই স্কুলটী উঠাইয়া দিবার কথা হইয়াছিল। সংপ্রতি মহারাজা স্যার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর ও অন্যান্য কয়েকজন বড়লোকের (যাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রদত্ত টাকায় এই হিন্দুস্কুলটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এখনও চলিতেছে) আবেদনে আমাদের সহৃদয় ছোটলাট বাহাদুর এই স্কুলটী উঠাইয়া দিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন।

* *
*

বাঙ্গালি সিভিলিয়ান।—বাবু বীরেন্দ্র চন্দ্র সেন এবার বিলাতে সিভিল সার্ব্বীস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাঁর নিবাস ঢাকা জেলায়। গত বৎসর গীলক্রাইষ্ট পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া ইনি বিলাতে যান; সবে সাত মাস বিলাতে থাকিয়া সিবিল সার্ব্বীস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত তারক নাথ পালিতের পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ পালিতও এবার সিবিল সার্ব্বীস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আগামী বৎসর কয়েক জন বাঙ্গালি যুবক এই পরীক্ষা দিবেন—তাঁহাদের মধ্যে ৪।৫ জনের কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে।

* *
*

ভদ্রলোকের ধোপার কারবার।—মান্দ্রাজের ট্রিপলিকেন সহরে একটী ধোপা-কোম্পানী খোলা হইয়াছে;—কোম্পানী খুব সস্তায় এবং

সময়মত কাপড় কাঁচিতেছেন।—কলিকাতা সহরে ধোপার বড়ই কষ্ট। যদি কেহ এইরূপ একটী কোম্পানী করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই লাভবান হইবেন, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

*
* *

সংস্কৃত বিদ্যালয়। হিন্দু মহা মণ্ডলের উদ্যোগে দিল্লীতে এক সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য লাক্ষ্ণৌএর বিখ্যাত ধনী দানশীল দেওয়ানা নেওয়াল কিশোর সি, আই, ই এক লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন! এই সদনুষ্ঠানের জন্য ২৫ লক্ষ টাকার দরকার; অবশিষ্ট টাকা সংগ্রহ হইলে মুন্সী নেওয়াল কিশোর তাঁহার প্রতিশ্রুত ১ লক্ষ টাকা দিবেন। সদনুষ্ঠানের জন্য এইরূপ দান প্রশংসনীয়।

* *
*

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা পাঠ্য।—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এল এ, বি, এ পরীক্ষাতে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলন হওয়া উচিত কিনা, এই বিষয় আলোচিত হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষায় এমন পুস্তক নাই, যাহা এল, এ, বি, এ, ও এম, এ পরীক্ষায় পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। বর্ত্তমানে উচ্চশিক্ষার জন্য বাঙ্গালা পুস্তক না থাকিলেও, আবশ্যক হইলে বই বাহির হইত। মীমাংসাতে বাঙ্গালা পুস্তক কলেজ ক্লাশে স্থান পায় নাই।

* *
*

শোক ও আশঙ্কা।—আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বঙ্গের উজ্জ্বল নক্ষত্র ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞানগরিমা প্রভাবে ভারতের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল— সুদূর সাগর পারে তাঁহার যশঃ-সৌরভ বিস্তারিত হইয়াছিল। তাঁহার স্থান পূর্ণ করিতে পারেন,—বঙ্গদেশে এরূপ কেহ নাই,—সমস্ত ভারতে আছেন কি না, সন্দেহের বিষয়। পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শারীরিক অবস্থাও অতিশয় সঙ্কটাপন্ন। তাঁহার জীবনের আশা বড় বড় ডাক্তারগণ একরূপ ত্যাগ করিয়াছেন—এখন উত্থান শক্তি রহিত;—প্রতি ঘণ্টায় দুই ড্রাম গর্দ্দভের দুগ্ধ মাত্র খাইতেছেন। আমরা একাগ্র চিত্তে প্রার্থনা করি, তিনি এই সঙ্কটাপন্ন রোগের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আরও কিছু কাল বাঁচিয়া দেশের মঙ্গল করুন।

শরীর।

(মুখবন্ধ)

আমাদের যে একটা রক্ত মাংস হাড়ের “শরীর” আছে, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। অপর পক্ষে চিন্তা করে ও অনুভব করে, কিন্তু তাহাকে দেখিতে শুনিতে পাওয়া যায় না—এরূপ যে একটা “মন” আমাদের আছে, তাহাও কাহারও নিকট শিখিতে হয় না। শরীরের কোন কোন অংশ, (যেমন বক্ষঃস্থল, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি) আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া আপনা আপনি নড়িতে থাকিলেও, ‘মন’ ইচ্ছা করিলেই শরীরের নানা অংশকে নড়াইতে পারে। ঠিক আমাদের মত শরীর-যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিরও যে মন আছে, এবং তাহারা কি কি চিন্তা করিতেছে ও কি কি

অনুভব করিতেছে, তাহা তাহাদের শব্দ ও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। মানুষের এই শরীর ও মন সম্বন্ধে যদি আমরা একটু বিশেষ ভাবে দেখি, তবে এই বুঝিতে পারি যে, মনটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বা সর্ব্বে-সর্ব্বা।

এই যে আমরা—তা ত কেবল আমরা যা অনুভব কচ্ছি যা চিন্তা কচ্ছি, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা দেখ্‌ছি শুন্‌ছি, যুক্তি তর্ক করে যা সিদ্ধান্ত কচ্ছি, যা জান্‌ছি ও যা ইচ্ছা কচ্ছি—এই সব নিয়েই ত 'আমরা' বলিতে পাচ্ছি। এ সব অর্থাৎ "মন" যদি না থাক্‌ত, তবে 'আমি' বা কোথায় থাক্‌ত আর 'তুমি'ই বা কোথায় থাক্‌ত। আমরা যে কথা বলি, তা কি? তাত কেবল আমরা যা চিন্তা করিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি, 'মন'টা সেইগুলিকে ভাষায় বা কতকগুলি শব্দে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই মুখফুটে উচ্চারণ করিয়ে, প্রকাশ করে বই ত নয়? আর ইচ্ছাপূর্ব্বক যা 'করি' তা কি? 'মন' আগে থেকে যে একটা অভিসন্ধি এঁটে রেখে-ছিল, তাহাই সিদ্ধ বা সম্পন্ন করিল বই ত নয়।

মনটাই শ্রেষ্ঠ হউক আর সর্ব্বে-সর্ব্বাই হউক, চোখ্‌, কাণ, নাক প্রভৃতি শরীরের অঙ্গ বা অবয়ব ভিন্ন আমরা কোন বিষয়ই জানিতে পারি না; আর শরীরের গতি বা অঙ্গভঙ্গী ব্যতীত মনের ইচ্ছা পূর্ণ বা অভিপ্রায় ব্যক্তও করিতে পারি না। তার পর, শারীরিক অঙ্গের মধ্যে 'মস্তিষ্ক' ব্যতিরেকে যে চিন্তা, তর্ক বা কল্পনা করিতে, আশা ও ভয়, সুখ ও দুঃখ অনুভব করিতে পারিতাম না, তাহা বিশ্বাসেরও যথেষ্ট কারণ আছে।

আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাতেও এই বুঝি যে, উন্মাদ প্রভৃতি মস্তিষ্ক রোগে, অথবা রক্তের দোষে মস্তিষ্কের সাময়িক অস্বাভাবিক ক্রিয়ায় বুদ্ধি শুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়। মদ্য পানে লোক যখন মাতাল হয়, তখন মদে দূষিত রক্ত মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হয় বলিয়া, মনের বিকৃতি বা বিক্ষোভ জন্মে। জ্বর রোগে রক্ত অত্যন্ত দূষিত হইলে রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে।

শরীরের অসুস্থতাতে যেমন মনের বিকৃতি ঘটে, সেইরূপ আবার মনের অসুস্থতাতে শরীরের বিকৃতি ঘটে। দুঃসম্বাদ পাইয়া অনেকে মূর্চ্ছা যায়, কেহ কেহ মরিয়াও গিয়াছে। অনেক ভাবনা চিন্তায় সুনিদ্রার ব্যাঘাতে পরিপাক শক্তির হ্রাস হইয়া যায়, শরীর ক্রমেই শীর্ণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

মনের সঙ্গে যখন শরীরের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তখন মনটাকে ভাল রাখিবার জন্য শরীরটাকে কার্য্যক্ষম অর্থাৎ সুস্থ রাখা নিতান্তই আবশ্যক। আর নিজের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সহিত যদি আমাদের পরিচয় থাকে—তাহাদের গঠন-প্রণালী ও কার্য্য-প্রণালী কিরূপ,—কোন্ কোন্ জিনিষ উপকারী ও কোন্ কোন্ জিনিষ অপকারী, তাহা জানিলে স্বাস্থ্যরক্ষা অনেকটা সহজ হয়। তা ছাড়া, একশত বৎসর না হউক, অন্ততঃ মোটা মুটি পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত যে শরীরটা বহিয়া বেড়াইতে হইবে বা যাহা লইয়া 'ঘর-কন্না' করিতে হইবে, তাহার বিষয় কি কিছুই জানা উচিত নয়? অর্থাৎ শরীরের ভূগোল-বিবরণটা একটু আধটু জানা বড়ই দরকার।

শরীরকে মোটামুটি দুই মহাভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ—শরীরের যে যে অংশ বা অবয়ব দ্বারা জ্ঞান লাভ ও গতিবিধি করা যায়, তাহাকে "জ্ঞান লাভ ও গতিবিধির যন্ত্র" বলা যায়; ইহারা মনের সহিত বাহিরের বস্তুর সম্বন্ধ স্থাপন করে। দ্বিতীয়তঃ—আর অন্য যে যে অংশ শরীরকে সর্ব্বদা কার্য্যক্ষম করিয়া রাখে তাহাকে "সংস্কারক যন্ত্র" বলা যায়।

বল ব্যতীত কোন কার্য্যই করা যায় না।

শরীরের দ্বারা যে সব কার্য্য করি, তাহা করিবার বল বা জোর কোথা হইতে আইসে? মন ইচ্ছাই করিতে পারে, শরীরে বল ত আর দিতে পারে না। কেহ যদি বহু দিবস রোগে শয্যাগত থাকে, গায়ে একটুও জোর না থাকে, তবে 'মন' সহস্র ইচ্ছা করিলেও কি সে হাঁটিয়া বেড়াইতে পারে?

কয়লা পুড়িয়া উত্তাপ হয়, সেই উত্তাপে যেমন বাষ্পীয় কলে বলের সঞ্চার হয়, তেমনি আমাদের শরীরের উপাদান সকল ভিন্ন অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইয়া (কয়লা পোড়ার মত) শরীরের উত্তাপ ও বল বিধান করে। কলের মত আমাদের শরীরের যন্ত্রগুলিও সর্ব্বদা পরিচালনায় ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সুতরাং সেগুলিকে কার্য্যকরী অবস্থায় রাখিবার জন্য সর্ব্বদা মেরামত করা চাই। শরীরের যন্ত্রগুলির জীর্ণ সংস্কারের জন্য শরীরেই মেরামতের দোকান আছে। এই মেরামতের জন্য সর্ব্বদা শরীরের উপযোগী নূতন নূতন উপাদান সামগ্রীর আবশ্যক। এই সংস্কার সামগ্রী ও সংস্কার কার্য্যে যে 'কাঠ খড়ের' আবশ্যক, তাহা আমরা উদ্ভিদ্ হইতে গ্রহণ করি;—মাছ, মাংস, দুধ, ঘি ইত্যাদি যাহাই খাই সবই উদ্ভিদ্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—কারণ মাছ, ছাগ, গরু প্রভৃতিরা উদ্ভিদ্ আহার করিয়া সেই উদ্ভিদ্‌কে নিজ শরীরের রক্ত মাংস ও দুধে পরিণত করিয়াছিল, আমরা সেই দুধ ও মাংস খাই।

এইরূপে দেহের যে যে অংশ প্রত্যক্ষ ভাবে মনের কার্য্যের সহায়তা করে, তাহাকে 'মানসিক-দেহের যন্ত্র' বলা যাইতে পারে। ইহার প্রধান অঙ্গ (১) 'স্নায়ুমণ্ডল' (যথা—মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ডের মজ্জা; ও সূত্রবৎ স্নায়ু সকল)। (২) চক্ষু, কর্ণ, প্রভৃতি—'ইন্দ্রিয়' সকল। (৩) 'মাংসপেশী'—ইহাদের আকুঞ্চনে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের গতি উৎপন্ন হয়। (৪) 'কঙ্কাল' বা অস্থিপঞ্জর (শরীরের অস্থি সমূহ)—ইহা স্নায়ুমণ্ডলের প্রধান অঙ্গগুলিকে (মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ডের মজ্জা) কঠিন আবরণে আচ্ছাদন করিয়া রক্ষা করে, এবং মাংস-পেশীর কার্য্য করণের প্রধান অবলম্বন ও সহায়
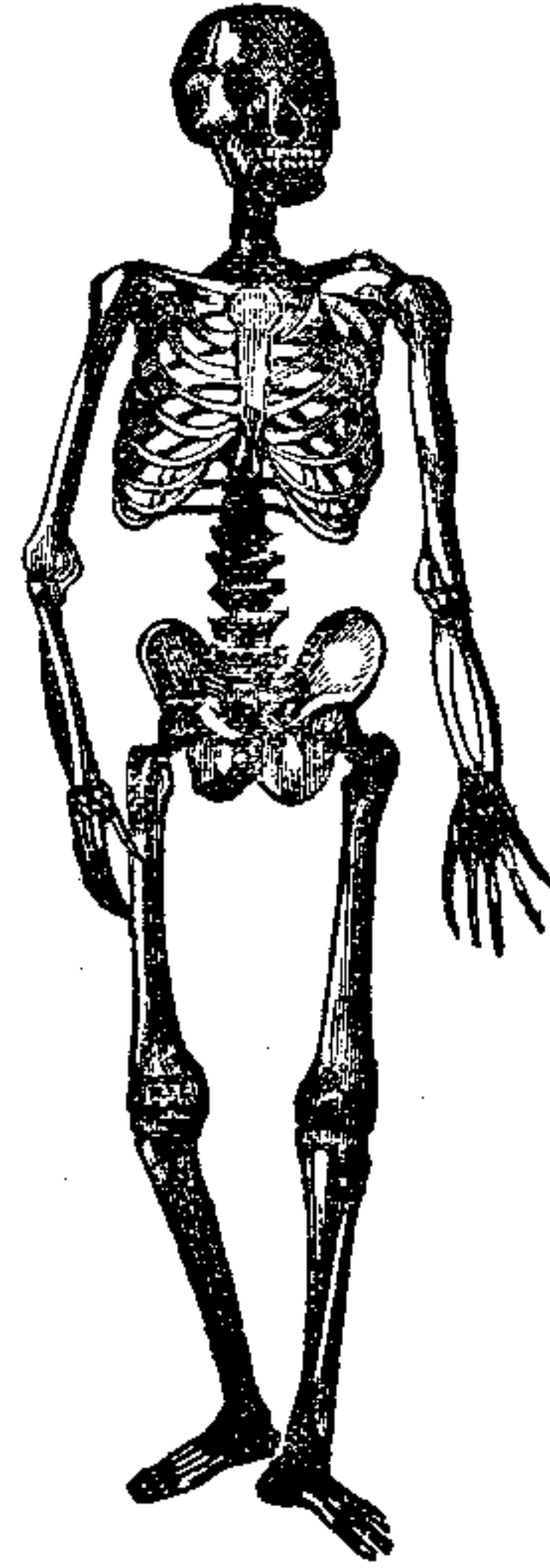
(শরীরের অস্থি সমূহ।)

পক্ষান্তরে দেহের যে যে অংশের সাহায্যে আমরা বাঁচিয়া থাকি, তাহাদিগকে "জৈব-শরীর" (জীবন সম্বন্ধীয় শরীর) বলা যাইতে পারে। ইহারা মধ্য-শরীরের দুই গহ্বরে—বক্ষঃস্থল ও উদরে—সংস্থাপিত। ইহার অঙ্গগুলি—(১) 'গ্রহণী' ভুক্তদ্রব্য গ্রহণ করে বলিয়া (অন্ননালী, পাকস্থলী, অন্ত্র), খাদ্য দ্রব্য উদর-সাৎ করিয়া পাকস্থলীতে জীর্ণ করিয়া শরীরে প্রবেশোপযোগী করিয়া দেয়। (২) খাদ্য 'পরিশোষক যন্ত্রে' পরিপক্ক বা জীর্ণ অন্ন শোষন করিয়া লইয়া তাহাকে

রক্তে পরিণত হইবার উপযোগী করিয়া দেয়। (৩) রক্ত 'পরিচালক' যন্ত্রে (হৃৎপিণ্ড, শিরা ও নাড়ী) সর্ব্বাঙ্গে রক্ত পরিচালিত করিয়া সংশোধন বা পরিষ্কার করিবার জন্য ফুস্‌ফসেতে লইয়া আইসে। (৪) 'শ্বাস যন্ত্রে ফুস্‌ফুসেতে রক্তের সহিত নিশ্বাস বায়ু (অম্লজান) মিশ্রিত করিয়া রক্ত পরিষ্কার করিয়া দেয়। (৫) 'সংস্কার যন্ত্রে' (যকৃৎ, বৃক্ক, চর্ম্ম) শরীরে যে সকল দ্রব্য কোন কাজে লাগে না, অর্থাৎ শরীরের অসার ভাগ, মলা বা আবর্জ্জনা বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। এই সকল যন্ত্রের কায আপনা আপনিই হইতে থাকে, 'মনের' আদেশ বা ইচ্ছার অপেক্ষায় থাকে না।

আদর।

(শিশুর প্রতি)

ভাই সন্তোষ!

কেন রে দুখ কেন রে হাসি
কেন রে আনা গোণা,
কোথায় যাদু কোথায় এলি
কার আঁচলের সোণা?
কার কথাটী উঠ্‌ছে মনে
স্বপন মাখা হাসি,
কেন রে হেন গলায় দিলি
সুখ সোহাগের ফাঁসি!
মাটির দেশে অমন বেশে
কার পানেতে চাও,
মন ভুলনি বুক জুড়নি
নিত্য কোথায় পাও?
কার কোলেতে ছিলি মাণিক,
কার কোলে বা এলি,
দেখ্‌লে পরে ইচ্ছা করে
গলায় গেঁথে ফেলি!
মুখ খানি তোর, কেমন যেন
চাঁদের আলো মাখা,
চোখ্ দুটী তোর অমন কেন
দেখ্‌লে না যায় থাকা!
আয় না যাদু আমার কোলে
চাঁদটী দিব পেড়ে,
বেল, মালতী, গোলাপ, জাতি,
আন্‌ব নিতি কেড়ে;
গেঁথে দিব চিকণ মালা
তারার রাশি তুলে,
খেল্‌তে দিব খেলার সাথী
'সখা'র ছবি খুলে;
দু'চা'র হাজার চুমো দিব
যতটী তুই নিবি,
আস্‌বি তো আজ আমার কোলে
একটু হাসি দিবি?

চিনি।

বালক বালিকারা সাধারণতঃ মিষ্ট প্রিয়। রস, গুড়, চিনি, মিশ্রী হইতে সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি সকল প্রকারের মিষ্ট দ্রব্য খাইতে তাহারা বড়ই ভাল বাসে। বালক বালিকাদের মধ্যে এমন অনেক আছে, যাহারা মিষ্ট দ্রব্য এত অধিক পরিমাণে উদরসাৎ করে যে, তাহাতে তাহারা নানাবিধ

রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে। তাই মিষ্ট খাওয়াটা যদিও মুখ-রোচক বটে, কিন্তু অধিক পরিমাণে খাওয়া কোন মতেই উচিত নহে।

যে কোন প্রকারের মিষ্ট দ্রব্য হউক, তাহাতে অল্প বা অধিক পরিমাণে চিনির ভাগ আছেই; তাই আমরা আজ চিনি তৈয়ার করিবার উপায় সংক্ষেপে লিখিব। যে জিনিসটা আমরা খাই, তাহা কেমন করিয়া প্রস্তুত হয়, জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল জন্মিয়া থাকে। ভরসা করি, আমরা কিয়ৎ পরিমাণে বালক বালিকাদের কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিব। খেজুর-চিনির আদি এবং প্রধান স্থান যশোহর। যশোহর নগর কলিকাতার উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। যশোহরে খেজুর গাছের চাষ, একটী লাভবান ব্যবসা। কিরূপে খেজুর গাছের চাষ করিতে হয়, কিরূপে কোন্ সময় তাহা হইতে রস বাহির করিয়া লইতে হয়, কিরূপে গুড় এবং গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত হয়, নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল।

উচু জমী খেজুর গাছ রোপণ করিবার পক্ষে খুব ভাল। চাষারা নীরস উচু জমী দেখিয়া আট হাত অন্তর খেজুরের চারা পুতিয়া যায়। ইহার চাষে বিশেষ কিছুই দেখিতে হয় না। কেবল যাহাতে খেজুরের জমীতে কোন প্রকার তৃণ বা বৃক্ষাদি না জন্মে তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়; এবং বৎসরের মধ্যে একবার জমীটা লাঙ্গল দ্বারা চষিয়া দিতে হয়। চারাগুলি ক্রমে বড় হইয়া সাত বৎসর পরেই রস দিবার উপযুক্ত হয়। সাত বৎসর পূর্ব্বেও গাছ কাটিয়া * রস বাহির করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে গাছগুলি অকালে মরিয়া যায় এবং যত দিন জীবিত থাকে, অল্প পরিমাণে রস প্রদান করে।

কার্ত্তিক মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত খেজুরের রস সংগ্রহ করা হয়। সেই রস জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করে। প্রত্যেক খেজুর গাছ প্রতিদিন কাটা হয় না। ৬। ৭ দিন বাদে তিন চারি দিন করিয়া কাটিয়া থাকে। প্রথম দিনের রস সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহার গুড়ে দিব্য একটী গন্ধ হয়, দ্বিতীয় দিনের রসও মন্দ নয়, তাহার গুড়ও ভাল হয়; কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ দিনের রস হইতে যে গুড় প্রস্তুত হয়, তাহা ভাল হয় না। কিন্তু সব কয়েক দিনের রসের যে গুড় হয়, তাহা হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। রস হইতে গুড় প্রস্তুত করিবারও কৌশল আছে। তাহা লিখিয়া বুঝান বড়ই দুষ্কর।

চিনি প্রথমতঃ দ্বিবিধ। দলুয়া ও পাকা। প্রথমে দলুয়া চিনি কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাই লিখা যাইতেছে।

চিনি প্রস্তুতকারীরা গুড় লইয়া খুব বড় বড় বস্তার ভিতর পুরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। এবং বস্তার দুই পাশে খুব চাপ দিয়া ঝুলাইয়া রাখে। নীচে মৃত্তিকার পাত্র রাখে। এই মৃৎপাত্রে গুড় হইতে এক প্রকার কাল রস বাহির হইয়া অবস্থিত হয়। ৮। ১০ দিন পরে যখন গুড় হইতে আর রস নির্গত হয় না, তখন বস্তা খুলিয়া লয়। তখন গুড়ের রঙ্গ অনেকটা সাদা গোলাপের মত দেখা যায়। গুড় বাহির করিয়া লইয়া খুব বড় বড় মুখপ্রশস্ত মাটির পাত্রে রাখিয়া দেয়। এই মাটির পাত্রকে না'দ বা গামলা বলে। না'দে গুড় রাখিয়া তাহাতে এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ (যাহাকে চিনি শৈবাল বলে) দিয়া ঢাকিয়া দেয়। এই শেওলা স্রোতহীন নদীতে, বিলে ও অনেক পুকুরে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এই জাতীয় শেওলা গাছ

---

* গাছের মাথার যেখানে পাতা থাকে, সেই স্থানের কতক অংশের পাতা ফেলিয়া, চাঁছিয়া কোমল ভাগ বাহির করিতে হয় এবং তাহা হইতে যে প্রক্রিয়ায় রস বাহির হয়, তাহাকে গাছ কাটা বলে।

সবুজ রঙের, ২ হাত হইতে কখন কখন ৩। ৪ হাত লম্বা হয়, ঠিক যেন সবুজ রঙের অল্প পরিসর ফিতা। গুড়ের উপর শেওলা দিয়া না'দের নীচে ছিদ্র করিয়া পাত্র পাতিয়া রাখে। এই শেওলার বিশেষ গুণ এই যে, গুড়কে সর্ব্বদা আর্দ্র রাখে। এবং সেই আর্দ্রতায় গুড়ের অবশিষ্ট কাল রস বাহির হইয়া যায়। সাত দিন পরে শেওলা তুলিয়া দেখা যায় যে, ৫। ৬ অঙ্গুল নীচে পর্য্যন্ত গুড় সাদা হইয়া চিনির মত হইয়াছে, তখন এই অংশটা তুলিয়া লইয়া আবার শেওলা দিয়া ঢাকিয়া রাখে। আবার ৭। ৮ দিন পরে আর কতকটা তুলিয়া লয়। ক্রমে এইরূপে সমস্ত গুড়টা চিনির আকারে পরিণত হয়। না'দ হইতে যে চিনিটা তুলিয়া লওয়া হয়, তাহা আর্দ্র অবস্থায় থাকে, তাহাকে রৌদ্রে দিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। এইরূপে দলুয়া চিনি প্রস্তুত হয়। এই চিনিই বাঙ্গালার সর্ব্বত্র যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, ১০০ মণ গুড় হইতে ৩০ মণ খুব উৎকৃষ্ট দলুয়া চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু ব্যবসায়ীরা এই দলুয়া চিনি, মূল্য সুলভ এবং অধিক লাভ করিবার জন্য শেওলা দিয়া বেশী দিন রাখে না; সুতরাং গুড় হইতে [illegible] সমস্ত রসটা নির্গত না হওয়ায় চিনির রঙ তত[illegible]টা সাদা হয় না। তখন তাঁহারা এই চিনিকে [illegible] রৌদ্রে শুকাইয়া ঢেঁকিতে কুটিয়া পরিস্কার করে। যাহারা চিনির ব্যবসায়ী নহে, তাহারা এই চিনিকেই ভাল মনে করিয়া থাকে।

দলুয়া চিনি প্রস্তুত করিবার আর একটী উপায়ও আছে। সেই উপায় দ্বারা যশোহরের চাষা গৃহস্থ মাত্রেই চিনি তৈয়ার করিয়া থাকে। সে উপায়ও সহজ। একটা মাটির ছোট হউক বড়ই হউক পাত্রে গুড় রাখিয়া তাহার উপর শেওলা চাপা দেয় এবং পাত্রের নীচে ছিদ্র করিয়া দেয়; তার পর ৭। ৮ দিন অন্তর অন্তর উপর হইতে ক্রমে ক্রমে উপরোক্ত প্রক্রিয়া মত চিনি কাটিয়া লয়। পরে রৌদ্রে শুকাইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে আনে। অল্পায়াসে হয় বলিয়া ইহার দামও কম। এ চিনির মধ্যে উৎকৃষ্ট দলুয়া চিনি পাওয়া যায়। দোকানদারেরা এই চিনি কিনিয়াই বেশী লাভ করে।

দলুয়া চিনি প্রস্তুত করিবার প্রণালীতে বলা হইয়াছে, যে গুড় হইতে এক প্রকার কাল রস বাহির হয়। সেই কালো রস হইতেও চিনি হইয়া থাকে। সেই রসকে জ্বাল দিয়া না'দের মধ্যে ঢালিয়া শীতল করে; পরে শেওলা চাপা দিয়া পূর্ব্বোক্ত উপায়ে চিনি প্রস্তুত করে। এই চিনি প্রস্তুতের পর যে কালো রস বাহির হয়, তাহা জ্বাল দিয়া চিটা গুড় প্রস্তুত হয়। কালো রস হইতে যে চিনি হয়, তাহাতে একটু লালের আভা থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ১০০ মণ গুড় হইতে ৩০ মণ ভাল দলুয়া চিনি হয়। অবশিষ্ট ৭০ মণ পরিত্যক্ত রস হইতে ১০। ১৫ মণ খারাপ দলুয়া চিনি পা[illegible]যা যায়। দলু[illegible]য়া চিনি অধিক দিন স্থায়ী হয় না, অল্প দিন পরেই আর্দ্র হয় এবং বেশী দিন থাকিলে রঙও ময়লা হয় এবং জলসিক্ত বলিয়া বোধ হয়। এই হেতু বেশী দিন স্থায়ী করিবার জন্য পাকা চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাকা চিনি প্রস্তুত করিবার নানা প্রকার উপায় আছে, ক্রমে উল্লেখ করিব।

যশোহরে বিক্রেয় গুড় মাটির বড় বড় কলসে পুরিয়া রাখে এবং ব্যবসায়ীর নিকট সেই গুড়ের কলস বিক্রয় করে। চিনি প্রস্তুতকারীরা সেই গুড় কিনিয়া আনে; এবং কলস ভাঙ্গিয়া গুড় বাহির করিয়া লয়। পরে সেই গুড় এক প্রশস্ত চারিপাশ উচু তক্তায় ঢালিয়া দেয়। পাত্রটা একদিক উচু ও একদিক নীচু করিয়া রাখে। গুড়

ঢালিয়া দিয়া ভাল করিয়া তাহাকে পিশিয়া দেয়। তখন পাত্রের যে দিক নীচু, সেইদিকে অনেকটা কাল রস আসিয়া জমা হয়। অতঃপর গুড় বস্তায় পুরিয়া খুব চাপ দিয়া কিছুদিন রাখিয়া দেয়। এই রূপে যতদূর সম্ভব কালো রস বাহির হইয়া গেলে, বস্তা হইতে গুড় বাহির করিয়া বড় বড় মৃৎপাত্রে জ্বাল দেয় *। তৎপরে না'দে ঢালিয়া তাহাকে খুব করিয়া আলোড়ন বিলোড়ন করে। অর্থাৎ নৌকায় লোকে যে প্রকারে বর্ঠে টানে, সেই প্রকারে দুইজন লোক এক একটা নাদের ধারে বসিয়া, বর্ঠে টানে। এইরূপ করিতে করিতে যখন শীতল হইয়া আইসে; তখন কিছুকাল স্থির ভাবে রাখিয়া দেয়। শীতল হইলে শেওলা দিয়া, দলুয়া চিনি প্রস্তুত প্রণালীতে চিনি প্রস্তুত করে। এই চিনি খুব পরিস্কার ও দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয়।

বাঙ্গালীরা উপরোক্ত উপায়ে পাকা চিনি প্রস্তুত করিয়া থাকে। কিন্তু ইংরাজদের প্রণালী ইহা অপেক্ষা কিছু বিভিন্ন। তাহারা গুড়কে যথা পরিমাণে জলের সঙ্গে [illegible] মিশাইয়া মুখ খোলা চৌবাচ্চায় রাখিয়া [illegible] জ্বাল দেয়। বাঙ্গালীরা যেমন কাঠের আগুনে [illegible] দিয়া থাকে, ইহারা তাহা করে না। ইহারা বাষ্পের উত্তাপে জ্বাল দেয় এবং সর্ব্বদা তাপমান যন্ত্র সঙ্গে রাখে। জ্বাল দিতে দিতে অপরিস্কার অংশের পাতলা একটা পরদা উপরে ভাসিয়া উঠে—সেই ময়লাটা ফেলিয়া দিয়া পাত্রস্থ তরল গুড়টা অন্য আর একটা পাত্রে পরিচালিত করে। অন্য পাত্রে যাইবার সময় ইহা খুব মোটা কাপড় দিয়া ছাকা হইয়া যায়। এই পাত্রে রাখিয়া জলীয় অংশটা জ্বাল দিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলে; ফারেন হিটের তাপমান যন্ত্রের ১৬০° ডিক্রী পরিমাণ উত্তাপে জ্বাল দিয়া জলীয় ভাগটা শোষণ করিতে হয়, এবং তাহা হইলেই বাজারে যে দানা ওয়ালা দোবরা চিনি পাওয়া যায়, ঠিক সেই প্রকারের চিনি প্রস্তুত হয়। আর যদি ২১২° ডিক্রী উত্তাপে জ্বাল দিয়া জলীয় ভাগ শোষণ করা হয়, তবে আমাদের দেশী পাকা চিনির মত চিনি হয়। †

কাশীপুর প্রভৃতি স্থানে যে দোবরা চিনি প্রস্তুত হয়, তাহাও উপরোক্ত উপায়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে গুড়ের পরিবর্ত্তে দলুয়া চিনি ব্যবহার করা হয়।

ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার প্রণালীও ঐরূপ। প্রথমতঃ ইক্ষু হইতে রস নিষ্কাষিত করিয়া লওয়া হয়, সেই রস জ্বাল দিয়া গুড় হয়। সেই গুড় হইতে উপরোক্ত বিবিধ উপায়ে চিনি হইয়া থাকে।

এই স্থানে আমাদের প্রস্তাবের উপসংহার করিবার কথা—কিন্তু একটী বিষয় বলিবার আছে। তাহা বলা হইলেই, আজকার জন্য বিদায় হইতে পারি।

বৃক্ষ জাতি মাটিতেই জন্মে। খেজুর গাছ যে মাটিতে হয়, নিম গাছও সেই মাটিতে হয়; অন্যান্য গাছও তাহাতে জন্মে। একই মাটির রস আকর্ষণ করিয়া সকল বৃক্ষই বৃদ্ধি পায়, ও বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু [illegible] দেখ, খেজুর গাছ মাটীর রস লইয়া মিষ্ট রস প্রদান করে, নিম্ব বৃক্ষ সেই রস গ্রহণ করিয়াই তিক্ত রস প্রদান করে। বালকদের মধ্যেও ঠিক এই রূপ। গুরুর উপদেশ পাইয়া একজন বিদ্বান ও সচ্চরিত্র হয়, আর একজন মূর্খ ও পাষণ্ড হইয়া যায়। আমরা আশা করি, বালক বালিকারা সকলই খর্জ্জুর বৃক্ষ, সকলেই সচ্চরিত্র ও বিদ্বান হইবে। একটু কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, একটু ধর্ম্মভীরুতা থাকিলেই "সখার" পাঠক পাঠিকারা খেজুর গাছের মত সুরস-বান হইতে পারিবে।

---

* দুইবার করিয়া জ্বাল দিতে হয়।

† ইংরাজ দিগের প্রথম চিনির কারখানা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত ধোকায়।

ARTIST PRESS

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে,

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (বন্দ্যোপাধ্যায়), সি, আই, ই,

গত ২৮শে জুলাই, মঙ্গলবার, রাত্রি ২ ঘটিকার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন।
তাঁহার মৃত্যুতে আজ সমস্ত বঙ্গদেশ দুঃখিত। সখার পাঠকপাঠিকাগণকে জানাইতেছি যে,
তাঁহার সচিত্র জীবনচরিত আমরা ১৮৮৫ সালের সখার ১৫৪ পৃষ্ঠায় এবং
তাঁহার অসাধারণ দয়ার বিষয়ে কতকগুলি গল্প
১৮৮৬ সালের সখার ৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছি।

আত্মোৎসর্গ।

(রাজস্থানের একটী ঐতিহাসিক ঘটনা)

যবন দিগের প্রবল পরাক্রমে যখন রাজপুত-বীরগণ নিতান্ত নিস্তেজ ও নিস্পৃহ হইয়া পড়িয়াছিলেন ;—যখন রাজপুতদিগের বিজয় গৌরব লুপ্ত প্রায় হইয়াছিল, যখন মারবার, অম্বর, বিকনীর প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজ্যের রাজকুমারগণ যবনের পাপ প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া ছিলেন, —তখন রাজস্থানের সেই তিমিরাচ্ছন্ন আকাশে হঠাৎ একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রকাশ পাইল। সুপ্রসিদ্ধ শিশোদীয়কুলের সমস্ত মান সম্ভ্রম ও যশোগৌরবে অলঙ্কৃত হইয়া প্রতাপ সিংহ বিশাল মিবার-রাজ্যের একাধিপত্যে নিযুক্ত হইলেন। স্বদেশীয় ভট্ট দিগের কাব্যগ্রন্থে প্রতাপ তাঁহার পিতৃপুরুষ গণের অসাধারণ বীরত্ব ও মাহাত্ম্যের বিবরণ অবগত হইয়া ছিলেন। সেই বীর নৃপতিগণ কখনও শত্রু-সমক্ষে অবনত-মস্তক হয়েন নাই ; শত্রুহস্তে নিরন্তর নির্যাতন ভোগ করিয়াও কখনও তাঁহাদের স্বাধীনতা দান করেন নাই। মুসলমান দিগের হস্তে চিতোর-পুরী অনেকবার ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কেহ কখনও ইতিপূর্ব্বে ঐ নগরী সম্পূর্ণ হস্তগত করিতে পারে নাই। প্রতাপ যখন মিবারের রাজ্যভার প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার রাজধানী, সহায়, সম্বল, উপায় ও অবলম্বন কিছুই ছিল না। চিতোর পুরী তখন যবন-হস্তগত। তিনি নিজে চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শত্রু-বেষ্টিত।

এই দুর্দ্দিনে কি করিয়া পিতৃপুরুষ গণের পূর্ব্ব বল ও পূর্ব্ব গৌরব পুনঃসঞ্চয় করিবেন, কি করিয়া চিতোর নগরীর পুনরুদ্ধার করিবেন, কি করিয়াই বা দুরাচার যবন দিগের পাপের শাস্তি দিবেন, প্রতাপ অবিরাম সেই চিন্তায়ই নিমগ্ন থাকিতেন। সেই চিন্তা যতই ক্রমে বলবতী হইতে লাগিল ততই তাঁহার হৃদয় সাহস ও উৎসাহে দৃঢ়তর হইয়া উঠিল, এবং তিনি তাঁহার মহামন্ত্র সাধনে উত্তেজিত হইতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন যে, তিনি নিজে নিঃসহায় ও নিঃসম্বল ; কিন্তু তাঁহার শত্রু মোগল সম্রাট আকবর অত্যন্ত পরাক্রমশালী। এমন শত্রুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে বলিয়াই প্রতাপ অধিকতর উৎসাহিত হইয়াছিলেন। চিতোরের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন, তথাপি যবনদিগের নিকট স্বাধীনতা বিক্রয় করিবেন না, এই তাহার স্থির প্রতিজ্ঞা।

এদিকে সুচতুর সম্রাট আকবর সাহ প্রতাপের সমস্ত চেষ্টা ও উদ্যম গোপনে গোপনে ব্যর্থ করিতেছিলেন, তিনি আশ্চর্য্য কৌশলে এবং নানা প্রলোভনে প্রতাপের স্বজাতীয় ও স্বধর্ম্মাবলম্বী নৃপগণকে, এমন কি তাঁহার আত্মীয় কুটুম্বগণকে বশীভূত করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অসিধারণ করিতে লওয়াইয়াছিলেন। মারবার, অম্বর, বিকনীরের রাজ কুমারগণ—এমন কি মিবারের প্রধান মিত্র বুন্দিরাজ পর্য্যন্তও যবনের পাপ প্রলোভনে বশীভূত হইয়া প্রতাপের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ছিলেন। এ সকল দুঃসম্বাদ যখন প্রতাপের কর্ণগোচর হইল, যখন শুনিলেন যে, আত্মীয় স্বজন ও সজাতীয় বর্গ সকলেই তাঁহাকে ছাড়িয়া যবনের পক্ষাবলম্বন করিয়াছে, তখন তাঁহার মনোবেদনার আর সীমা রহিল না, রাগ ও দুঃখে উন্মত্ত হইয়া সেই রাজপুত কুলকলঙ্কগণের নামে শত সহস্র ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার হৃদয়ের সাহস ও উৎসাহ কমিল না।

উচ্চপদ ও বিপুল ধন লাভের আশায় মুগ্ধ হইয়া যদিও রাজপুত নৃপগণ যবনের পক্ষাবলম্বন করিলেন তথাপিও প্রতাপ একেবারে নিঃসহায় হইলেন না। অর্থে বা প্রলোভনে যে আনুকূল্য সমস্ত পৃথিবীর রাজা হইয়াও পাওয়া যায় না তিনি সেই উচ্চতম স্বর্গীয় ও পবিত্র আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুরক্ত সর্দ্দার ও সামন্ত গণের পবিত্র হৃদয়ের সহানুভূতি তিনি পাইয়া ছিলেন। ভিল সর্দ্দারগণ প্রভুর বিপদে তাহাদের তুচ্ছ প্রাণ দান করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। সম্রাট আকবর সাহ অনেক প্রলোভন দেখাইয়া এই সর্দ্দার গণকে প্রতাপের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হন নাই। এই সর্দ্দার বীরগণ অত্যন্ত কঠোর বিপদেও প্রতাপের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া অম্লানবদনে আপনাদের হৃদয়শোণিত প্রভুর কল্যাণে প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের বীরত্ব, মহত্ব ও আত্ম-ত্যাগের কথা মিবার-ইতিহাসে জীবন্ত ও জ্বলন্ত অক্ষরে চিরকাল মুদ্রিত থাকিবে।

বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপ সিংহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আত্মীয় স্বজন সকলে ছাড়িয়া গেলেও তিনি জননীর পবিত্র স্তন্যদুগ্ধ কখনই কলঙ্কিত করিবেন না। এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তিনি তাঁহার অনুরক্ত সর্দ্দার সামন্তগণের সাহায্যে ক্রমাগত পঁচিশ বৎসর কাল দুর্দ্দান্ত মোগল সম্রাটের বিপুল সেনাবল ও সমবেত চেষ্টা বিফল করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই দীর্ঘকাল যে তাঁহার কত কষ্ট কত নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা মনে করিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যুদ্ধ করিতে করিতে কত সময় তাঁহার প্রাণের আশা একেবারে ত্যাগ করিতে হইয়াছে; কত সময় শত্রু হস্তে তাঁহার জীবন যায় যায় হইয়াছে, কেবল দেবতার আশীর্ব্বাদে এবং অনুরক্ত সর্দ্দার বীর গণের সহায়তায়ই তিনি রক্ষা পাইয়াছেন। কত সময় কত যুদ্ধে সর্দ্দারগণ আপনাদের প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া প্রভুর জীবন রক্ষা করিয়াছেন। সে সমস্ত পুণ্যকীর্ত্তির কথা ভাবিতে গেলেও হৃদয়ে স্বর্গীয় সুখের উদয় হয়, নয়নে পবিত্র সলিল প্রবাহিত হয়। অদ্য আমরা সখার পাঠক পাঠিকাদের নিকট তাহার একটী পুণ্য কীর্ত্তির উল্লেখ করিব।

বীরবর প্রতাপ সিংহকে মোগলদের সহিত পঁচিশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত অসংখ্য যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই সমস্ত যুদ্ধের মধ্যে হলদিঘাটের ভীষণ ক্ষেত্রেই তাহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে। দিল্লীশ্বর আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম অসংখ্য সেনাবল সহ খৃঃ ১৫৭৬ সালে প্রতাপ সিংহকে অক্রমণ করেন। রাজা মানসিংহ যুদ্ধোপযোগী পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। যুবরাজ সেলিমের সৈন্যের সংখ্যা করা যায় না। তাহারা সমস্ত রাজ্য ছাইয়া ফেলিয়া ছিল। কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপের সহায় সম্বল কি? দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত ও কতিপয় ভীল-বীর। তাঁহার আপনার এবং এই রাজপুত ও ভিলবীর গণের হৃদয়ের প্রচণ্ড উৎসাহই তাঁহার একমাত্র সম্বল।

আরবল্লির বিস্তৃত, কূটপথপরিপূর্ণ প্রদেশ মধ্যে প্রতাপ অতি সতর্কভাবে সদল সহ অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই প্রদেশ উদয়পুরের পশ্চিমে। কেবল পর্ব্বত ও নিবীড় কাননে পরিবেষ্টিত। উহার মধ্যস্থ গমনাগমনের পথ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ছিল। চতুর্দ্দিকে কেবল পর্ব্বত ও ঘন বৃক্ষশ্রেণী ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। এই প্রদেশের নামই হলদিঘাট। দুর্গম হলদিঘাটের ভীষণক্ষেত্রে বীরকেশরী প্রতাপ মিবারের প্রধান প্রধান বীরগণের

সহিত শত্রুসেনার আক্রমণ প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান আছেন। খৃঃ ১৫৭৬ সালের শ্রাবণমাসের সপ্তম দিবসে উভয়দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া অতি ভয়ানক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রবল পরাক্রমশালী যবন দিগের হস্ত হইতে মিবারের স্বাধীনতা ও গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য প্রতাপের সহকারী রাজপুতগণ অসাধারণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া দলে দলে ভীমপরাক্রমের সহিত মোগলসেনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বীরকেশরী নির্ভীক প্রতাপ সিংহ-বিক্রমে সর্ব্বাগ্রে ধাবিত হইয়া শত্রুসেনাব্যূহ ভেদ করিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার সেই অদ্ভুত সাহস ও বিক্রম দেখিয়া তাঁহার সর্দ্দার সামন্তগণও সিংহ-বিক্রমে মোগলসৈন্যের উপর অনর্গল পতিত হইতে লাগিলেন। প্রতাপের চেষ্টা ফলবতী হইল। তাঁহার অমানুসিক বিক্রমের প্রভাবে শত্রুব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। সেই বিভক্ত মোগল সেনাশ্রেণী দলিত ও মথিত করিয়া প্রতাপ উন্মত্তের ন্যায় রাজপুতকুলকুলাঙ্গার মানসিংহের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোথায়ও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

মানসিংহকে অনুসন্ধান করিতে করিতে প্রতাপ সেলিমের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। হিন্দুবৈরী মোগল সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সম্মুখে দেখিয়া প্রতাপ দ্বিগুণতর সাহস, উৎসাহ ও প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। শাণিত ভীষণ অসি উত্তোলন করিয়া তাঁহার প্রিয়তম অশ্ব চৈতককে সেলিমের দিকে দ্রুতবেগে চালাইলেন। ভীষণ অসির আঘাতে যুবরাজের শরীররক্ষক গণ দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। তখন প্রতাপ সেলিমের উন্নত রণহস্তীর সম্মুখীন হইলেন এবং সেলিমকে লক্ষ্য করিয়া হস্তস্থ ভীষণ শূল সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। সেলিমের হাওদা স্থূল লৌহপাত্রে নির্ম্মিত ছিল তাই তিনি সেই শূলের আঘাত হইতে রক্ষা পাইলেন, নতুবা তাঁহাকে সেই স্থলেই প্রাণ হারাইতে হইত। সেই শূল হাওদায় লাগিয়া ফিরিয়া আসিয়া মাহুতকে আঘাত করাতে মাহুত তদ্দণ্ডেই ভূপতিত হইল, এবং সেলিমের হস্তি ক্ষেপিয়া তখনই তাঁহাকে লইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিল। প্রতাপ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলেন।

এদিকে মুসলমান সৈন্যগণ যুবরাজের প্রাণ রক্ষার্থ প্রতাপকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিল। চতুর্দ্দিক হইতে প্রতাপের উপর অসংখ্য তীর বর্ষণ হইতে লাগিল। প্রতাপ নির্ভীকচিত্তে কতিপয় রাজপুতসহ অসংখ্য মোগলসেনার সহিত যুঝিতে লাগিলেন। তখন উভয়দলের মধ্যে ভয়ানক সমরানল প্রজ্বলিত হইল। একদিকে অগণ্য মোগলসৈনিক আপনাদের সম্রাট তনয়ের রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে অবিরাম অসি চালনা করিতে লাগিল, অপরদিকে নির্ভীক স্থির-প্রতিজ্ঞ কতিপয় রাজপুতবীর প্রতাপের উদ্দেশ্য-সাধনে সহায়তা করিবার জন্য প্রাণপণে মোগলদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কতশত মোগলসৈনিক তাঁহার সেই অমানুষিক বিক্রম প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া রণস্থলে প্রাণ হারাইলেন। দলে দলে মুসলমানসৈন্য ভূপতিত হইতে লাগিল, আবার দলে দলে অন্য সৈন্যগণ আসিয়া তাঁহাদের স্থান অধিকার করিয়া প্রতাপের রাজপুত সৈনিকদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনেক রাজপুতবীর রণস্থলে প্রাণ হারাইলেন এবং ক্রমে প্রতাপের পক্ষ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত বলশূন্য হইয়া পড়িল। প্রতাপসিংহের নিজের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; তিনি রণোন্মত্ত হইয়া বারংবার রাজপুতকুলকলঙ্ক মানসিংহের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এরূপ অল্পসৈন্য নিয়া অসংখ্য মোগল-

সৈন্যের সহিত কতক্ষণ যুদ্ধ চলিতে পারে। অনেকবার প্রতাপের জীবন বিষম সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল কিন্তু অসীম বিক্রমের সাহায্যে তিনি নিজের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু এবার বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইল। তাঁহার সদ্দার সামন্ত প্রায় সমস্তই নিহত হইয়াছে। তিনি এখন যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সেই দিক হইতেই শত্রুদল বিকট ভ্রূকুটি সহকারে অসিহস্তে তাঁহারদিকে ধাবিত হইতেছে। তাঁহার মস্তোকপরি রাজছত্র উন্নত ছিল, সেই উন্নত ছত্র লক্ষ্য করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে শত্রুসেনা প্রতাপের উপর অসিচালনা করিতে লাগিল। অসির প্রচণ্ড আঘাতে প্রতাপের সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত হইল। প্রতাপ বুঝিতে পারিলেন যে এবার আর রক্ষা নাই, তথাপি তিনি মূহূর্ত্তের জন্য নিরুৎসাহ হইলেন না, কিন্তু একাকী কতক্ষণ আর সেই অগণ্য যবনসেনার সহিত যুদ্ধ করিবেন। সুতরাং এখন অদ্ভুত রণনৈপুণ্যের সহিত তিনি সেই রণস্থল হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময় "জয় প্রতাপের জয়" রব শুনিতে পাইয়া প্রতাপের হৃদয় দ্বিগুণতর উৎসাহে পরিপূর্ণ হইল এবং তিনি সদম্ভে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। ছত্রধর তখন সদর্পে উৎসাহের সহিত উজ্জ্বল রাজচিহ্ন মস্তকোপরি উন্নত করিয়া ধরিল।

প্রতাপের তখন বিষম বিপদ উপস্থিত হইল। আবার চতুর্দ্দিক হইতে সেই রাজচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া প্রতাপের উপর মুসলমান সৈনিকগণ তাহাদের ভীষণ অসি চালাইতে লাগিল। ঝালাপতি মাল্লা তখন দেখিতে পাইলেন যে প্রভুর প্রাণ আর কিছুতেই রক্ষা হয় না। তখন তিনি আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত উদাহরণ রাখিয়া প্রভুর জীবনরক্ষা করিলেন। বীরবর মাল্লা উল্লম্ফন পূর্ব্বক সদলে প্রতাপের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রতাপের মস্তক হইতে মিবারের রাজচিহ্ন সরাইয়া নিয়া নিজের মস্তকের উপর ধরিলেন এবং সদর্পে শত্রুসেনাব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে প্রতাপ মনে করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে শত্রুগণ ভয়ানক আক্রমণ করিল। অসীম বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বীরবর মাল্লা সদলে প্রভুর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিলেন।

দূর হইতে বীরকেশরী প্রতাপ সেই জ্বলন্ত আত্মোৎসর্গের ছবি দেখিতে পাইলেন। মনে মনে ঝালাপতি মাল্লাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিলেন। প্রতাপের প্রাণ রক্ষা হইল বটে; কিন্তু সেই দিবস সেই ভীষণ রণক্ষেত্র হইতে দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত সৈন্যের মধ্যে কেবল অষ্টসহস্র প্রত্যাগত হইতে পারিয়াছিল। প্রতাপ কেবল ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই প্রাণ নিয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন। বীরবর মাল্লার বংশধরগণ তাঁহার এই আত্মোৎসর্গের পুরস্কার স্বরূপ বহু সম্মান ভোগ করিয়া ছিলেন।

সখার পাঠক পাঠিকাগণ, এইরূপ স্বর্গীয় ছবি রাজস্থানে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা মাঝে মাঝে তোমাদিগকে তাহার দুই একটী উপহার দিয়া সুখী করিতে চেষ্টা করিব।

হরিধনের বানর।

সহর জুড়ে হরিধনের
ডাক সাইটে নাম,
শোনেনি তার গুনের কথা
নাইক এমন গ্রাম।
ঘড়ির কাজে হরিধনের
নাইক সমান আর,
সাহেব বাড়ির ঘড়ি সারা
তারই উপর ভার।

একটা দামি ঘড়ি লয়ে
সার্‌তেছিল নিজে,
কি ভেবে সে উঠে গেল
বিশেষ কোন কাজে।
তাড়াতাড়ি চলে গেল
ঘড়িটী সেথা ফেলে,
নাইক কেহ যতন করে'
রাখ্‌তে সেটী তুলে।
বানর ভাবে প্রভুর বুঝি
আস্‌তে দেরি হবে,
বাকি কাজটা নিজেই কেন
সেরে ফেলিনা তবে।

একটা পোষা বানর ছিল
তাহার দোকান ঘরে,
কাজের সময় আপন কাছে
বসাত আদর ক'রে।

এই ভেবে সে ঘড়িটী লয়ে
সারতে গেল ব'সে
কল্‌গুলি সব ভেঙ্গে ফেলে
ভাব্‌লে মনে শেষে।

সবার কাছে বুদ্ধির আজ্ঞ
দি'নু পরিচয়,
প্রভু এলে পুরস্কারটা
না জানি কি হয়!
অবশেষে একটী লাফে
ঘরটী হল পার,
হরিধনের গলায় দিয়ে
তিনশ টাকার ভার।
অনেক ছেলে এম্‌নি ধারা
বাহাদুরি ক'রে,
পরের কাজটা সহজ বোলে
তাড়াতাড়ি ধরে।
কত টুকু বুদ্ধি নিজের
না ভাবিয়া মনে,
যা বোঝে না তাই করিবে
অশেষ প্রাণপণে।
এসব ছেলের জেঠামিটার
ভাগটা কিছু বেশী,
সকল কাজেই বাহাদুরি
নেবার অভিলাষী।
সাধ্য মত পরের কাজে
বুঝে শুঝে যাবে,
নইলে শেষে হাতে হাতে
উচিত ফলটা পাবে।
আপন কাজে প্রাণের সহিত
নাইক যতন যার,
সে যেন না করে যাহা
পরের অধিকার।
বানর যতই বুদ্ধিমান্
হোক্ না কেন ভাই,
ঘড়ি সারবার বুদ্ধিটা তার
এখনো ঘটে নাই।
তাইতে বলি আপন কাজে
থাক্‌বে সদাই রত,
সাধ্য বুঝে অন্য কাজে
যেও অবসর মত।

হিয়ালি-প্রবন্ধ।

আমরা অনেক ভাই। গণনা করিয়া আমাদের সংখ্যা করিতে পারে এমন লোক নাই। বড় বড় পণ্ডিতেরা আমাদের সংখ্যা করিতে গিয়া সমস্ত জীবন কাটাইয়াছেন, কিন্তু সংখ্যা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তোমাদিগকে বলিব আমরা কত ভাই? না, বলিব না; পারত গণিয়া লও। আমরা সকল ভাই সকল সময় একত্র থাকি। যেখানে "ভাই ভাই সেখানে ঠাই ঠাই" এ কথাটী মানুষেই রচনা করিয়াছে তাহাদের মধ্যেই দেখা গিয়া থাকে। আমরা কিন্তু কথাটার অর্থই বুঝিতে পারি না। ঈশ্বর করেন যেন না বুঝিতেও হয়। আমরা অন্ধকারই ভাল বাসি, অন্ধকারই সৃষ্টির আদি ছিল, আমরা আসিয়াই সেই অন্ধকার তাড়াইয়া দিয়াছিলাম। অন্ধকারের সেই সময়ের ভয়ে ভয়ে পলায়ন দেখিয়া এবং অনুনয় বিনয় বাক্য শুনিয়া আমাদের তাহার উপর বড় দয়া জন্মিয়াছে। তাই আর অন্ধকারের উপর বল প্রকাশ করি না, আঁধার লইয়া আমরা বেশ সুখে আছি। আলো আমরা যে দেখিতে পাই না তাহা নহে,তবে বড় পছন্দ করি না। আমরা কেহ কেহ চাঁদের আলো লইয়া খেলা

করিতে বাহির হইয়া থাকি। সূর্য্যের সঙ্গে আমাদের চির শত্রুতা। যাই সে চোক্ রাঙাইয়া দেখা দেয়, আমরা সকলেই তখন পলায়ন করি। বেটা বড়ই দুর্জ্জন, আমরা তার সঙ্গে বলে পারি না, তা নয়, তবে কিনা কথায় বলে

"অসতে প্রণয় উচিত নয়,
শত্রুতা করাও নহেত নয়।"

কাজ কি বাপু পরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া। ভবে আসিয়াছি আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাইয়া যাইব। পরের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া কেন ভবের জীবন কষ্টকর করিয়া তুলি।

আমরা সকল ভাই হীরের টুকরা। মানুষের মধ্যে শুনিয়াছি বড় বুদ্ধিমান বালককেই হীরের টুকরা বলিয়া থাকে। আমাদিগকেও সকল দেশীয় সকল লোকেই হীরের টুকরা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। তবে কি আমরা বড়ই বুদ্ধিমান।

মানুষে আমাদের নানারকম নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু বাবা আমাদের অন্নপ্রাশনের সময় সকলেরই এক নাম রাখিয়াছিলেন। মেঘের দেখা পাইলে অনেক সময় আমরা খেলা করিয়া থাকি। ছোট জলাশয় আমাদের আরসি তাহাতেই আমরা মুখ দেখিয়া থাকি। কবির কাছে আমাদের খুব প্রতিপত্তি। তাঁহারা কত রকমের কথায় আমাদের গুণের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা জানি আমাদের প্রশংসার কিছুই নাই। সকলের পিতা যিনি আমাদেরও তিনি পিতা; তিনি আমাদিগকে শিশুকালে যাহা যাহা করিতে বলিয়াছেন আমরা তাহাই করি। আমাদের যেখানে রাখেন আমরা সেই থানেই থাকি, মানবের মত তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করিয়া লই না। আমরা পিতার ন্যায় অজর অমর। বলত আমরা কে?

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১ম। জুতা।
২য়। কাগজ।
৩য়। চোরের সিঁদ।

নিম্নলিখিত গ্রাহকগণের তিনটী ধাঁধার উত্তরই ঠিক হইয়াছে।

শ্রীমতী সরোজিনী রায়।
বাবু বিশ্বেশ্বর ঘোষ।
বাবু দেবেন্দ্রনাথ সেন।

নূতন ধাঁধা।

১ম। তিনটী অক্ষরে মম নাম পরিচয়,
আমার দর্শনে হয় দেবতার ভয়।
প্রথম অক্ষর মম যদি ছাড়ি দাও,
সর্ব্বদা নূতন বলি দেখিবারে পাও।
দ্বিতীয় ছাড়িলে হই বনে পরিণত,
তৃতীয় ছাড়লে সুখী হয় দুঃখী যত।
বলহে সুবোধ শিশু আমি কোন জন,
মানবের সহ যুড়ে রাখে কবিগণ।

২য়। খর রবি করে ক্লান্ত পথিক বিধুর,
বায়ু আগে থাকি সবার শ্রম করি দূর।
তিন বর্ণে নাম তাই শুনিতে মধুর॥
প্রথম অক্ষর হীন করিলে আমায়,
সর্ব্ব দ্রব্য নীচে মোরে দেখিবারে পায়।
দ্বিতীয় ছাড়িলে আমি পাষাণ সমান,
প্রকৃতি বলিয়া কেহ করয়ে বাখান।
তৃতীয় যদ্যপি মোর পরিত্যাগ কর।
মম আক্রমণে সবে কাঁপে থর থর।
বিশেষণে নাম মম পাইবে খুঁজিয়া,
কোন জন আমি শিশু দেখহ ভাবিয়া।

সখা।
নবম ভাগ। ৮ম সংখ্যা।

আগষ্ট, ১৮৯১।

বিবিধ।
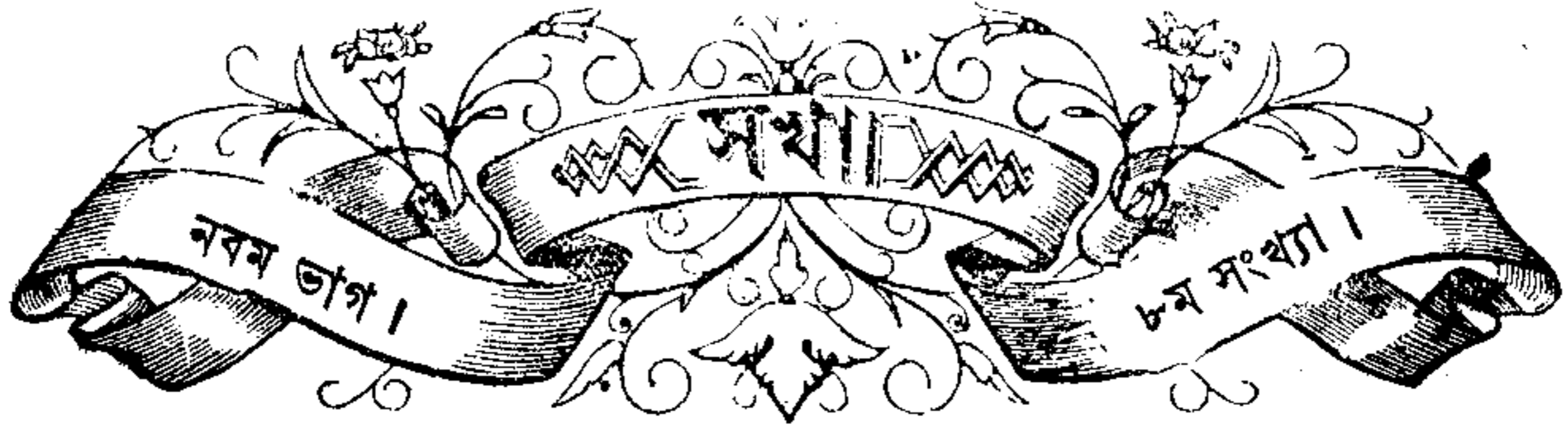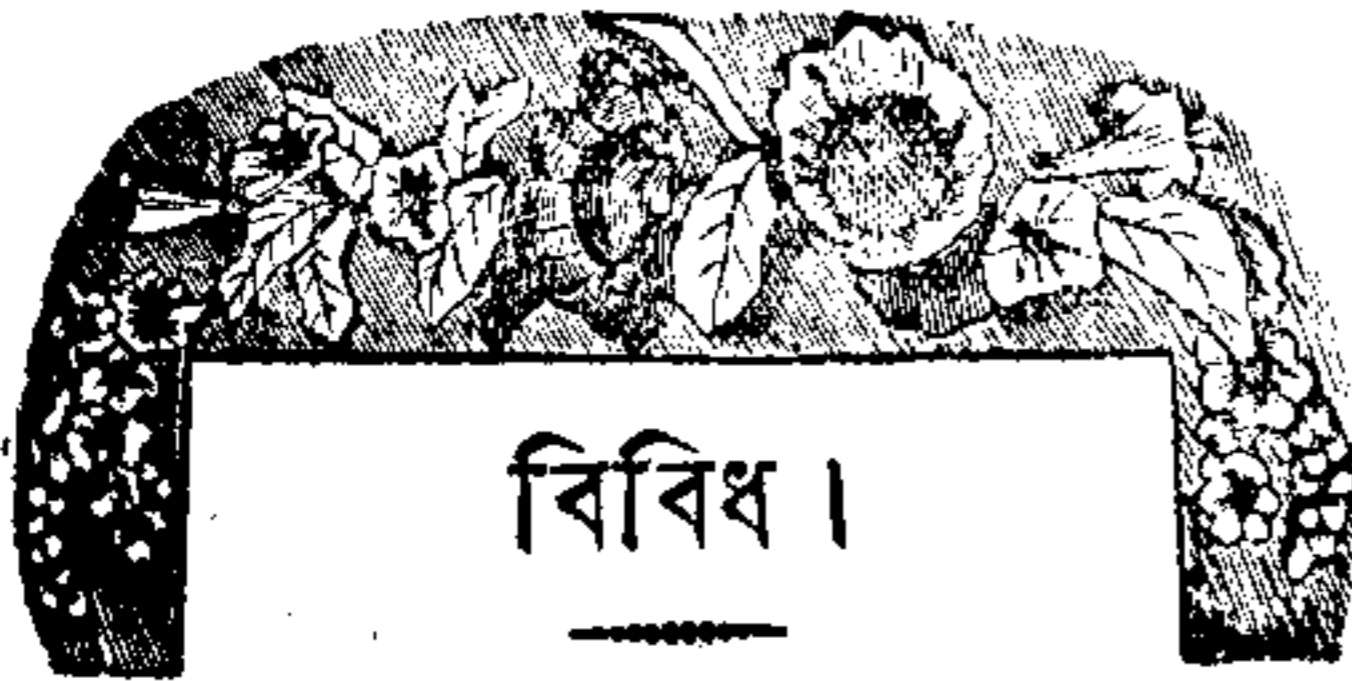
সৎকাজ।—সাঁওতাল পরগণাতে বৈদ্যনাথ নামে একটী স্থান আছে। বৈদ্যনাথ হিন্দুদিগের একটী তীর্থ স্থান,—এখানে "বৈদ্যনাথ" নামক বিগ্রহ স্থাপিত আছে। প্রতিদিন ভারতের নানা স্থান হইতে শত শত যাত্রী "বৈদ্যনাথ' দর্শন করিতে আসিয়া থাকে। বৈদ্যনাথের নিকট ধন্না দিয়া দৈবাদেশে ঔষধ প্রাপ্তির আশায় কত রোগী আগমন করিয়া থাকে, কত গলিত কুষ্ঠরোগী বৈদ্যনাথের আঙ্গিনাতে ধন্না দিয়া পড়িয়া থাকে। অনেক নিরাশ্রয় কুষ্ঠরোগী বার মাস সেখানেই পড়িয়া থাকে—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা তাহাদের উপর দিয়া চলিয়া যায়। মাঘের দারুণ শীত, বৈশাখের প্রখর রৌদ্রোত্তাপ, শ্রাবণের বারিধারা তাহাদের মাথার উপর দিয়া বহিয়া যায়। তাহাদের দুঃখে দুঃখ করিবার কেহ নাই;—গাত্রে বস্ত্র নাই,—লজ্জা ত দূরের কথা, শীত নিবারণ করে। উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ফিরে, পথ চলিতে ক্ষত বহিয়া রক্তধারা প্রবাহিত হয়। লোকে শৃগাল কুকুর অপেক্ষাও তাহাদিগকে ঘৃণা করে,—ভয় পায়; দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়। কাহারও বাড়ীতে তাহাদের আশ্রয় নাই,—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষাতে বৃক্ষ-তল তাহাদের আশ্রয় স্থল। কত কুষ্ঠরোগী এরূপ অনাহারে অনাশ্রয়ে প্রতিবৎসর মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। এরূপ হৃদয়-বিদারক দৃশ্য আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তীর্থ স্থানে আর্ত্তের এরূপ দুঃখ দুর্গতি দূরের প্রতিবিধান না হওয়া, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদের কলঙ্কের কথা। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী কত নর নারী বিদেশীয়, বিজাতীয়, বিধর্ম্মী কুষ্ঠরোগীদের সেবা, শুশ্রূষাতে জীবন মন সমর্পণ করিয়াছেন। অমরাত্মা ফাদার দামিয়ন সর্ব্ব প্রথম এই সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন,—তাঁহার একখানা সুন্দর জীবনচরিত সম্প্রতি বাঙ্গালা ভাষাতে প্রকাশিত হইয়াছে। সে চরিতাখ্যান দেবোপন্যাস বলিয়া মনে হয়। বাবু রাজনারায়ণ বসু, যোগীন্দ্র নাথ বসু ও গিরিজানন্দ দত্তঝার উদ্যোগে বৈদ্যনাথের কুষ্ঠরোগীদের আংশিক দুঃখ ক্লেশ মোচনের উপায় হইয়াছে। তাঁহারা তাহাদের বাস জন্য একটী আশ্রমবাটী নির্ম্মাণের চেষ্টায় অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পঞ্চাশজন রোগীর বাসোপযোগী একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিতে বৈদ্যনাথে দুই হাজার টাকার প্রয়োজন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মাননীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার সেই দুই হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

তাঁহার কেবল একটী সাধ,—তাঁহার স্ত্রীর নামে এই আশ্রমের নামকরণ হইবে। দুঃখী, আর্ত্তের কষ্ট মোচনোদ্দেশে দানইত প্রকৃত দান,—ডাক্তার সরকার অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিলেন। এই গৃহ নির্ম্মাণ হইলে, রোগীদের পানীয় জল, আহার্য্য প্রভৃতির ব্যবস্থা ও গৃহ মেরামত প্রভৃতির জন্য আরও অর্থের প্রয়োজন। তজ্জন্য অন্ততঃ ৩ হাজার টাকার আবশ্যক—এই টাকার সুদ হইতে ঐ সকল খরচ নির্ব্বাহিত হইবে। উদ্যোগকারিগণ এখন সেই অর্থ সংগ্রহে ব্যগ্র হইয়াছেন। আমরা আশা করি, সখার পাঠক পাঠিকাগণ এই মহৎ কার্য্যে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিবেন। যৎ সামান্য দান—এমন কি ছেঁড়া পুরাতন কাপড় পর্য্যন্ত গৃহীত হইয়া থাকে। আমাদের নিকট স্ব স্ব দেয় প্রদান করিলে, আমরা তাহা যথাস্থানে পাঠাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি।

* *
*

চীনদেশে নিষ্ঠুর প্রথা।—ভারতবর্ষে রাজপুতানাতে আগে লোকে বালিকা বধ করিত। বিবাহ দেওয়ার কষ্টেই এই নিষ্ঠুর পাশব হত্যাকাণ্ড হইত,—কন্যা বিবাহের যৌতুক দিতে যাইয়া লোকে সর্ব্বস্বান্ত হইত, অবিবাহিত বয়স্কা-কন্যা ঘরে রাখা হিন্দুর ঘোর কলঙ্কের কথা; তাই পিতা মাতা অবশেষে এরূপ অমানুষিক, অস্বাভাবিক উপায়ের আশ্রয় লইয়াছিল! ইংরাজ এদেশের রাজা হওয়ার পর, এই নিষ্ঠুর প্রথা রহিত হইয়াছে। তজ্জন্য রাজ পুরুষদিগকে অনেক আয়াস পাইতে হইয়াছে।

রাজপুতনার ন্যায় চীনদেশেও এরূপ বালিকা বধ প্রচলিত আছে। দেশের অভ্যন্তর প্রদেশে প্রায় প্রতি নগরে, জনপদে এক একটা প্রস্তর নির্ম্মিত উচ্চ স্তম্ভ আছে। স্তম্ভের মধ্যভাগে একটা ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্র দিয়া নবজাত কন্যা সন্তানদিগকে অন্ধকার স্তম্ভের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। সেখানে তাহারা পতনের আঘাতে ও অনাহারে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। যে সকল স্থানের নিকটে এরূপ স্তম্ভ নাই, তথাকার পিতামাতারা নবজাত কন্যাদিগকে কাগজে মুড়িয়া জলস্রোতের নিকট রাখিয়া দেয়, কিংবা মৃত্তিকাতলে পুতিয়া রাখে। চীন দেশের এই নিষ্ঠুর প্রথাতে প্রতিবৎসর ২ লক্ষ বালিকা বধ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে যেরূপ ইংরেজের পদার্পণে এই পাশব প্রথা রহিত হইয়াছে, চীনেও ইউরোপীয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মহিলাদের যত্নে কত বালিকা প্রাণ পাইতেছে। তাঁহারা এই সকল অনাথ, পরিত্যক্ত বালিকাদের জন্য স্থানে স্থানে আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন,—সেই সকল আশ্রমে তাহাদিগকে আনিয়া লালনপালন করিয়া থাকেন। বিগত ২৩ বৎসর মধ্যে এই করুণ-হৃদয় সদাশয় মহিলারা প্রায় ৪০ হাজার বালিকার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন,—কত বালিকা আজ সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছে। কবে এই নিষ্ঠুর প্রথা চীনদেশ হইতে উঠিয়া যাইবে?

* *
*

অদ্ভুত যন্ত্র!—মার্কিন বৈজ্ঞানিক এডিসন সাহেবের নাম তোমরা শুনিয়াছ। তিনি যে "ফনোগ্রাফ" নামে এক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার দ্বারা একজনের গান অন্যত্র লইয়া যাওয়া যায়, অবিকল সেই গান আবার লোককে শুনান যায়, তাহা তোমরা জান। তারপর তিনি আর এক যন্ত্র অবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার সহযোগে ঘরে বসিয়া দূরবর্ত্তী নাট্যশালার চিত্র দর্শন করা

যাইতে পারে। তাহার কথাও তোমাদিগকে বলা হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি আর এক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার বলে বক্তৃতা করা যায়। তোমার যদি কোথাও বক্তৃতা করার কথা থাকে, আর তুমি সে দিন স্থানান্তরে চলিয়া যাইতে বাধ্য হও, তবে সেই যন্ত্রে তোমার ব্যক্তব্য বলিয়া রাখিয়া গেলে, যন্ত্রটী বক্তৃতা স্থানে লইয়া কল টিপিয়া দিলে অবিকল তোমার কথিত স্বরে বক্তৃতা হইতে থাকিবে। ধর্ম্মযাজকদিগের জন্য এই যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। বিজ্ঞান-বলে আর কত অদ্ভুত কৌশল আবিস্কৃত হইবে, কে বলিতে পারে ?

দারজিলিং প্রবাসীর পত্র।

দারজিলিং গিয়াছিলাম, এখন দেশে আসিয়া গল্প ফাঁদিতেছি,শ্রোতা পাইলেই হয়।

প্রথমেই একটা কথা মনে হয়, পথে বড় কষ্ট পাইয়াছি। দামুকদিয়া পর্য্যন্ত ভালই গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া আমাদিগকে একটা চড়ার মাঝখানে ছাড়িয়া দিল। সবাই একদিকপানে ব্যস্ত হইয়া চলিল, আমরাও সেইদিকে চলিলাম। দেখিলাম পারের জাহাজ লঙ্কা পুরীর ন্যায় নদীর মাঝখানে বিরাজ করিতেছেন; তথায় যাইবার জন্য হনুমান সেতু বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

আকাশের কোণে একটী কালো মেঘ সন্ধ্যাবধি দাঁত খিচাইতেছিলেন। তিনি এখন জিব বাহির করিয়া হুংকার ছাড়িয়া আসরে নামিলেন। সারায় পৌছাইতে দুর্দ্দশার একশেষ হইল; গায় দু আঙুল শুকনো চামড়া রহিল না

গাড়িতে উঠিয়াই দেখিলাম তাহার ভিতর বাহির সমান হইয়া রহিয়াছে। ইহার উপর আবার গাড়ী গুলি এত নড়িতে পারে। আমাদের মাথার ঘি গলিয়া যায় নাই, তা ছাড়া আর সব হইয়াছিল।

শিলিগুড়িতে নামিয়া আবার গড়ী বদলাইতে হইবে। গাড়ীগুলি দেখিয়া হাসি পাইতে লাগিল। গাড়ী ত নয়, যেন খান কতক পালকীতে চাকা পরাইয়া লইয়াছে। ইহারই ভিতরে কয়েকটা শরীরকে গুছাইয়া রাখিতে হইল। কিছুকাল পরে গাড়ী চলিতে লাগিল। প্রথমে কতক দূর সমান জমির উপর দিয়া যাওয়া গেল, দুধারে চা বাগান, লম্বা লম্বা ঘাস, আর ছোট ছোট ঝোপ। একটা ষ্টেশন ছাড়াইয়া ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিতে লাগিল। দুধারে বড় বড় গাছ দেখা দিল।

শিলিগুড়ি হইতেই পাহাড় দেখা যাইতেছিল। এখন বুঝাগেল যে, তাহাতে উঠিতেছি। কিছুদূর যাইয়াই দেখা গেল, "হাজার ফুট উচ্চ" লেখা রহিয়াছে। ডাইনে পাহাড়ের গা দেয়ালের মতন হইয়া উঠিয়াছে, বাঁয়ে চাহিয়া দেখি কূল কিনারা নাই। গড়াইলে কোথায় যে কে থামিব, তাহার ঠিক নাই। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এক একটা গাছ হাড়গিলার মতন দাঁড়াইয়া আছে। গোড়া হইতে ষাট সত্তর হাত পর্য্যন্ত ডাল পালা নাই।

এই সময়ে হঠাৎ দেখা গেল, অনেকটা উপরে আসিয়াছি। অনেক নীচে উপত্যকায় চা বাগান। চারিধারে পাহাড় ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। একদিকে একটু ফাঁক; তাহার ভিতর দিয়া ৫০। ৬০ মাইল পর্য্যন্ত সমান জমি দেখাযায়। শিলিগুড়ি ষ্টেশনটী একটী শাদা বিন্দু! রেলের লাইনটী একটী আঁচড়ের মতন। একটী নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া সেই

কোথায় চলিয়া গিয়াছে। মেঘগুলি যেন সেই মাঠের উপর চরিয়া বেড়াইতেছে। মাঝে মাঝে দু একটী ঝরণা দেখা যাইতে লাগিল। গ্রীষ্মকাল বলিয়া এই সকল ঝরণায় বেশী জল দেখা গেল না; দু এক ফোঁটা জল যাহা আছে, পাছে তাহা ভূতের দৃষ্টিতে পড়ে, তাই পাহাড়ী দৈবজ্ঞেরা সেখানে ন্যাকড়ার নিশান টাঙ্গাইয়াছে।

চা বাগানের অন্ত নাই। যে দিকে চাই, কেবলই চা বাগান। মাঝে মাঝে ভুট্টার চাষও আছে।

কার্শিয়ং ষ্টেশন ছাড়াইলে আর মাঠের দৃশ্য দেখা যায় না। কার্শিয়ং হইতে মেচি নদী খুব পরিস্কার দেখা যায়।

দারজিলিং পৌঁছাইতে বেলা গেল। তিন চারি মাইল দূর হইতেই হঠাৎ সহরটী দেখা গেল। দূর হইতে বোধ হইল যেন ময়রার দোকান খুলিয়াছে। বাড়ী গুলি দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন সন্দেশ বরফির থালা সাজাইয়া রাখিয়াছে। এখন বেশ শীতবোধ হইতেছে। শীত কালেও আমাদের ওদিকে এর চাইতে বেশী শীত হয় না। এখানে মেঘের মেঘত্ব নাই। কত মেঘের ভিতর দিয়া চলিয়া যাই, হাজার ফুট নীচে হইতে কত মেঘ হামাগুড়ি দিয়া উঠিতে চেষ্টা করে। দূর হইতে যাকে মেঘ বলিয়া বোধ হয়, কাছে আসিলে সে কোয়াসা হইয়া যায়। এই সকল দেখিতে দেখিতে ষ্টেশনে আসিলাম।

প্রথম দেখিবার জিনিশ দারজিলিঙ্গের মুটে। আবালবৃদ্ধবনিতা সকল রকমের মুটেই আছে। তাহারা জিনিশ ধরিয়া টানাটানি করে, কিচির মিচির করিয়া কথা কয় আর ফিক ফিক করিয়া হাসে। সকলের সঙ্গেই একগাছা দড়ি, আর মাছ ধরিবার পলো চেপ্টা হইয়া গেলে যেমন দেখিতে হয় তেমনি একটা জিনিশ। জিনিশ ছোট ছোট অনেকগুলি হইলে ঐ পলোর ভিতর করিয়া লইয়া যায়। বড় জিনিস হইলে দড়িগাছির দরকার হয়। প্রথমে জিনিসটাতে ঠেসান দিয়া বসা হয়। তার পর দড়িগাছি দ্বারা সেই জিনিসটাকে মাথার সঙ্গে পৃষ্ঠদেশে দোলান হয়। তারপর সেই জিনিসটাকে পিঠে লইয়া হামাগুড়ি দেওয়া হয়। সর্ব্বশেষে দুই হাতের অতিশয় আনুকূল্যে দুই পায়ের উপর দাঁড়ান হয়। ছোট ছোট মেয়ে দিগকে এইরূপ করিয়া এমন জিনিস লইয়া পাহাড়ে উঠিতে দেখিয়াছি, যে সেটাকে আমার পিঠে চাপাইয়া দিলে কার নাম ধরিয়া ডাকিতাম বলিতে পারি না।

ক্রমশঃ।

৺ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

এবার ভারতের বড়ই দুর্ব্বৎসর। একে একে এবার ভারত-আকাশ হইতে কয়েকটী উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। কিছু দিন হইল আমরা সখার পাঠক পাঠিকাগণকে স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা স্যার টি মাধব রাওর মৃত্যু সংবাদ জানাইয়াছি। ভারতবাসীর সে শোক ভালরূপ নিবারণ হইতে না হইতে মহাত্মা রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর আমাদিগকে পুনরায় গভীর শোক-সাগরে ভাসাইয়া পুণ্যধামে গমন করিলেন। বিশ্ব-জননী তাঁহার এই সু-সন্তানগণকে কোলে ফিরাইয়া লইয়া সুখী

হইতেছেন। আশা করি আজ, এই পরম বন্ধুদ্বয় বিয়োগ-জনিত গভীর শোকে ভারতবাসীর সন্তপ্ত হৃদয়ে তিনিই সান্ত্বনা দিবেন। পরম শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী ইতিপূর্ব্বেই আমরা আমাদের পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিয়াছি। আজ শুধু মহাত্মা রাজা রাজেন্দ্র লালের জীবন সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিব।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজেন্দ্রলাল কলিকাতার নিকটস্থ শুড়োঁ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জন্মেজয় মিত্র। রাজেন্দ্রলালের প্রপিতামহ রাজা পীতাম্বর মিত্র দিল্লীর বাদসাহের একজন প্রধান সভাসদ্ ছিলেন, এবং তথায় তাঁহার খ্যাতি ও গুণগ্রামের জন্য বাদসাহের নিকট হইতে বংশানুক্রমে স্থায়ী রাজা

উপাধি ও খুব বড় জমিদারী লাভ করিয়াছিলেন। পিতা জন্মেজয় মিত্রও একজন খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ও পার্সীতে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। কলিকাতার লোকে রাজেন্দ্রলালের পিতাকেও রাজা জন্মেজয় মিত্র বলিয়া ডাকিত। পাঁচ বৎসরের সময় রাজেন্দ্রলাল প্রথমতঃ নিজ বাটীতে বাঙ্গালা ও পার্সী পড়িতে আরম্ভ করেন। তৎপর কিছুদিন রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের বাড়ীতে গুরুমহাশয়ের পাঠশালাতে বাঙ্গালা পড়েন। তাঁহার বয়স যখন ৮।৯ বৎসর, তখন তিনি প্রথম ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করেন। সে সময়ে ক্ষেম বসুর স্কুল এবং গোবিন্দ বসাকের স্কুল দুইটী প্রধান ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল। এই দুই স্কুলেই তিনি ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। রাজা দুর্গাচরণ লাহা তাঁহার সমপাঠী। ছেলে বেলায়ই রাজেন্দ্রলালের অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধি দেখিয়া লোকে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, কালে ইনি একজন বড় লোক হইবেন। তাঁহার সমপাঠীরা সহজেই তাঁহার বুদ্ধির কাছে হারমানিয়া তাঁহাকে প্রাধান্য দিতেন।

১৬ বৎসরের সময় রাজেন্দ্রলাল মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী শিখিবার জন্য ভর্ত্তি হন। এই কলেজের সমস্ত পুরস্কার ও পারিতোষিক রাজেন্দ্রলাল অতিশয় সুখ্যাতির সহিত লাভ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে রাজা জন্মেজয় পুত্রের ইংরাজী শিক্ষাও যাহাতে সুন্দররূপ চলে সেই জন্য কেমেরণ নামক একজন ইংরাজকে রাজেন্দ্রলালের শিক্ষার্থে নিযুক্ত করিলেন। কেমেরণ সাহেবের নিকটই রাজেন্দ্রলাল এমন সুন্দর ইংরাজী লিখিতে ও কহিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষা এমন তেজস্বী ও প্রাঞ্জল ছিল যে, খুব বড় বড় ইংরাজগণ পর্য্যন্তও তাঁহার লেখার মোহিনীশক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। মেডিকেল কলেজে তিনি অধিক দিন পড়িতে পারিলেন না। নানা ঘটনায় তাঁহার ডাক্তারী পড়া বন্ধ হইল। শ্রীযুক্ত দ্বারকা নাথ ঠাকুর বিলাত গমন কালে রাজেন্দ্রলালকে সঙ্গে নিতে চাহিয়াছিলেন। বিলাত গিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্র অনেক ভাল শিখিতে পারিবেন এবং তথায় আরও অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন, এই মনে করিয়া রাজেন্দ্রলালও শ্রীযুক্ত দ্বারকা নাথ ঠাকুরের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু জাতিনাশের ভয়ে তাঁহার পিতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন ঐ প্রস্তাবে ভয়ানক আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাঁহার বিলাত গমন রহিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের মেডিকেল কলেজের পড়াও বন্ধ হইল।

ইহার পর রাজেন্দ্রলাল আইন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। আইন অধ্যয়নের সময় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার আরও অধিক বিকাশ হইল। তিনি ওকালতী পরীক্ষায় অতিশয় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে প্রকাশ পাইল যে, পরীক্ষার প্রশ্ন পূর্ব্বে চুরি গিয়াছে; সুতরাং সে পরীক্ষার ফল অগ্রাহ্য হইল। পুনরায় পরীক্ষার বন্দোবস্ত হইল। রাজেন্দ্রলাল নিতান্ত বিরক্ত হইয়া আর পরীক্ষা দিলেন না।

অতঃপর রাজেন্দ্রলাল এখন নানা ভাষাশিক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্র ও আইন অধ্যয়ন এখন তাঁহার অত্যন্ত উপকারে আসিতে লাগিল। পাঁচ বৎসর কাল সংস্কৃত, পার্সী, হিন্দী, ও উর্দ্দু ভাষা তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিলেন। মেডিকেল কলেজে পড়িবার সময় ফরাসী, লাটিন ও গ্রীক ভাষায় লিখিত চিকিৎসা শাস্ত্রগুলি পাঠ করিবার জন্য ঐ সমস্ত ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। এখন তিনি পাঁচ বৎসর বেশ উৎসাহ ও মনোযোগের সহিত পাঠ

করিয়া লাটিন, গ্রীক, ফরাসী, সংস্কৃত, পার্সী, হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির কথা সর্ব্বস্থানে রাষ্ট্র হইল।

১৮৪৬ সালের নভেম্বর মাসে ২৩ বৎসর বয়সের সময় তিনি "এসিয়াটিক সোসাইটীর" সহকারী সম্পাদক ও লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হইলেন। এখানে তিনি নানা দুর্লভ পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া আরও অধিক জ্ঞান উপার্জ্জনে সক্ষম হইতে লাগিলেন, এবং এখন হইতেই তিনি প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্যায় বিশেষ অনুরাগী হইয়া দাঁড়াইলেন। এসিয়াটিক সোসাইটীর সংবাদ পত্রে নানা প্রকার পুরাতত্ত্ব তিনি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" নামক একখানি পত্রিকা তিনি ১৮৫১ সনে বাহির করিয়া ৮।৯ বৎসর কাল দক্ষতার সহিত চালান। ঐ পত্র বন্ধ হওয়ার পর "রহস্য-সন্দর্ভ" নামক আর একখানি পত্রিকা বাহির করিয়া পাঁচ বৎসর কাল চালাইয়াছিলেন। এই সময়েই তাঁহার জীবনের কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

১৮৫৬ সালে রাজেন্দ্রলাল নাবালক জমিদার পুত্রগণের ডিরেক্টার নিযুক্ত হয়েন। ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউসন্ যতদিন ছিল, তিনিই বরাবর ঐ ডিরেক্টারের কার্য্য করিয়াছেন। ১৮৭৭ সনে রাজেন্দ্রলাল "রায়বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং তারপর কিছুকালের মধ্যেই গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি, আই, ই ও রাজা উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। ১৮৭৬ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইঁহাকে এল, এল, ডি উপাধি প্রদান করা হয়।

রাজা রাজেন্দ্রলাল প্রণীত অনেক প্রসিদ্ধ পুস্তক আছে। ১৮৭৫ সনে উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া তিনি তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার ভাষা ও গবেষণা দেখিয়া জগতের পণ্ডিত সমাজ মুগ্ধ হইয়াছেন। ইহা ভিন্ন "বুদ্ধ-গয়া" "ললিত বিস্তর", "পাতঞ্জলী যোগসূত্র" প্রভৃতি গ্রন্থেও তাঁহার অসীম ধীশক্তি ও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া ইংলণ্ড, অষ্ট্রীয়া, ইটালী, জর্ম্মণী, আমেরিকা, হঙ্গেরী, ডেনমার্ক প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিত-মণ্ডলী তাঁহাকে তাঁহাদের সভার সভ্যশ্রেণী ভুক্ত করিয়া গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন। রাজা এমনই প্রতিভা-সম্পন্ন লোক ছিলেন বটে।

রাজা রাজেন্দ্রলাল শুধু অধ্যয়ন ও প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রণয়নেই জীবন কাটান নাই। তিনি দেশহিতকর সমস্ত বিষয়েই অতিশয় আগ্রহের সহিত যোগদান করিতেন। বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার জমিদারগণের প্রধান সভা "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের" তিনি সভাপতি ছিলেন। জমিদারগণ অনেক সময় তাঁহারই কথায় পরিচালিত হইতেন। তিনি অত্যন্ত নির্ভীক পুরুষ ছিলেন। জমিদারগণ যখন গভর্ণমেণ্টের ভয়ে জাতীয় মহাসম্মিলনীতে (কংগ্রেসে) যোগদান করিতে ভীত হইয়াছিলেন, তখন রাজা রাজেন্দ্রলাল প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেস সভায় যোগ দিয়া তাঁহার ভীরু ভাইগণকে লজ্জা দিয়াছিলেন এবং জমিদারগণকে কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কলিকাতায় যেবার প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, রাজা রাজেন্দ্রলাল অভ্যর্থনা কমিটীর সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি যখন কলিকাতার মিউনিসিপাল কমিসনার ছিলেন, সহকারী কর্ম্মচারিগণ তাঁহার ভয়ে তটস্থ থাকিতেন। দোষ দেখিলে তিনি কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহিতেন না। তীব্র ভাষায় যখন তিনি দুষ্কর্ম্মকারীদের অত্যাচার বর্ণনা করিতেন

তখন তাহাদের প্রাণ শুকাইয়া যাইত। স্বাধীনতা এবং নির্ভীকতা কাহাকে বলে, তাহা রাজা রাজেন্দ্রলালের নিকটেই দেখা যাইত। তাঁহার প্রতাপে রাজপুরুষেরা সর্ব্বদা কম্পান্বিত থাকিতেন। তিনি বলিতেন, "ঈশ্বরের জগতে খাটিয়া খাইলে কাহারও ক্লেশ পাইতে হয় না; বিশাল কার্য্যক্ষেত্র সম্মুখে বিস্তৃত—এ শরীর থাকিতে কিসের ভয়?"

একদিকে তিনি এমন প্রতাপান্বিত ছিলেন; কিন্তু বৃদ্ধ-বয়সেও তাঁহার বালকত্ব ঘুচিয়াছিল না। বালকের ন্যায় তাঁহার ব্যবহার ছিল; বালকের মত তিনি খেলা করিতেন; এবং বালকের মত তিনি হাসি-খুসি ছিলেন। বালকদের সঙ্গে মিসিয়া তিনি বৃদ্ধ বয়সেও দৌড়াইতেন, লাফাইতেন, হাসি তামাসা ইত্যাদি সবই করিতেন। তিনি অতি সুরসিক পুরুষ ছিলেন; এবং স্বভাবতঃই অত্যন্ত দয়ার্দ্র-চিত্ত ছিলেন। বন্ধুবর্গ তাঁহার স্নেহ-ব্যবহারে মোহিত হইতেন; এবং একবার তাঁহার সঙ্গে যাঁহার আলাপ হইত, তিনি আর রাজাকে ভুলিতে পারিতেন না। কয়েক বৎসর হইল বৈদ্যনাথ অবস্থান কালে তিনি সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়েন। এই সময়ে তাঁহার শরীর অবশ হইয়া পড়ে। তিনি স্বভাবতঃ কাণে কম শুনিতেন, এবং এখন অবসাঙ্গ হইয়া বড় জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িলেন। ইদানীং অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি অত্যন্ত ব্যারামে ভুগিতে ছিলেন। চিকিৎসকগণ তাঁহার আরোগ্যের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; এবং বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহার শেষ সময়ের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। গত ১১ই শ্রাবণ রবিবার রাত্রি ১০ টার সময় তিনি সকলকে গভীর শোক-সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন—হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালায় রাজা রাজেন্দ্রলালের মত মনস্বী, তেজস্বী ও স্বাধীন প্রকৃতির লোক অতি বিরল। তাঁহার স্থানাবে আর শীঘ্র কেহ অধিকার করিতে পারিবে, এরূপ বোধ হয় না। তাই আজ তাঁহার শোকে অসংখ্য প্রাণী কাঁদিতেছে। তিনি সুদীর্ঘ ও বলিষ্ঠকায় পুরুষ ছিলেন। কলিকাতার সাধারণ লোকের নিকট তিনি "লালা মিত্র" নামে পরিচিত ছিলেন। ৬০ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আশাকরি, জগজ্জননীর ক্রোড়ে স্থানলাভ করিয়া তাঁহার আত্মা সুখী হইয়াছে।

বিধিলিপি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মায়ে ঝিয়ে।

(৮৮ পৃষ্ঠার পর।)

জননীর মুখে কিংশুক বিনিস্থত বাক্য শ্রবণ করিয়া, সুখদা ক্ষণকাল দিশাহারার ন্যায় হইয়া পড়িলেন। স্বপ্নে যেমন ভয় পাইলে কথা বাহির হয় না, সেইরূপ কথা কহিতে গিয়া তাঁহার বাক্য নিস্থত হইল না। তথা হইতে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন, তাহাও সপ্নে বা জলে দৌড়ানের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এই দুই অধ্যবসায়ের কোনটীতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, সেইখানে সেই স্যাঁৎ সেঁতে ভিজে মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন। বাস্তবিক হঠাৎ সুখদা বেহুঁস হইয়া বসিয়া পড়িলেন, এবং মুহূর্ত্ত পরেই সেইস্থানে শয়ন করি-

লেন। জননী তদ্দর্শনে ভয় পাইয়া "কি হলো, কি হলো" বলিয়া উঠিলেন এবং নিকটস্থ লোকদিগকে একটা প্রদীপ আনয়ন করিতে বলিলেন। প্রদীপ আসিলে দেখেন, সুখদার চক্ষের তারা স্থির হইয়াছে ও কপালে উঠিয়াছে, ওষ্ঠাধরে কালিমা পড়িয়াছে। তখন উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া বলিলেন, "কে কোথায় আছ, শিগ্‌গির এস, আমার সুখদা বুঝি আমায় ফাঁকি দিল।" এই রোদন শুনিয়া যে। যেখানে ছিল, দৌড়িয়া আসিল। দেখিল, যথার্থই সুখদা বেহুঁস হইয়াছে। রায় মহাশয় নাড়ি দেখিতে গেলেন, কিন্তু নাড়ি পাইলেন না। তখন কাহাকে কিছু না বলিয়া দ্রুতবেগে ভগবান চন্দ্র সেন কবিরাজের বাটী গমন করিলেন। কিন্তু কবিরাজ না আসিতে আসিতেই সুখদার জ্ঞানলাভ হইল। সকলে বেহুঁসের কারণ জিজ্ঞাসা করায় কহিল, 'ঘুমভেঙ্গে খাবু মাবু খেয়ে এসে হঠাৎ তার মাথা ঘুরে যাওয়ায় সে পড়িয়া গিয়াছিল, এতদূর মাত্র তাঁহার মনে আছে। আর কিছুই মনে নাই। তখন সে নিজ পক্ষ হইতে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তাহারা এত লোক কেন, কেই বা তাহাদিগকে ডাকিয়াছে, ইত্যাদি। উত্তরে জানিতে পারিল, সে ৪।৫ মিনিট পর্য্যন্ত বেহুস হইয়াছিল। তখন তাঁহার বেহুসের কারণ স্মরণ হওয়ায় লজ্জাবনত মস্তকে কহিল "আমি এখন ভাল হয়েছি, তোমরা যাও, আমি একটু শুই গিয়ে।" এই বলিয়া সুখদা নিজ শয়নাগারে গমন করিল, আর আর সমবেত ব্যক্তিগণ যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে লোকের আশার বিপরীত ফল প্রদর্শন পূর্ব্বক সুখদা সহাস্য বদনে শয্যা ত্যাগ করিয়া পরিবারস্থ অন্যান্য সকলের নিকট গিয়া বসিল। এবং তাহার নির্দ্দিষ্ট যে যে কার্য্য ছিল, সমস্তই সেই ভাবে সম্পন্ন করিল। মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাধান্তে জামাতা আপনার স্ত্রী সহ নৌকাযোগে স্বদেশ গমনের জন্য যাত্রা করিলেন। রায় গৃহিণী যতটুকু এবং যতক্ষণ দরকার চক্ষের জল ফেলিলেন। না ফেলিলে লোকে কি বলিবে? বিশেষ চক্ষের জল ফেলিতে কোন ব্যয় নাই, তবে যদি ফেলিলে দশ জন ভাল বলে, তবে কেন না ফেলিবে। প্রথমে আরম্ভ করিবার সময় কিছু কষ্টবোধ হয় বটে, কারণ আহ্লাদের সময় রোদন আইসে না, কিন্তু রগড়াইতে রগড়াইতে শুষ্ক চক্ষু হইতেও জল বাহির করা যায়। এস্থানে একথা বলিবার প্রয়োজন এই যে, রায়-গৃহিণী কন্যা ও জামাতা গিয়াছে বলিয়া খুসি ভিন্ন দুঃখিত নহেন। আরও অধিক দিবস থাকিলে জামাতা যাহা খরিদ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজে ও তাঁহার স্ত্রী প্রায় সমস্ত নিঃশেষিত করিয়া যাইতেন। কিন্তু তাঁহারা চলিয়া গেলেন, সুতরাং আর সে ভয় রহিল না। এটা সুখের বিষয় হইল এবং এই জন্যই চক্ষের জল বাহির করিতে কষ্ট হইয়াছিল।

অনেক দিবসের পর অদ্য সূর্য্যদেব দল বল সহ আকাশে উঠিয়াছেন। বোধ হইল এই বিজ্ঞাপন করিবার জন্য যে, তাঁহার দিবাভাগের রাজ্য হইতে অদ্যাপিও তিনি বিচ্যুত হন নাই। কতকটা সেই কারণে আর কতকটা বোধ হয় ক্ষতি পূরণার্থ অদ্য এরূপ প্রখর করজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন যে, বোধ হইল যেন অদ্যই তিনি পৃথিবীকে ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলিবেন। রৌদ্র দেখিয়া পুরুষেরা হতাস হইল। তাহাদিগকে যে যাহার কার্য্যে যাইতে হইবেই হইবে; স্ত্রীলোকদিগের আর আনন্দের সীমা রহিল না। এত কালের পর বিছানা, বালিস, কাপড়, চোপড়, এবং যদিও শেষে বলিতেছি কিন্তু সর্ব্বাগ্রে বলিবার কথা বটে, তাহাদিগের মস্তকের

কেশভার শুষ্ক হইবেক। জামাতা নিজ স্ত্রী লইয়া তিন দিবস গিয়াছেন মাত্র। জননীর চক্ষের জল গমনের পরক্ষণেই শুকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তথাপি দুই চারি দিবস দর্শনেন্দ্রিয় আর্দ্র রাখিলে লোকে ভাল বলিবে মনে করিয়া মাঝে মাঝে পাড়ার লোক জন আসিলে এক এক বার তাহাদিগকে রগড়াইয়া জল বাহির করিতেন। অদ্য বোধহয় সূর্য্যের প্রতাপে তাঁহার চক্ষুও শুকাইয়া গেল। তিনি লেপ, কাঁতা, ধুতি, শাড়ী ইত্যাদি বাহিরে রৌদ্রে দিয়া বসিয়া প্রাণগোপালের মাথার উকুন বাছিতেছেন। প্রাণগোপালের মাথা একটী চিরিয়াখানা বলিলে হয়। নানা জাতীয়, নানা রঙ্গের, নানা বয়সের জন্তুগণ তথায় নির্ভয় চিত্তে দিবা রাত্র ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়। জননী তাহাদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া একটী একটী শত্রু সংহার করিতেছেন আর একটী একটী হুহুংকার ছাড়িতেছেন। এমন সময় সুখদা তথায় গিয়া মাতার সহিত যোগ দিল। মাতা মস্তকের সম্মুখবাসীদিগকে আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন, কন্যা পশ্চাদ্ভাগে আক্রমণ অরম্ভ করিল। "কত যে মরিল অরি কে পারে কহিতে।"

উভয়ে সমররঙ্গে মাতিয়াছেন, এমন সময় সুখদা জিজ্ঞাসিল, "মা একটা কথা বলি, যদি রাগ না কর।"

জননী। "সাট্ তোমার কথায় রাগ? বল না, যা ইচ্ছা হয় বল।"

সুখদা। "এতকাল শুনেছিলাম আমার এই গাঁয়েই বিয়ে হবে, তবে এখন আবার অন্য জায়গায় পত্র হলো কেন? গ্রামে বিয়ে হলে আর কারু কিছু হোক আর না হোক তোমাকে তো আর এত কাঁদ্‌তে হতো না।"

জননী। "সে আমার অদেষ্ট আর বিধির লেখন। আমার অদেষ্টে যদি সুখ থাকতো তা হলে গাঁয়ে বিয়ে হতো, কিন্তু বিধাতা আমাকে চকের জল ফেলতে পাঠায়েছেন, আমি না ফেলে কি থাকতে পারি?"

সুখ। "গাঁয়ে বিয়ে দিতে কে বারণ করে-ছিল?"

জননী। "কেও না বাছা। একমাত্র প্রজা-পতিরই কাণ্ড। যে যার হাড়িতে চাল দিয়েছে, সে সেই ঘরেই যাবে! তার কি আর অন্য ঘরে যাবার যো আছে?"

সুখ। "কিন্তু আমার বড় ইচ্ছা করে, যাতে তোমাদের কাছে থাক্‌তে পারি। আমি অতি বড় দুঃখীর ঘরে গেলেও তোমাদের দেখ্‌তে পেলে আমার কোন দুঃখ থাকে না।"

জননী। "কিন্তু বাছা আমাদের যে তাতে দুঃখ হয়। আর পাঁচ জনে কত গয়না পরে আস্‌বে, আর তোমার কিছু থাক্‌বে না?

সুখ। "আমি তো বলেছি, তোমাদের দেখ্‌তে পেলে আমার আর কোন দুঃখ থাক্‌বে না।"

জননী। "বাছা ওসব ছেলে মানুষের কথা, বড় হলে ওসব কথা আর বল্‌বে না। বিশেষ কর্ত্তাকে বল্‌তে শোননি, ১০০ পুত্র আর এক কন্যা সমান, যদি ভাল পাত্রের হাতে পড়ে?"

সুখদা। "বুঝিলাম। বুঝিলাম। আর কথায় কাজ নাই। বাপ মা সকলদিক না ভেবে কোন কাজ কর্ম্ম করেন না।"

জননী। "তা বুঝবেনা কেন? তুমি তো আর অবুঝ নও। তোমাদের যাতে ভাল হয়, তাই ভাবৃতে ভাবৃতে আমাদের দিন যায়। এই ঝড় বৃষ্টি হোক, ব্যামো পীড়ে হোক, তবু আমি শিব পূজা না করে কি জল খাই? আর তোমাদের কল্যাণে কর্ত্তা দিন রাত ইষ্টি দেবতার নাম জপ কর্‌ছেন। এ সব তো তোমরা দেখ্‌তে পাচ্ছ?"

সুখদা। "হা, হা" এই বলিয়া কোন না কোন একটা কার্য্যের ভাণ করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ—

(প্রাপ্ত)

শোক-সঙ্গীত।

(পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুপলক্ষে)

(১)

অকস্মাৎ ওই ভারত গগন
কাল মেঘে হায় হ'ল আবরিত ;
হাহাকার করে নর নারীগণ,
বক্ষ বহে অশ্রু পড়ে নিয়ত !

(২)

সকলেরই মুখে "হায় হায় হায়
কোথা চলে গেলে হে বিদ্যাসাগর ?"
সকলেই যেন সেই মুখ চায়,
সকলেরই প্রাণ যেন রে কাতর।

(৩)

কাঁদে ঘর দ্বার, কাঁদে বৃক্ষলতা,
বারিধারাচ্ছলে কাঁদেরে আকাশ ;
দিগন্তর যেন শুনি সে বারতা,
সমীরণচ্ছলে ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস।

(৪)

কোথা গেলে দেব কাঁদায়ে সকলে,
কোথা গেলে দেব ছাড়িয়ে জগৎ ?
আর কি তোমাকে এজগতীতলে,
পাইবে হে কেহ খুঁজিলে নিয়ত ?

(৫)

ওই দেখ চেয়ে তোমার (ই) দুয়ারে
কত শত দুঃখী রয়েছে দাঁড়ায়ে ;
ওই শুন শুন ডাকিছে তোমারে,
ফুকারি কাঁদিছে তোমায় না হেরে।

(৬)

হয় না কি দয়া, ফাটে না কি বুক,
হেরিয়ে আজিরে দুখীর বয়ান ;
কেন কেন আজি এমন বিমুখ,
মুছাতে তাদের সজল নয়ান ?

(৭)

দেখ দেখ ওই পতিহীনা নারী ;
কুলীন কুমারী দেখ দেখ চেয়ে,
কাঁদিছে কাতরে তোমায় না হেরে
পিতা হীন যেন হয়েছে মেয়ে !

(৮)

দেশবাসী হায় হারায়ে তোমায়,
শোকোচ্ছ্বাসে ওই ফাটায় গগন ;
অসভ্য সন্তাল তারো বুক হায়
তব শোকানলে হতেছে দহন।

(৯)

শিশুর সামান্য মলিন বদন,
হেরিলে নয়ন ঝরিত যাহার ;
এত ঘোর রোল শোকের ক্রন্দন,
(আজি) পারেনা জাগাতে হৃদয় তাহার !

(১০)

উঠ উঠ দেব উঠ একবার,
ডাকে উচ্চস্বরে দেশবাসী তব ;
মুছাও দুখীর অশ্রুনীর ধার,
ছড়াও আবার উৎসাহ নব।

(১১)

হায় বঙ্গবাসী কি দেখিছ আর,
পার কি ভুলিতে এ বিষম শোক ?
দয়ারসাগর ঈশ্বর তোমার,
গিয়াছে চলিয়ে ছাড়িয়ে এলোক।

(১২)

সে বিষম তেজ, প্রতিভা প্রবল,
সুকোমল সেই সুন্দর হৃদয়,
সে দৃঢ় সাহস, সে আত্মা বিমল,
সকল (ই) গিয়াছে চির তরে হায় !

(১৩)

বালিকা বিধবা কুলীন ললনা,
ভাষ অশ্রুনীরে ভাসরে সকলে ;
কোথা পাবে বল তাঁহার তুলনা
(আজি) ভাসালে যাঁহারে ভাগীরথী জলে ?

(১৪)

তোমাদের দুঃখ করিতে মোচন,
মর্ম্মভেদী কত অত্যাচার হায়,
অটল সাহসে সহিল যে জন,
তাহার সমান পাইবে কোথায় ?

(১৫)

এস ভ্রাতৃগণ এস সবে মিলে,
বাল বৃদ্ধ যুবা হ'য়ে এক তান
প্রাণ খুলে আজি কাঁদিরে সকলে,
এ বিষম শোক করিতে নির্ব্বাণ।

(১৬)

বিভুর চরণে এস সবে আজ,
ভিক্ষা মাগি মোরা সেই গুণ রাশি ;
যা'হতে ঈশ্বর এ বঙ্গ-সমাজ,
উজলিলা হায় যেন পূর্ণশশী।

স্ত্রীলোকের সাহস ও প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব।

উত্তর আমেরিকার কুইবেক প্রদেশের অন্তর্গত মনট্রীল নগরে বধির ও মুকদিগের নিমিত্ত সেণ্টভিক্‌টর য়্যাসাইলম্ নামক একটী নিবাস আছে। ঐ স্থানে যাহারা কাণেও শোনে না, কথাও কহিতে পারেনা, এমন অনেকগুলি বালক ও বালিকাকে আশ্রয় দিয়া তাহাদিগকে যত্নের সহিত প্রতিপালন করা হয়, এবং যাহাতে তাহারা বিনাকষ্টে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তদুপযোগী বহুবিধ শিল্প কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়। সিস্‌টার্স-অব-প্রভিডেন্স্ (দয়াবতী ভগ্নী) নামে এক সম্প্রদায় রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম্ম-যাজিকা আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে এই মূক-নিবাসের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করেন। ভগ্নী মারগারেট্ নাম্নী এক ফরাসী মহিলা ঐ নিবাসের একজন শিক্ষয়িত্রী। কিছুদিন হইল,

তিনি সেণ্টভিক্টর য়্যাসাইলম গৃহের ছয় তালার উপর একটি শয়ন ঘরে অনেকগুলি মূক বালক বালিকা লইয়া শুইয়াছিলেন। রাত্রি ৪ টার সময় হঠাৎ নিশ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়া তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও দেখিতে পাইলেন, বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে, একটু স্থিরভাবে নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদিগের নীচে নামিবার সীঁড়ি যে দিকে, সেই দিকেই অগ্নি এত ব্যপিয়া পড়িয়াছে যে, আর সীঁড়িতে যাইবার উপায় নাই। আশ্রমবাসী অন্যান্য লোক এই কারণেই তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে না পারিয়া কেবল আর্ত্তনাদ করিতেছে। নিকটবর্ত্তী সেণ্টহিলডেয়ার গ্রাম হইতে গোলমাল শুনিয়া অনেক লোক আসিয়া জুটিয়াছে, কিন্তু সীঁড়ি কিম্বা অন্য কোন আয়োজন না থাকায় কিপ্রকারে অগ্নি হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবে তাহার কোন উপায় করিতে পারিতেছে না। এদিকে অগ্নি ক্রমেই তাহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই ভয়ানক বিপদের সময় ভগ্নী মারগারেট একে কি করিবেন তাহাই স্থির করিতে পারিতেছেন না, তাহাতে সেই হতভাগ্য বালক বালিকাগণ তাঁহার চতুঃপার্শ্বে বিকট স্বর ও মুখভঙ্গী দ্বারা আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে আরও ব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু নির্ভীকা মারগারেট কিছুতেই ভীত হইলেন না, বা তাঁহার প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে ত্যাগ করিল না। নিমেষ মধ্যে তিনি তোয়ালিয়া ভিজাইয়া স্বীয় মস্তক আবৃত করিলেন ও ইঙ্গিত ক্রমে শিশুদিগের দ্বারাও তাহা করাইলেন; এবং কতকগুলি বিছানার চাদর তুলিয়া লইয়া সেই গুলিকে পরস্পরের সহিতগেরো বান্ধিয়া দিয়া একটী সীঁড়িরমত প্রস্তুত করিলেন। এই কাপড়ের সীঁড়ি হস্তে লইয়া একটি জানালার নিকট অগ্রসর হইয়া তথা হইতে ঐ সীঁড়ি নামাইয়া দিয়া তাহার দ্বারা একে একে সমুদায় শিশুগণকে নীচে নামাইয়া দিলেন। সকলগুলিকে নামাইতে অৰ্দ্ধ ঘণ্টা সময় লাগিল। এই কাল পর্য্যন্ত সমবেত লোকেরা মারগারেটের অসামান্য সাহস দেখিয়া পুলকিত চিত্তে আনন্দ ধ্বনি করতঃ তাঁহার উৎসাহ বৰ্দ্ধন করিতে লাগিল। ভগ্নী মারগারেট ভূতলে অবতীর্ণ হইলে দেখা গেল, অগ্নির তাপে তাঁহার শরীরের নানা স্থান ঝলসিয়া গিয়াছে। ভগবান অসহায়ের সহায় এবং সদনুষ্ঠানের পুরস্কর্ত্তা। এতক্ষণ পর্য্যন্ত ছাতটি সস্থানে থাকিয়া জ্বলিতেছিল। ভগ্নী মারগারেট প্রাঙ্গণে নামিবামাত্র মহাশব্দ করত ছাতটি পড়িয়া গেল।

ভগ্নী মারগারেট যদি সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় ভয়ে আকুল হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইতেন, তবে যে নিদারুণ ঘটনা ঘটিত, তাহা ভাবিতেও আমাদের হৃদকম্প হয়। অনেক পুরুষ আছেন, যাঁহারা বিপদের আশঙ্কা মাত্রেই একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া যান। ভগ্নী মারগারেটের এই কার্য্য দ্বারা তাঁহারাও শিক্ষা লাভ করুন।

স্বর্গীয়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে

কয়েকটী গল্প।

দয়া।

বিদ্যাসাগর যে দয়ার সাগরে ছিলেন, এ কথা কি আবার লোককে বলিয়া বুঝাইতে হয়? তিনি সামান্য ভাবে থাকিয়াও, মাসে দেড় হাজার টাকা গরিব দুঃখীদের দুঃখ নিবারণে ব্যয় করিতেন। তাঁহারসংসারের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে অর্থ ব্যয় হইত,

গরিব দুঃখীদের তাহাতেও অংশ ছিল, এবং ইহা দেখিয়াই তিনি পরম আনন্দ পাইতেন। সাক্ষাৎ দয়া তাঁহার প্রসূতি, তিনি নিজে দয়ার অবতার; তাঁহার স্ত্রীপুত্র-কন্যাগণও যাহাতে দয়ার ছায়ার স্বরূপ হইয়া দুঃখতাপদগ্ধ দরিদ্রদিগকে আশ্রয় দিয়া তাহাদের কষ্ট দূর করেন, ইহাই তাঁহার প্রার্থনা ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমস্ত পরিবার যে এই উদার ও মহৎ অনুশাসনের অধীনে বাস করেন, যাঁহাদের সহিত পরিচয় আছে, তাঁহাদের সকলেই ইহা জানেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেহে যখন বল ছিল, প্রাতঃকালে বেড়াইতে বেড়াইতে এক দিন টালার পোল পার হইয়া অনেকটা দূরে গিয়া পড়িয়াছিলেন। ফিরিবার সময় দেখিলেন, একটী বুড়ী মর-মর হইয়া মল-মূত্র মাখিয়া পথের ধারে পড়িয়া রহিয়াছে। ছোট বড় কত লোক দেখিয়া যাইতেছে, কাহারও প্রাণ কাঁদে নাই; কিন্তু দর্শন-মাত্রেই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি বুড়ীকে মায়ের মত যত্ন করিয়া বক্ষে করিয়া দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসিয়া পাইক-পাড়ার রাজ-বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে বিশেষ যত্নে তাহার চিকিৎসা করাইয়া তাহাকে আরোগ্য করিলেন। তাহার পর বুড়ী যতদিন বাঁচিয়া ছিল, তাহাকে অন্নকষ্ট পাইতে হয় নাই। বরাবরই নিয়মিত রূপে বিদ্যাসাগরের নিকট অর্থ সাহায্য পাইয়াছিল।

একদিন তিনি রাত্রিকালে কলিকাতার কলিঙ্গা নামক স্থান দিয়া আসিতেছিলেন। একটী বুড়ীর কাতর ক্রন্দন স্বর তাঁহার কর্ণে গেল। তত্ত্ব করিয়া জানিলেন, বুড়ীর কেহ নাই, তাহার জীবন সম্বল একমাত্র পুত্র মৃত্যুমুখে উপস্থিত। বিদ্যাসাগরের আর ছাড়িয়া যাইবার যো নাই। তিনি রোগীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া দেখিলেন, তখনও তাহার চিকিৎ-সার কাল আছে। তখন আর একটুও দেরী করিতে পারিলেন না। বাড়ী গিয়া তাঁহার বন্ধু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকিয়া আনিলেন। ঔষধ ও রোগীর সেবার জন্য দুই একজন পরি-চারকও সেই সঙ্গে উপস্থিত হইল। তিন দিন রাত্রি সেই রোগীর পাশে বসিয়া তাহার চিকিৎসা ও সেবা করিয়াছিলেন। বৃদ্ধা ঈশ্বরের কৃপায় মৃত্যু মুখ হইতে পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়া ঈশ্বরকে দেবতা বলিয়া বুঝিয়াছিল।

দরিদ্র অজ্ঞান সাঁওতালদিগের দুঃখে তাঁহার প্রাণ বড়ই কাঁদিয়াছিল। তাহাদিগের বাড়ী বাড়ী গিয়া দেখা শুনা, তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া খাদ্য ও বস্ত্র দান, তাহাদিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত, এ সকলই তিনি পরম আগ্রহের সহিত করিতেন। তাহাদের পীড়া হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাহারা আরোগ্য দাতা চিকিৎসক, পথ্যদাতা পিতা মনে করিত, মাতা রূপে রোগ শয্যা-পার্শ্বে দেখিতে পাইত। পরের কষ্ট দূর করিবার জন্য তিনি সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন, এজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় আন্তরিক যত্নে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বিশেষ নিপুণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার চিকিৎসায় কত দুঃখী গরিবের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় এতগুলি পুস্তক তিনি পাঠ করিয়াছিলেন যে, একজন ভাল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক এতগুলি পুস্তক পাঠ করিয়াছেন কি না, সন্দেহ।

একটী বড় লোকের বাটীতে গো-দোহন হইতেছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মাতৃ দুগ্ধ পান জন্য বৎসের ব্যাকুলতা ও বৎসের প্রতি গাভীর স্নেহ কাতর

ভাব দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে দয়া উথলিয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষে জল আসিল। সেই হইতে প্রায় চৌদ্দ বৎসর কাল তিনি দুগ্ধ বা তৎসম্বন্ধীয় কোনও বস্তুই খান নাই।

তেজ।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বড় তেজীয়ান্ পুরুষ ছিলেন। যখন তিনি সংস্কৃত কলেজের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী, তখন তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে "আসিয়াটিক সোসাইটিতে" যাতায়াত করিতে হইত। একদিন তথায় সাহেবের নিকট গিয়া দেখেন, তিনি টেবিলে পা তুলিয়া দিয়া বই দেখিতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ডাকা ডাকি করিলেও তিনি উত্তর দিলেন না। তিনি তখন কলেজে ফিরিয়া আসিয়া, দরওয়ানের নিকট সেই সাহেবের নাম করিয়া বলিয়া দিলেন যে, ঐ সাহেব সংস্কৃত কলেজে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলে সে যেন একটু আগে গিয়া তাঁহাকে সংবাদ দেয়। একদিন সাহেব আসিলেন। দরওয়ান তাড়াতাড়ি গিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সংবাদ দিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি টেবিলে পা দিয়া একখানি বই পড়িতে বসিলেন। সাহেব আসিয়া কোন রকমেই তাঁহার উত্তর পাইলেন না। ক্রোধে সেক্রেটারীর নিকট গিয়া অভিযোগ করিলেন। সেক্রেটারী বিদ্যাসাগরকে ডাকাইয়া সাহেবের উপর তাঁহার অসঙ্গত আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদ্যাসাগর অম্লানবদনে বলিলেন, ইহা যে অন্যায়, তাহা তিনি জানিতেন না; কেন না, দিন কতক পূর্ব্বে ঠিক ঐরূপ আচরণই তিনি ইহাঁর নিকট পাইয়াছিলেন, এই বলিয়া তিনি সাহেবকে সাক্ষী মানিলেন। সাহেব আর কথাটি কহিতে পারিলেন না।

ন্যায়নিষ্ঠা।

যখন স্কুলের ইন্স্পেক্টর ছিলেন, তখনকার কিছু টাকা তাঁহার নিকট গচ্ছিত ছিল। সেই টাকা যথা সময়ে তিনি গবর্ণমেণ্টকে ফিরাইয়া দিতে ভুলিয়া যান। ২০ বৎসর পরে এক দিন হিসাব পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিলেন, টাকাগুলি ফিরিয়া দেওয়া হয় নাই। যেখানে গবর্ণমেণ্টের টাকার হিসাব থাকে, তখন তিনি সেখানে একথা লিখিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা বলিলেন, গবর্ণমেণ্টের হিসাব পত্রে এ টাকার কিছু উল্লেখ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু সে টাকা রাখিলেন না, সুদে আসলে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

কর্ম্মিষ্ঠতা।

দিনের বেলায় বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও ঘুমাইতেন না। আলস্যের প্রতি তাঁহার নিতান্তই বিরক্তি ছিল। তিনি চেয়ারে হেলান দিতেন না— ঠিক সোজা হইয়া বসিয়া পুস্তকাদি পড়িতেন। চাকর বাকরের উপর হুকুম না করিয়া অনেক শ্রমসাধ্য কার্য্য তিনি স্বহস্তেই সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার কষ্ট দেখি[illegible] তাঁহার বিনা আহ্বানে উপস্থিত হইত। [illegible] কিন্তু তাহাতে বিরক্তই হইতেন।

সহিষ্ণুতা।

বিদ্যা[illegible]শয়ের সহিষ্ণুতার কথা শুনিলে আশ্চর্য্য [illegible] বোধ হয়। প্রৌঢ় বয়সে তাঁহার পায়ে এ[illegible]টি কার্‌বঙ্কল্ হইয়াছিল। স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার মহাশয় তখন জীবিত ছিলেন। বাড়ীতে একটি ঘরে টেবিলের একদিকে তিনি নিজে ও অপর দিকে প্যারী বাবু চেয়ারে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, এমন সময় কার্‌বঙ্কল্ অস্ত্র করিতে ডাক্তার আসিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়

ডাক্তারকে অস্ত্র করিতে আদেশ দিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্যারী বাবু বলিলেন "আর দেরি করিয়া কাজ নাই, কার্‌বঙ্কল্ অস্ত্র কর।" তখন কিন্তু কার্‌বঙ্কল্ অস্ত্র করা শেষ করিয়া, ধুইয়া ডাক্তার ক্ষত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতেছিলেন। কাটিবার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়, একটুকুও মুখ বিকৃত করেন নাই, একটুকুও যন্ত্রণা প্রকাশ করেন নাই। প্যারী বাবুর সহিত গল্পই করিতেছিলেন, প্যারী বাবু তাই ভাবিয়াছিলেন, এখনও অস্ত্র করা হয় নাই। কিন্তু যখন জানিতে পারিলেন, অস্ত্র করা হইয়া গিয়াছে, তখন তিনি অবাক্ হইলেন।

মাতৃভক্তি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতৃভক্তি এরূপ ছিল যে, কিছুতেই আর তাহার তুলনা হয় না। মাতা তাঁহাকে যেরূপ ভাল বাসিতেন, তাহা তিনি বুঝিতেন। মাতা নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহাকে বাড়ীতে যাইতে লিখিয়াছেন। বিদ্যাসাগর বুঝিলেন, না গেলে মাতার দুঃখের সীমা পরিসীমা থাকিবে না। সুতরাং তিনি কলিকাতা হইতে দ্রুতপদে বাসগ্রাম বীরসিংহ অভিমুখে চলিলেন। ২৪ ক্রোশ পথ হাঁটিতে হইবে, তাহাতেও তাঁহার একটু ভাবনা চিন্তা নাই। দামোদর নদ পার হইতে হইবে। ষ্টীমার চলিয়া গিয়াছে, ২।৩ ঘণ্টার পূর্ব্বে ফিরিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু এত গৌণ করিলে সে দিন তাঁহার বাড়ী যাইবার ত সুবিধা হইবে না; মাতা ভাবিবেন, কাঁদিবেন, কষ্ট পাইবেন। সুতরাং সুদূর বিস্তৃত বর্ষায় ভরপুর দামোদর বিদ্যাসাগর সাঁতার দিয়া পার হইলেন। বাড়ী গিয়া দেখিলেন, তাঁহার অনাগমন হেতু মা অনাহারে রোদন করিতেছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় মাতাকে এতই ভাল বাসিতেন যে, তাঁহার মাতার মৃত্যু হইলে, তিনি শোকে নিতান্তই কাতর হইয়া পড়েন। সকল কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এই সময় তিনি এক বৎসর কাল চিৎপুরে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতার কথা কেহ তাঁহার কাছে উত্থাপন করিলে, তিনি বালকের ন্যায় আকুল হইয়া কাঁদিতেন।

ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় স্ব স্ব জননীর প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন। ইহাঁদের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বড়ই মনোমিলন হইত।

কৃতজ্ঞতা।

কান্দীনিবাসী ৺ ভগবচ্চরণ সিংহের কলিকাতা বড়বাজারের দয়েহাটার বাড়ীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা ৺ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১০৲ দশ টাকা বেতনের একটি সামান্য চাকরী করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতা ভ্রাতা প্রভৃতিও মধ্যে মধ্যে ঐ স্থানে আসিয়া থাকিতেন। ক্রমে ভগবচ্চরণ ও তাঁহার পুত্র জগদ্দুর্ল্লভের মৃত্যু হইল, সৌভাগ্যলক্ষ্মীও তাঁহাদের গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের পরিবারে কষ্ট আরম্ভ হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দয়ায় তাঁহাদের পরিবারে এখনও তাঁহার মাসিক সাহায্য চলিতেছে। সিংহ-পরিবারের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয় আজীবন কৃতজ্ঞ ছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি সুন্দর পুস্তকালয় আছে। ঐ পুস্তকালয়ে বহুবিধ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। পুস্তকালয়টির দ্বারা যাহাতে সাধারণে উপকার হইতে পারে, এই ইচ্ছায় তিনি উহার নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন।

সখা। নবম ভাগ। ৯ম সংখ্যা।
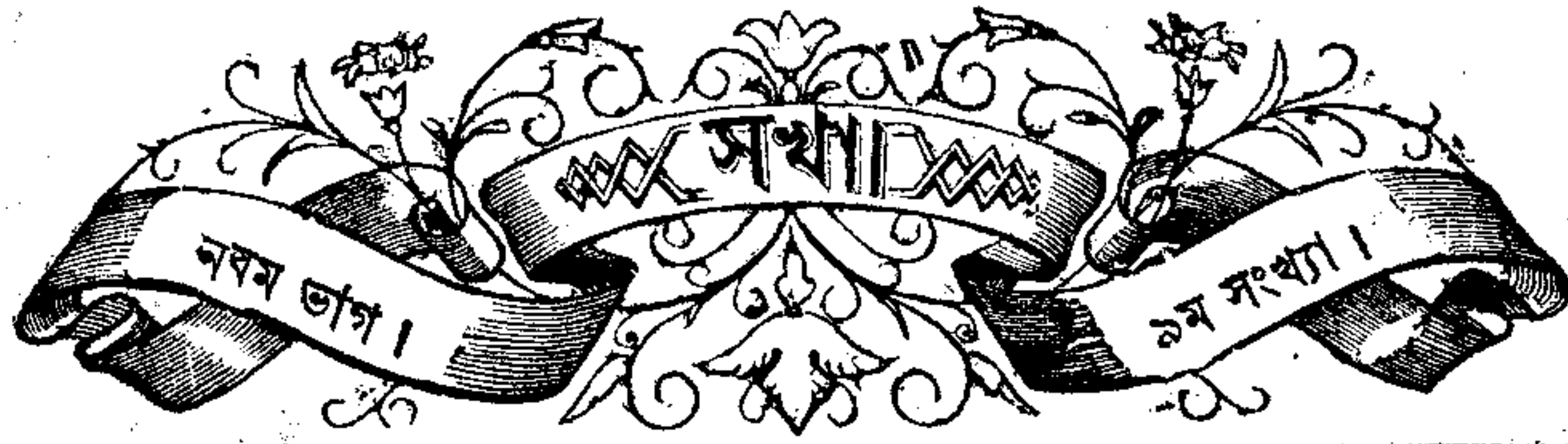
সেপ্টেম্বর, ১৮৯১।

বিবিধ।

টিকেট প্রদর্শনী।—অষ্ট্রীয়া দেশে ভিয়েনা নগরে ডাক টিকেটের এক অপূর্ব্ব প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যত দেশে যত রকমের ডাক টিকেট প্রচলিত হইয়াছে, তাহা এই প্রদর্শনীতে সংগৃহীত হইয়াছে। ড্যাচ্-ইণ্ডিস্ নামে এক দ্বীপে কাষ্ঠ-ফলকের উপর অক্ষর খুদিয়া চিঠী লেখা হইত, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে; ১১৯ দিনের একখানা পোষ্টকার্ড সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছিল, তাহা সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্কটলণ্ডের ডাণ্ডি নামক স্থানের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বের ৫ হাজার টাকা মূল্যের একখানা এবং উত্তমাশা অন্তরীপের ১ হাজার টাকা মূল্যের একখানা টিকেট প্রদর্শিত হইয়াছে। সমুদয়ে ৩০ লক্ষ টিকেট ও চিঠী সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে বেলুনে প্রেরিত চিঠী, পায়রা-দ্বারা প্রেরিত চিঠী এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মাণদিগের কর্ত্তৃক ফরাসি রাজ্যের রাজধানী পেরিস নগর অবরুদ্ধ হইলে মাটির নীচে সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া যে চিঠী চলাচল হইত, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

দেবী রূপিণী রমণী।—ফাদার দামিয়ন সেণ্ডুউইচ নামক দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত মালকাই দ্বীপে নির্ব্বাসিত কুষ্ঠরোগীদের সেবা শুশ্রূষা করিতে যাইয়া এই দারুণ মহাব্যাধিতে আক্রান্ত হন,—তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ফাদার দামিয়নের মৃত্যুতে পৃথিবীর পরিত্যক্ত কুষ্ঠ রোগীদের উপর জগতের সদাশয় নরনারীদের করুণ-দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। মহাত্মা দামিয়নের মৃত্যুতে কুষ্ঠরোগ সংক্রামক বলিয়া একরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে তথাপি তাঁহারা ভীত নহেন;—কত নারী, কত পুরুষ কুষ্ঠরোগীদের সেবা শুশ্রূষাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছেন না! একদল চির-কৌমার্য্যব্রত-ধারিণী ইউরোপীয় রমণী ভারতের কুষ্ঠরোগীদের সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য ভারতবর্ষে আগমন করিতেছেন। আমাদের দেশের লোকের দুঃখ কষ্ট দেখিয়া আমাদের প্রাণ কাঁদে না,—আর কোথায় সুদূর ইউরোপ হইতে রমণীগণ আমাদের দেশের কুষ্ঠরোগীদের সেবা শুশ্রূষা করিতে আসিতেছেন! ইহাঁরা যদি দেবী না হইবেন, তবে দেবী আর কাহারা?

* *
*

দাঁতে বিষ।—শৃগাল, কুকুর, বাঘের কামড়ে লোক মারা পড়ে, এত দিন তাই জানা ছিল; মানুষের কামড়েও যে লোক মারা পড়িতে পারে,

তাহা জানা ছিল না। অল্প দিন হইল, কৃষ্ণনগরে দুইটী স্ত্রীলোক ঝগড়া করিয়া একজন আর এক জনের বাহুতে কামড়াইয়া দেয়। সেই কামড়ের দাগে ঘা হইয়া পচিতে থাকে। ক্রমে সমুদয় হাত পচিয়া গিয়া ১২ দিন মধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সাধারণ মানুষের দাঁতেও তবে বিষ আছে,—সেই বিষে মানুষ মারা পড়ে।

* *
*

থুথুতে বিষ।—লণ্ডন নগরে সম্প্রতি এক স্বাস্থ্য-সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। যত সভ্য দেশের বড় বড় ডাক্তারেরা তাহাতে মিলিত হইয়া স্বাস্থ্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে অনেক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে,—তন্মধ্যে একটী বিষয় এই নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, মানুষের থুথু দ্বারা অনেক রোগ সংক্রামিত ও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ছুঁয়াচে রোগত লালার সহিত সহজেই সংক্রামিত হয়;—তদ্ব্যতীত দন্তক্ষয়, দন্তনালী, মাড়ী-ফোঁড়া, উদরাময়, ফুসফুসের প্রদাহ, ফুসফুস পচা, কর্ণমূল, ডিপ্‌থিরিয়া, যক্ষ্মা, উপদংশ প্রভৃতি ৩৪ প্রকার কঠিন ও অচিকিৎস্য রোগ জন্মিয়া থাকে। পরীক্ষার জন্য ১১১ জন সুস্থ লোকের থুথু পশু শরীরে প্রবিষ্ট করান হইয়াছিল,—১১১ টা পশুর মধ্যে ১০১ টারই মৃত্যু ঘটে। মানুষের মুখের ভিতর,—থুথু ও লালাতে কি ভয়ানক বিষ! যাঁহারা ভক্তি ও ভালবাসার খাতিরে উচ্ছিষ্টের বিচার করেন না, তাঁহারা সাবধান হইবেন। যত বড় গুরু-ব্যক্তি হউন না কেন,—প্রাণের যত প্রিয়তম পাত্র হউন না কেন, কাহারই উচ্ছিষ্ট খাওয়া তবে কখনই উচিত নহে। ছেলে মেয়েদিগকে লোকে যে চুমু খেয়ে থাকে, তৎসম্বন্ধেও পিতামাতাদের সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য।

* *
*

অদ্ভুত সিন্ধুক।—চব নামে এক ইংরেজ যে তালা প্রস্তুত করিয়া থাকেন, তাহা জগদ্বিখ্যাত। তিনি ভারতবর্ষের কোন রাজার জন্য এক সিন্ধুক প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই সিন্ধুক যে খোলে, তাহার ছবি সিন্ধুকের উপর মুদ্রিত হইয়া থাকে;—সকলের শেষে কে খুলিয়াছে, তাহাও জানিতে পারা যায়। রাণীর অলঙ্কারাদি এই সিন্ধুকে থাকিবে।

* *
*

পশু চিকিৎসালয়।—কলিকাতাতে পশুর প্রতি অত্যাচার নিবারণী এক সভা আছে, কিন্তু রুগ্ন পশুদিগের চিকিৎসার জন্য কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। কলিকাতা হইতে কয়েক ক্রোশ উত্তরে সোদপুর নামক স্থানে জৈনদিগের এক পিঞ্জরা পোল আছে। সেখানে রুগ্ন গোরুর আহার পানীয় যোগান হইয়া থাকে,—কিন্তু চিকিৎসার কোনও বন্দোবস্ত নাই,—অন্য পশুদের তাহাতে স্থান দেওয়া হয় না। এই অভাব দূরকরণ জন্য কলিকাতার মাড়োয়ারী ধনী বাবু শিওবক্স বগলা বাঙ্গলা গবর্ণ-মেণ্টের হাতে ৩০ হাজার টাকা অর্পণ করিয়াছেন।
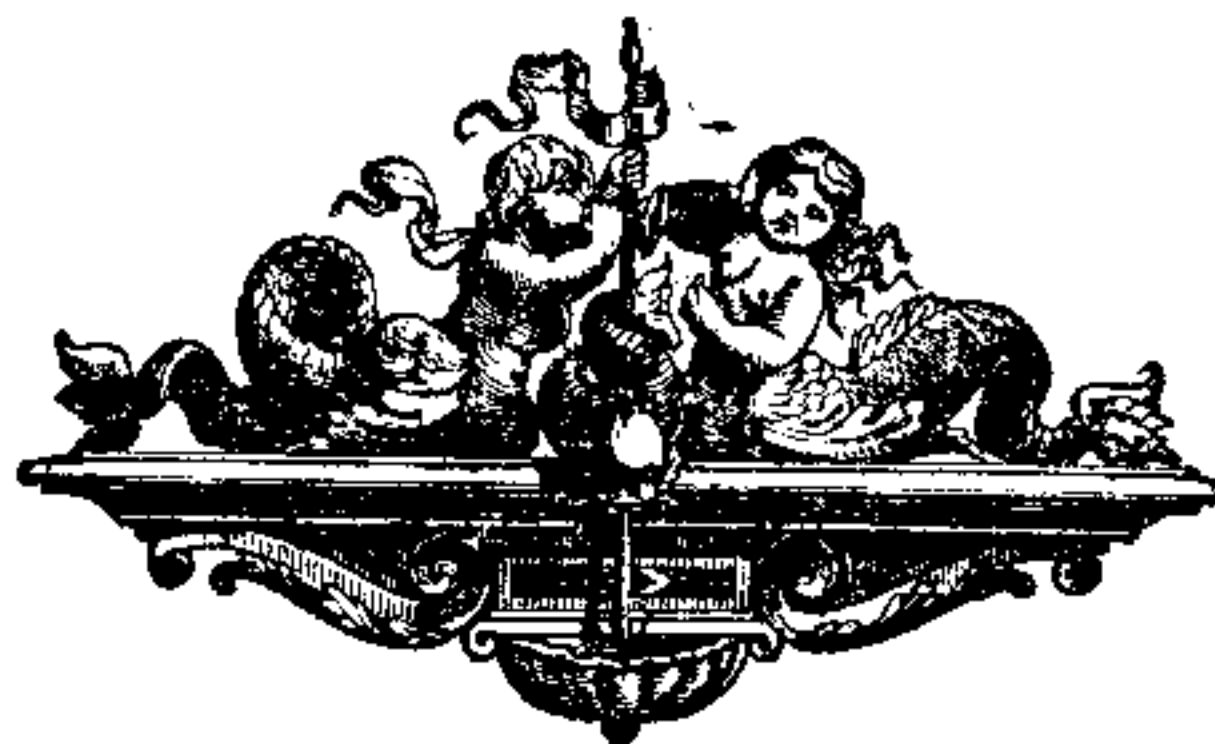
পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অশুভ দৃষ্টি।

জ্যৈষ্ঠ মাসে সুখদার বিবাহের পত্র হইল। আষাঢ় মাসে দুর্গাপুরে বারোয়ারি পূজা। দশজনের আমোদের জন্যই এ উৎসব হইয়া থাকে, সুতরাং প্রায়ই শীত কালে কি বসন্ত কালে এ উৎসব হইবার প্রথা। দুর্গাপুরে কোন না কোন কারণ বশতঃ আষাঢ় মাসে এ পূজার নির্দ্দিষ্ট সময়। এ বৎসর অত্যন্ত সমারোহ সহকারে এই বাৎসরিক উৎসব হইবেক। পূজা অর্চ্চনা কি হয় না হয় কেহই দেখিতে আইসে না। নৃত্য গীতই ইহার প্রধান অঙ্গ। এ বৎসর বন্দোবস্ত হইয়াছে, বৈকালে মধুকানের ঢপ হইবে। চারি দণ্ড রাত্রির সময় ঢপ বন্ধ হইয়া দাশুরায়ের পাঁচালি আরম্ভ হইবেক। তিন চারি ঘণ্টা পাঁচালির পর গোবিন্দ অধিকারির যাত্রা আরম্ভ হইবে, সমস্ত রাত ও পরদিবস ৯ টা পর্য্যন্ত গান হইবেক। দুর্গাপুরের চতুপার্শ্বে ১০ ক্রোশের মধ্যে এরূপ সমারোহ কখনও যে হইয়াছিল তাহা বৃদ্ধেরাও স্মরণ করিতে পারে না। বারোয়ারির ৫।৭ দিবস পূর্ব্ব হইতেই নানা স্থান হইতে লোক জন আসিতে লাগিল। যাহাদিগের আত্মীয় স্বজন বা কুটুম্ব দুর্গাপুরে বা শিবপুরে ছিল তাহারা তৎতৎ আলয়ে গিয়া আশ্রয় লইল। যাহাদিগের এরূপ সুবিধা ছিল না তাহারা দুর্গাপুরের বাজারে বাসস্থান গ্রহণ করিল। ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে তথাপি লোকের সমারোহের কমি নাই। শিবপুরে রায় মহাশয়ের বাটীতে তাহার জামাতা ও ভাবি জামাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জামাতার রূপ বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। ভাবি জামাতা কৃষ্ণবর্ণ, অপেক্ষাকৃত লম্বা, শরীর ক্ষীণ অথচ মাংসল মেদের লেস মাত্র নাই। কণ্ঠা হইতে নাভীকূপ পর্য্যন্ত গাঢ় কৃষ্ণ কুঞ্চিৎ লোমাবৃত, বিশাল গুম্ফ ও এরূপ নিবিড় দাড়ি যে যতই কেন ক্ষৌরকার্য্য করুণ না সে কেশের মূল নষ্ট করিবার যো নাই। কামাইলে বোধ হয় যে, যেখানে যেখানে চুল ছিল সেখানে সেখানে কালি লাগান হইয়াছে। দন্তগুলি ডাগর ডাগর, ওষ্ঠাধর পুরু, নাসিকা ক্ষুদ্র এবং অগ্রভাগ খড়মের বোলোর ন্যায় কিঞ্চিৎ প্রসস্ত। গলায় যজ্ঞোপবিত কৃষ্ণ প্রস্তরের উপর খড়ীর দাগের ন্যায় শোভা বিকীর্ণ করিতেছে।

সুখদা বরের চেহারা দেখিয়া কি ভাবিলেন, কি না ভাবিলেন, তাহা বলা যায় না, কিন্তু বিবাহের পত্রের পরদিবস হইতে তাহার যে স্ফুর্ত্তি হইয়াছে তাহা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্তই হইতেই লাগিল বর দেখিয়া যেন সুখদা যৎপরনাস্তি আনন্দিত হইলেন। কিন্তু কাহাকে সে বিষয়ে কিছু বলেন না এবং কেহই জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেন না।

বারোয়ারীর সময় এত লোক জন সমবেত হইয়াছে যে দুর্গাপুর ও শিবপুর পল্লি গ্রাম হইয়াও কএক দিবস হইতে সহরের ন্যায় জনতা পূর্ণ হইয়াছে। রাস্তা দিয়া দিন রাত লোকজন চলিতেছে, কে কোথা হইতে আসিয়াছে তাহার ঠিক নাই, পরস্পর প্রায়ই কেহ কাহাকে চিনে না। পুরুষ মানুষদিগকে যদিও কখন কখন চেনা যায় কিন্তু স্ত্রীলোকদিগকে চেনা অসম্ভব। সহজেই লোকে আপনার পাড়ার স্ত্রীলোকদিগকে চিনিতে পারে না, তবে এক্ষণে এত জনতার মধ্যে ভিন্ন পল্লীর ও ভিন্ন গ্রামের স্ত্রীলোকদিগকে কি প্রকারে চিনিবে? গ্রামের এই অবস্থা। এক দিবস বৈকালে সুখদা মনে করিলেন একবার তাঁহার ভাবি ভর্ত্তার সহিত

সাক্ষাৎ করিয়া ভাব গতিকে পর্য্যালোচনা করিবেন। এই অভিসন্ধি স্থির করিয়া একখানি মলিন বসন পরিধান করিলেন ও সমস্ত শরীরের গহণাগুলি খুলিয়া ফেলিলেন। খোপা খুলিয়া চুল গুলি ছড়াইয়া দিলেন। এবং প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন কখন পুষ্করিণীর ধারে তাঁহার ভাবি ভর্ত্তার দেখা পাইবেন। অধিক্ষণ সুখদাকে এরূপ উৎকণ্ঠায় থাকিতে হইল না। ভাবি ভর্ত্তা সায়হ্নে হস্তপদাদি ধৌত করিতে গিয়াছেন, এমন সময় একটী মৃত্তিকা কলস কক্ষে করিয়া সুখদা সেই পুষ্করিণীর ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাই মোহন এরূপ রূপলাবণ্য সম্পন্না কন্যাকে বিধবা মনে করিয়া যথার্থই মনে মনে দুঃখিত হইলেন। কন্যা জল আনিতে আসিয়াছিল বটে কিন্তু ঘাটে আসিয়া আর ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে না। কেবল তাঁহারি দিকে তাকাইয়া আছে। কিন্তু তিনি যখন কন্যারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, বালিকা অমনি চোক ফিরাইয়া লইয়া অপরদিকে চায়। রাইমোহন তাহার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন "বাছা তুমি কে? তোমাকে দেখে বোধ হচ্ছে যেন তুমি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে।"

কন্যা। হ্যাঁ আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। তুমি কি এই বামন বাড়ীর সুখদাকে বিয়ে করবে?

রাই। কেন? সে কথা কেন?

কন্যা। কেন তা জানি না। শুনেছি তার বিয়ের পত্র হয়েছে আর তার বর এই বাড়ীর জামায়ের সঙ্গে এসেছে। তা তুমিই তো একা এসেছ, তবে তুমিই যেন তারে বিয়ে করবে বোধ হচ্ছে।

রাই। হাঁ বাছা, আমারি সঙ্গে বিয়ে হবার কথা হয়েছে।

কন্যা। বাপ্‌রে বাপ্‌রে বামুনদের কি টাকার লোভ? সুকির তো একবার বে হয়ে গেছে বল্লিই হয়, কেবল ছালনা তলায় যায় নি। সে বিয়ে ভেঙ্গে আবার তোমার সঙ্গে সমন্দ করেচে?

রাইমোহন কিঞ্চিৎ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কহিলেন "তবে তুমি ও বাড়ীর সকলকেই জান আর ওদের বাড়ী কখন কি হয় টের পাও।

কন্যা। তা আর পাব না? আমরা হলাম পড়সী, আর আমরা সুখীর সঙ্গে একত্তার খেলা করেছি একত্তার চলেছি, ফিরেছি?

রাই। যদি তুমি সমস্তই জান বল দেখি কার সঙ্গে এ বিয়ে হয়েছে?

কন্যা। কেন আমাদের গায়ের পিয়নাথের সঙ্গে।

রাই। প্রিয়নাথকে কি সে ভাল বাসে?

কন্যা। ভাল বাসে না? পিয়নাথের নাম জপ করে, ধ্যান করে, স্বপ্নেও পিয়নাথরে দেখে।

রাই। তুমি তার মনের কথা ঠিক জান?

কন্যা। আমি ঠিক জানবো না তো কে জান্‌বে? তার বাপ, মা, তার আপনার বুনও আমি তার কথা যত জানি এত জানে না।

রাই। তুমি কি তার হয়ে আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছ, না আমার সঙ্গে তোমার হঠাৎ দেখা হলো?"

কন্যা। পোড়া কপাল আর কি? আমি তার হয়ে তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে আস্‌ব কেন? মেয়ে মান্‌সে কি কখন চর পাঠায়? আমি জল আন্‌তে এসে দেখলাম তুমি এখানে আছ তাই দুটো কথা জিজ্ঞাসা করলেম।

রাই। আর কি কিছু জিজ্ঞাসা করবে?

কন্যা। আর কি জিজ্ঞেসা করবো? আচ্ছা পুরুষ ব্যাধ নাকি? না বাঘ ভালুক? এই সুখী

মনে মনে এক জনেরে বিয়ে করেছে, আবার তোমার সঙ্গে তার বিয়ে হবে। তা হলে তুমি ব্যাধ হলে না? একজনের বাসার পাখী আর এক জনে নিয়ে গেল না? শুনিচি তুমি বড় মানুষ, অনেক টাকা কড়ি জমাজমী আছে। তুমি বেশী টাকা দেবে বলে সুখীর বাপ সুখীকে তোমাকে দেবে। তুমি যদি ব্যাধ না হও তবে কেন সুখীকে নেবে? তোমার টাকা আছে, আর এক জায়গায় তো বে কর্ত্তে পার। টাকা থাক্‌লে অভাব কি? যার টাকা আছে সে পরের জিনিষ চুরি করে না। তোমার অনেক টাকা আছে, অনেক ভাল ভাল মেয়ে কিন্তে পার, তবে কেন পিয়নাথের পাখীটী তুমি নেবে?"

রাই। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ঠিক করে বল্‌বে?

কন্যা। কেন বলব না, আমার আর ডর কি? আমার ঘরের লোক নেই, আমি আর কারে ডরাব?

রাই। না, না, সে অন্য কোন কথা নয়। কথাটা এই সুখদা দেখ্‌তে কেমন?

কন্যা। ঈষৎ হাস্য করিয়া "ঠিক মেয়ে মন্‌ষের মতন।"

রাই। না না, আমি তা বলছি না। আমি কি জানিনে যে সে মেয়ে মানুষ? আমি জিজ্ঞাসা করছি তার চেহারা কেমন?"

কন্যা। চেহারা ঠিক আমারি মতন, নাক আছে, কান আছে, চোক আছে, মুখ আছে—

রাই। কি বিপদ? সে সুশ্রী না কুশ্রী?

কন্যা। আমি কেমন তোমার বোধ হয়?

রাই। তোমার কথা ত হচ্ছে না? সে কেমন?

কন্যা। আগে আমার জবাব দেও, তবে তোমার জবাব দেব।

রাই। তুমি তো পরমা সুন্দরী।

কন্যা। যেমন তুমি পরমা সুন্দর?

রাই। ঠাট্টা কর কেন? সুশ্রী আর কুশ্রী হোক আমি পুরুষ তো বটে?

কন্যা। সুশ্রী আর কুশ্রী হোক সেও মেয়ে তো বটে?

রাই। আমি আর তোমায় কথায় পারব্‌ না?

কন্যা। "তুমি কথায় পারবে না, আমি তোমায় কাজেও পারবো না" "এই বলিয়া বালিকা আকাশেরদিকে তাকাইয়া কহিল "বেলা গিয়েছে যে। যাই শিগ্‌গির যাই, তবে আবার শাশুড়ী ননোদ আছে, একটু দেরি হোলে আমারে কি আস্ত রাখবে? বিধবার অনেক জালা।" এই বলিয়া বালিকা কলসীটী জলপূর্ণ করিয়া কক্ষে লইয়া চলিয়া গেল। রাই মোহন আরও দু একটী কথা কহিবার জন্য ও তাহার শেষ কথার অর্থ জানিবার জন্য পুনঃপুন তাহাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন। কন্যা শুনিল না। চলিয়া যাইতে লাগিল। তখন তিনি কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার শেষ কথার মানে কি ব'লে যাও।"

কন্যা। "বুদ্ধি থাকে বুঝে নেও। এই বলিয়া বালিকা অন্তঃধ্যান হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দুর্গাপুরের বারোয়ারি ফুরাইয়া গেল। দুর্গাপুর ও শিবপুর পুনরায় পল্লিগ্রামের রূপ ধারণ করিল। রায় মহাশয়ের জামাতা ও ভাবী জামাতা উভয়ে নিজ গ্রামে নৌকারোহণে গমন করিলেন। রাই মোহন যেরূপ স্ফূর্ত্তিতে আসিয়াছিলেন তাহার আর সেরূপ স্ফূর্ত্তি নাই। ছদ্মবেশী সুখদার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া অবধি তাঁহার পূর্ব্বের স্ফূর্ত্তি যেন কোথায় পলাইয়া গেল। প্রথম দিবস যেরূপ আগ্রহ সহ-

কারে ঢপের কীর্ত্তন, পাঁচালি ও যাত্রা শুনিয়াছিলেন তাহার পরের আর দুই দিবস আর তাঁহার সে আগ্রহ রহিল না। আর আর পাঁচ জনে শুনিতে যায় বলিয়াই তিনিও যাইতেন। গীত বাদ্যের মধ্যে তিনি প্রায়ই বসিয়া নিদ্রা যাইতেন। কিন্তু বসিয়াই হউক আর শয়ন করিয়াই হউক সুচারু নিদ্রা তাঁহার আর হয় না। সর্ব্বদাই স্বপ্ন দেখেন ও স্বপ্ন দেখিলেই নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়। আহারে রুচি নাই, লোক জনের সহিত ভাল করিয়া কথা কন না। যত দিন বারোয়ারির ধুম ছিল ততদিন সকলেই নিজ নিজ আমোদে মত্ত, সুতরাং কেহই তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই। নৌকায় কেবল তাঁহারা দুই ভাই মাত্র ছিলেন, সুতরাং তাহার ভ্রাতা অনায়াসেই রাইমোহনের পরিবর্ত্তিত ভাব জানিতে পারিলেন। জানিতে পারিয়া ক্ষণকাল রাইমোহন না টের পান এইরূপ প্রচ্ছন্নভাবে তাহার মুখমণ্ডল অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন তিনি যাহা মনে ভাবিয়াছিলেন তাহাই প্রকৃত। তখন তিনি প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন "রাই, আজ কদিন হলো, তোমার যে কি হয়েছে আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। শিবপুরেও দু এক দিন পরে তোমার এই ভাব দেখেছিলাম, কিন্তু আমি তখন কিছু বলি নি, মনে করেছিলাম আমি শ্বশুর বাড়ী গিয়াছি তোমার আর এখন শ্বশুর বাড়ী নেই সেই জন্যেই বুঝি তোমার মন খারাপ হয়ে থাক্‌বে, কিন্তু তা হলে এত দিন পর্য্যন্ত কেন তুমি এত দুঃখিত ভাবে থাক ?"

রাই। দাদা, মনের কথা শুন্তে চাও ?

ভ্রাতা। মনের কথা শুন্তে চাই না কি ফাঁকা কথা শুন্তে চাই ?

রাই। বারোয়ারির প্রথম দিন তো গান টান শুনে এলাম; তার পরদিন দুপর বেলা খেয়ে দেয়ে খুব ঘুমালেম, বৈকালে হাত পা ধুয়ে সন্ধ্যাহ্নিক করবার জন্য ওদের পুকুরের ঘাটে গিয়াছিলেম। সেখানে গিয়ে অল্প বয়স্কা একটী বিধবার সঙ্গে দেখা হলো। তার চেহারা দেখ্‌লে ছোট লোকের মেয়ের মতন বোধ হয় না, কিন্তু কথায় টের পাওয়া গেল সে সামান্য লোকের মেয়ে। সে আমার বিয়ের কথা নিয়ে কতকগুলা কথা কয়ে গেল। সে যে কাটা কাটা কথা কৈলে তার যবাব দেওয়া যায় না বিশেষ সে স্ত্রীলোক, আবার তার উপর বিধবা। তাতে আমি বল্‌লাম, তোমাকে আর কথায় পারব না। সে বলে গেল "তা হলে আমি কাজেও পারবো না।" আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লাম না, না পেরে তাকে পুনঃ পুনঃ বল্লাম একটু থাম, তোমার কথার মানে কি বোলে যাও।" সে কলসী নিয়ে চলে গেল, আর থাম্‌ল না, কেবল এই মাত্র বলে গেল "বুদ্ধি থাকে বুঝে নেও।" আমার বোধ হচ্ছে দাদা সেই সুখদা ছদ্মবেশে এসেছিল, তা যদি না হয় তবে তো আমার ওখানে বিয়ে করা উচিত নয়।

ভ্রাতা। তুমি ক্ষেপেছ নাকি ? রায় মহাশয়ের মেয়ে গায়ের গহণা খুলে এসে তোমার সঙ্গে কথা কবে ? আমি নিশ্চয় জানি তারা একলা ঘরের বার হয় না। ও একটা নাপ্‌তেদের মেয়ে হবে। রায় মহাশয়ের বাড়ীর কাছে একটা নাপিতের বাড়ী আছে, তাদের একটা বিধবা মেয়েও আছে সে মেয়েটাও সুখদার বয়সী। নাপিতেরা কত চালাক জান তো ? এ বোধ হয় তারি কাজ ?"

রাই। যদি কেউ শিখিয়ে দিয়ে থাকে ?

ভ্রাতা। তাও কি হইতে পারে ? সুখদার যদিও ১৪ বৎসর বয়স হয়েছে তবুও সে দিন পুতুল নিয়ে খেলা করেছে আমি স্বচক্ষে দেখেছি ? সে এখনও কচী ছেলে মান্‌সের মতন। সন্ধ্যা না জালতে জালতে ঘুমিয়ে পড়ে। যে দিন এ

বিয়ের পত্র হয় সে দিন তো তার অঘোর ঘুম হয়েছিল ?”

রাইমোহনের মুখে একটু স্ফুর্ত্তির আবির্ভাব হইল। ক্রমে ক্রমে ভ্রাতার কথা শুনিয়া রাইমোহন বিলক্ষণ হর্ষোৎফুল্ল হইলেন।

ক্রমশঃ

(প্রাপ্ত)

দুই বোন্।

পূর্ণিমার রাত্রে।

ছোট বোন্। কেন বসে হায় এমন সুখের দিনে।
এস দিদি বাগানেতে যাই দুই বোনে॥
পূর্ণিমার চাঁদ আহা কেমন সুন্দর।
পৃথিবীতে কিছু নাই এত মনোহর॥
চারিদিকে তারাগুলি ঝিক্ মিক্ করে।
তাহাদের মাঝে শশী কিবা শোভা ধরে॥

বড়। সত্য—কি সুন্দর শোভা দেখি চারিধারে।
হাঁসিয়া প্রকৃতি যেন বিভু গান করে॥
দেখ পুঁটি, বাগানেতে পড়েছে কিরণ।
পরে’ছে জগত যেন ধবল বসন॥
অই দেখ বকুলের তলাটী কেমন।
চাঁদের আলোকে যেন দিনের মতন॥
এস বোন্ চল যাই বকুলের তলে।
বসিব দুজনে সেথা কেমন বিরলে॥

ছোট। ঠিক কথা দিদি তুমি বলেছ এখন।
বেশী ক্ষণ থাকিব না থাকে এ স্মরণ॥
আজিকে দুজনে সেথা মনের হরষে।
গাইব সাধের গান কতই উল্লাসে॥

বড়। দেখ বোন্ পথে কত ফুল ফুটিয়াছে।
চাঁদ পানে চেয়ে তারা কতই হাঁসিছে॥
বিমল চাঁদের করে চকোর আসিয়া।
করিতেছে সুধা পান পরাণ ভরিয়া॥
অই শুন থেকে থেকে পাখী ডাকিতেছে।
শ্রবণে আমার যেন সুধা ঢালিতেছে॥
চাঁদের আলোকে তা’রা ভাবিয়াছে দিন।
গাইছে পরাণ ভরে হরষে নবীন॥

ছোট। এস বসি বকুলের তলে এইবার।
পঞ্চমে [illegible] তান গাহি বার বার॥
আশে পা[illegible] [illegible]ই নির্জ্জন কানন।
স্বরগের অধিক [illegible]রো দুই বোন্॥

বড়। আর নয় বোন্, চল যাই এইবার।
যাঁ’হতে পেলাম সুখ করি নমস্কার॥
চাঁদের আলোকে মোরা এই বাগানেতে।
এতক্ষণ রহিলাম কতই সুখেতে॥
বহুক্ষণ গত হ’ল আসিয়াছি মোরা।
চল বোন্ যাই তবে বাড়ীপানে ত্বরা॥

শরীরের গঠন ও অস্থি বিবরণ।

রীরকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—(১) মস্তক বা মুণ্ড, (২) মধ্যশরীর, (৩) শাখা—(হস্ত পদ)। মস্তকের দুই অংশ—একাংশ মূর্দ্ধা বা শিরোদেশ, অপরাংশ

মুখ মণ্ডল। মধ্য শরীরের বক্ষঃস্থল ও উদর এই দুই বিভাগ। হস্ত ও পদ শরীরের দুই পার্শ্বে দুইটী করিয়া থাকে।

সমস্ত শরীরটার দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে শরীরটা লম্বার্দ্ধে অনুরূপ—অর্থাৎ যদি মাথার মাঝখান হইতে আরম্ভ করিয়া ভ্রূদুটার মধ্য দিয়া নাকের উপর দিয়া, বুক ও পিঠের মাঝ দিয়া সমস্ত শরীরটাকে একটা বড় ছোরা দিয়া লম্বা লম্বি চিরিয়া দুই খণ্ড করা যায়, তবে এক অর্দ্ধ দেখিতে ঠিক অপর অর্দ্ধের অনুরূপ হ

নরদেহের বিষয় [illegible] সুবিধার জন্য, দেহের যন্ত্রগুলিকে আট ভ[illegible] [illegible]ভক্ত করা হয়, যথা :—

১। অস্থিমণ্ডল বা কঙ্কাল।

২। (মাংস) পেশী মণ্ডল।

৩। পরিপাক প্রণালী।

৪। (রস) শোধন প্রণালী।

৫। (রক্ত) সঞ্চালন প্রণালী।

৬। শ্বাস প্রণালী।

৭। সংস্কার বা শোধন প্রণালী।

৮। স্নায়ু মণ্ডল।

একে একে এই প্রত্যেক বিভাগের বিষয় কিছু কিছু শিখিলে আমরা দেহ-তত্ত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে পারিব।

শরীরের অস্থিমণ্ডলে দুই শতেরও অধিক অস্থিখণ্ড আছে। এই অস্থি খণ্ডগুলি পরস্পরের সহিত এরূপ ভাবে সংযুক্ত যে সংযোগ স্থলে অস্থিগুলি পরস্পরের সহিত একেবারে মিশিয়া যায় নাই সংযোগ স্থলে গ্রন্থি বা গাঁইট আছে। গাঁইটগুলি এরূপে গঠিত যে হাড়গুলিকে সন্ধি স্থলে কব্জার মত সহজেই এধারে ও ধারে ঘুরাণ ফিরাণ যায়। সন্ধিস্থলে অস্থিগুলি শ্বেত সূত্রময় পদার্থের রজ্জুর ন্যায় বন্ধনীর দ্বারা পরস্পরের সহিত এত দৃঢ় বদ্ধ যে খুব জোর করিয়া এই দড়ির মত, শক্ত মাংসের বন্ধনী ছিঁড়িয়া ফেলিতে না পারিলে এক অস্থিখণ্ডকে অপর খণ্ড হইতে সহজে বিযুক্ত করা যায় না।

শরীরের নানা স্থানে অস্থির সন্ধি স্থলে কব্জা আছে। কুচ্‌কি বা উরুর কব্জা, হাতে কব্জা, পায়ে কব্জা, আঙ্গুলে কব্জা, পিঠের দাঁড়ার প্রত্যেক অস্থির মধ্যে কব্জা, মাথাও ঘাড়ের হাড়ের মধ্যে কব্জা—এই সকল কব্জা থাকাতেই হাত পা নাড়িতে পারি ও শরীরকে ইচ্ছামত নানা দিকে ঘুরাইতে ফিরাইতে পারি!

শরীরের যেখানে অস্থি কোমল ও স্থিতি স্থাপক হওয়া আবশ্যক তথায় অস্থির পরিবর্ত্তে উপাস্থি (কোমল অস্থি) আছে। যেমন কাণ, নাসিকার অগ্রভাগ ও শ্বাস নালী।

অস্থি খণ্ডগুলির একত্র সংযোগে শরীরের কোমলাংশের রক্ষণোপযোগী দৃঢ় কাঠাম বা ঠাট গঠিত। হাড়ের এই কাঠাম বা 'ফ্রেম'কে অস্থিপঞ্জর বা "কঙ্কাল" বলে।

কঙ্কালের প্রধান অংশ 'মেরুদণ্ড', কশেরু বা পিঠের শিরদাঁড়া। ইহা ঘাড়ের উপর বা মাথার নীচ হইতে আরম্ভ করিয়া পাছা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মেরুদণ্ড তেত্রীশটী (৩৩) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ডের সংযোগে গঠিত বলিয়া উল্লিখিত হয়।

মাথার নিম্ন হইতে কোমরের শেষ পর্য্যন্ত এই অংশে চব্বিশখানি (২৪) বিভিন্ন অস্থিখণ্ড আছে ইহাদিগকে 'কশেরুকাস্থি' বা 'মেরুদণ্ডের অস্থি' বলে। এই অস্থিখণ্ডের সবগুলাই দেখিতে প্রায় একরূপ। ইহাদের আকৃতি—অর্দ্ধ বৃত্তাকার নিরেট

অথচ চ্যাপ্টা দেহ [১]; তাহার দুই পার্শ্ব হইতে দুইখানি ছোট হাড় বাহির হইয়া বক্রভাবে মিশিয়া অঙ্গুরীর ন্যায় হইয়াছে। এই ছিদ্রের [২] মধ্য দিয়া 'কশেরুকাস্থি' বা 'মেরুদণ্ডের মজ্জা গমন করে। এই অঙ্গুরীর সম্মুখে একটা [৩] ও দুই পার্শ্বে [৪] দুইটা বাহু নির্গত হইয়াছে। এই দুই বাহুর নিকট হইতে উপরের দিকে দুইটী ও নীচের দিকে দুইটী করিয়া ছোট ছোট চাক্তি বাহির হইয়া থাকে। এক কষেরুকাস্থির নীচের দিকের চাকৃতি দুটার সহিত অপর অস্থির উপরের দিকের চাক্তি দুটার দৃঢ় যোগ; এইরূপ ভাবে উপর্য্যুপরি ২৪ খানি কশেরুকাস্থির সংযোগে 'মেরুদণ্ড' গঠিত। মেরুদণ্ডের অস্থিগুলির সংযোগ স্থলে এক এক খানি ক্ষুদ্র উপাস্থি ও সূত্রবৎ বন্ধনী সকল আছে। এই উপাস্থিগুলি কোমল ও স্থিতিস্থাপক বলিয়া গাড়ির স্প্রিংএর মত কায করে। অর্থাৎ লাফ ঝাঁপ করিলে বা জোরে মাটীতে পা ফেলিলেও সমস্ত শরীরে ভয়ানক ঝাঁকি বা ঝাঁকড়ানি লাগে না। এই উপাস্থিগুলি না থাকিলে অত্যন্ত ঝাঁকি লাগিত। বন্ধনী দ্বারা অস্থিগুলি এত দৃঢ় সংবদ্ধ যে ইহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা দুরূহ ব্যাপার। একটা অন্যটার সহিত দৃঢ় রূপে সংযুক্ত থাকিলেও অল্পপরিমাণে এধারে ওধারে বাঁকাইতে পারা যায়।
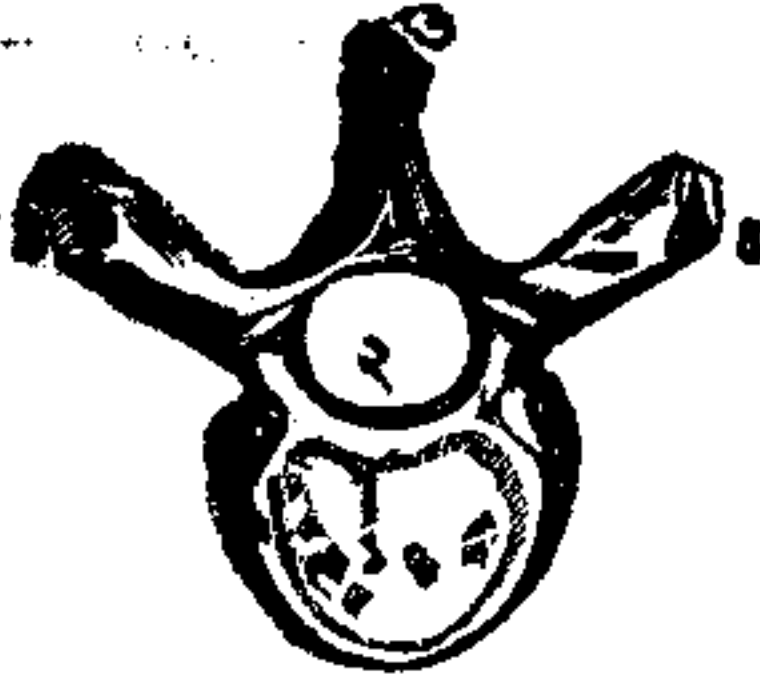
গ্রীবা বা ঘাড়ে ৭টী 'কষেরুকাস্থি' আছে। মেরুদণ্ডের অন্য অংশ অপেক্ষা এই অংশের অস্থিগুলিকে অধিক পরিমাণে ঘুরাইতে ফিরাইতে পারা যায়। ইহাদের প্রথম দুইটী একটু ভিন্ন ভাবে গঠিত; এই দুই অস্থির সহিত মাথাটা এক বিশেষ ধরণের কব্জায় আবদ্ধ। এই কব্জা এরূপ ভাবে গঠিত যে মাথাটাকে সম্মুখে ও পশ্চাতে, দক্ষিণে ও বামে হেলান যায়, এবং একপার্শ্বে হইতে অপর পার্শ্বে মাথাটাকে ঘুরাণ যায়।

পৃষ্ঠদেশে ১২টী কষেরুকাস্থি আছে। ইহার প্রত্যেকটীর সহিত এক এক যোড়া পাঁজরার হাড় সংযুক্ত আছে। কষেরুকাস্থির পার্শ্বদেশের বাহুদ্বয়ের নিকট হইতে দুইধার দিয়া দুইখানি সরু হাড় [২] ধনুকের মত বাঁকিয়া আসিয়া সম্মুখে বুকের হাড়ের [৩] সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই বার যোড়া পাঁজরার হাড়ের শেষের বা নীচের দুই যোড়া বুকের হাড়ের সহিত সংযুক্ত নহে। প্রথম
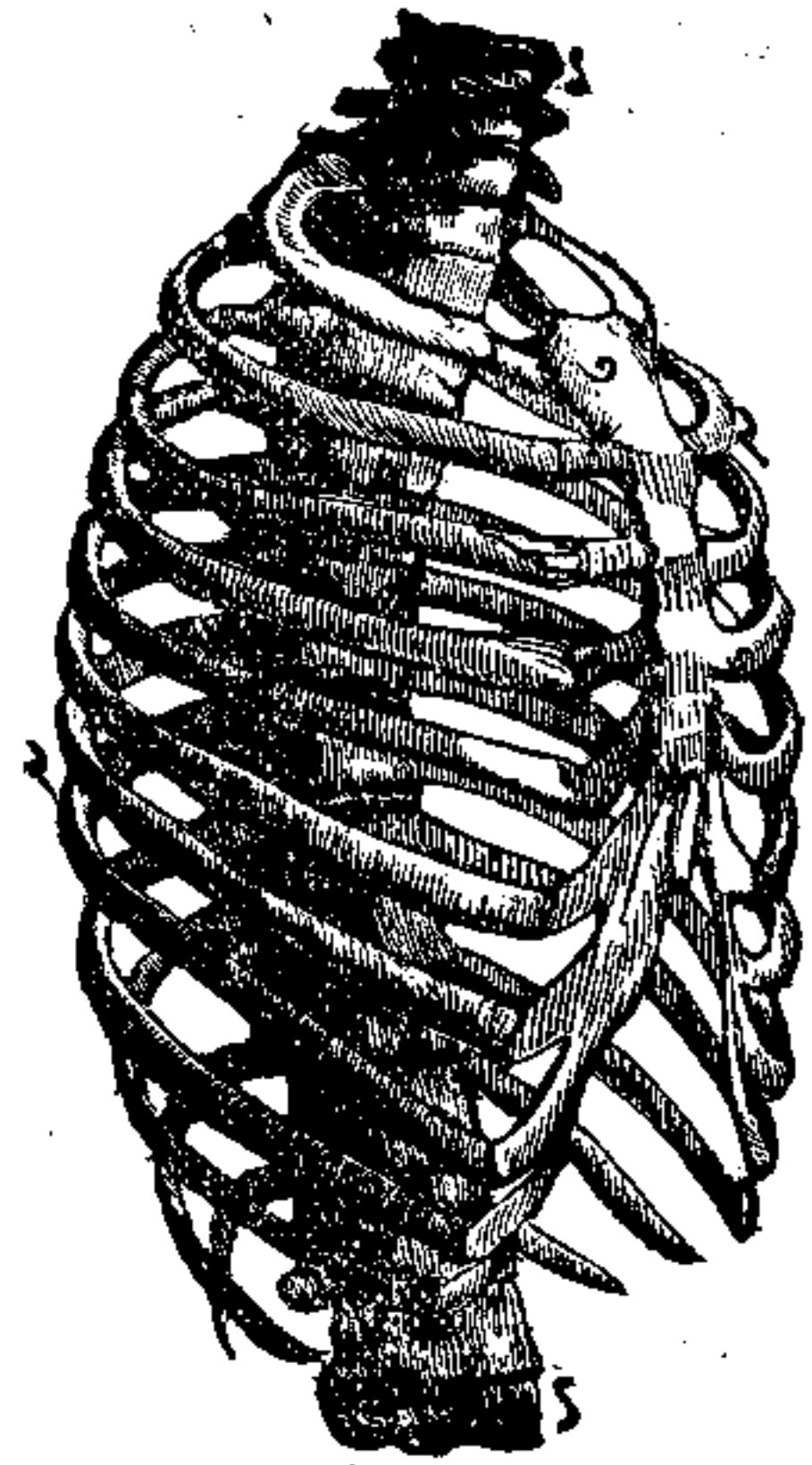
সাত যোড়ার প্রত্যেকটাই পৃথক ভাবে বুকের হাড়ের সহিত সংযুক্ত। অষ্টম, নবম ও দশম যোড়া বুকের হাড়ের সহিত মিশিবার পূর্ব্বেই পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ এই তিন যোড়ার অগ্রভাগ একত্র মিশিয়া পরে বুকের হাড়ের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। একাদশ ও দ্বাদশ যোড়া বুকের হাড় পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিতে পারে নাই। এই পাঁজরার হাড়গুলি পিঠের ও বুকের হাড়ের সহিত মিশিয়া বুকের ভিতরের যন্ত্রগুলিকে রক্ষা করিবার সুন্দর আধার গঠিত করিয়াছে। পঁজড়ার হাড়গুলি ঠিক সমভাবে না থাকিয়া নীচের দিকে একটু হেলান। এই হেলানের জন্য নিশ্বাস প্রশ্বাসের সময়ে যখন পাঁজরার হাড়গুলি উঠে নামে তখন বুকের আয়তনও বাড়ে কমে।

পাঁজরার প্রথম হাড়ের উপর ও বুকের হাড়ের সহিত কাঁধের হাড় সংযুক্ত। স্কন্ধদেশে উভয় পার্শ্বে দুইটী করিয়া হাড় আছে। একটী সম্মুখ-দিকের 'কণ্ঠাস্থি'। গলার নীচে হাত দিয়া বুকের খোলের যে প্রথম হাড়টা ধরিতে পাই সেটাই কণ্ঠাস্থি। কাঁধের পিছন দিকের চ্যাপ্টা বড় হাড়কে 'অংশফলক' বলে। 'অংসফলক' এবং 'কণ্ঠাস্থি'র সহিত বাহুর সংযোগে 'কক্ষসন্ধি' গঠিত হইয়াছে।

কোমর বা 'কটিশীর্ষে' ৫টী বিভিন্ন 'কষেরুকাস্থি' আছে। মেরুদণ্ডের শেষভাগের অর্থাৎ কোমরের নীচে পাছার মাঝখানের হাড়কে 'ত্রিকাস্থি' কহে। পাঁচটী 'কশেরুকাস্থি' পরস্পরের সহিত দৃঢ় সংযোগে একীভূত হইয়া যাওয়ায় ত্রিভুজের আকারে এই 'ত্রিকাস্থি' গঠিত। ত্রিকাস্থির কষেরুকাস্থিগুলিকে পৃথক করা যায় না। 'ত্রিকাস্থির' দুই পার্শ্বে দুই খানি অস্থিফলক দৃঢ়রূপে সংযুক্ত রহিয়াছে। ইহাদিগকে পাছার হাড়, কটিপার্শ্বের অস্থি বা 'কটিফলক' বলা যায়। বাহুদ্বয় যেমন স্কন্ধফলকের সহিত কব্জায় আবদ্ধ, পদদ্বয় ও সেইরূপ 'কটি-ফলকের' সহিত কব্জার আবদ্ধ। 'ত্রিকাস্থির' সহিত 'কটিফলক'দ্বয়ের সংযোগে তলপেট বা 'বস্তিগহ্বর' গঠিত হইয়াছে। 'বস্তিগহ্বরে' তল-পেটের যন্ত্রগুলি সুরক্ষিত রহিয়াছে। নিম্নে বস্তি-গহ্বরের চিত্র দেখ। মধ্যে 'ত্রিকাস্থি' দুই পার্শ্বে 'কটিকলক' ও তাহার সহিত উরুর হাড় সংযুক্ত রহিয়াছে। ত্রিকাস্থির নীচে চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
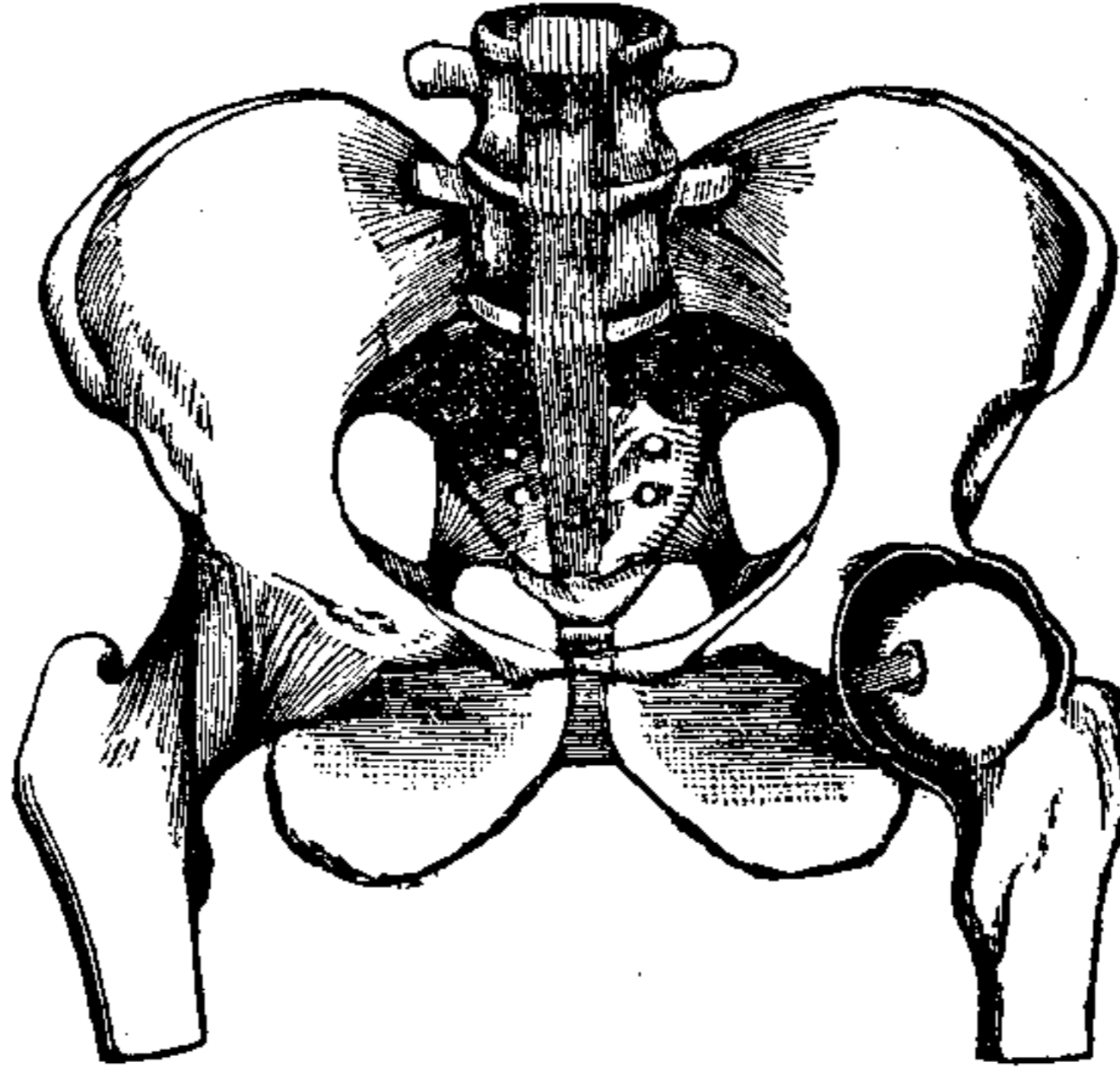
কশেরুকাস্থির ঐরূপ সংমিশ্রনে আর একটী ত্রিভুজাকার ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড আছে তাহাকে 'শিফা, (শিকড়) বা লেজ বলা যাইতে পারে। ঐ অস্থির উপাদানগুলি সংখ্যায় অধিক এবং বৃহৎ ও পৃথক ভাবে থাকিয়া পশুদিগের লেজ গঠিত হয়। মানুষের লেজ নাই। লেজের চিহ্ন মাত্র রহিয়াছে।
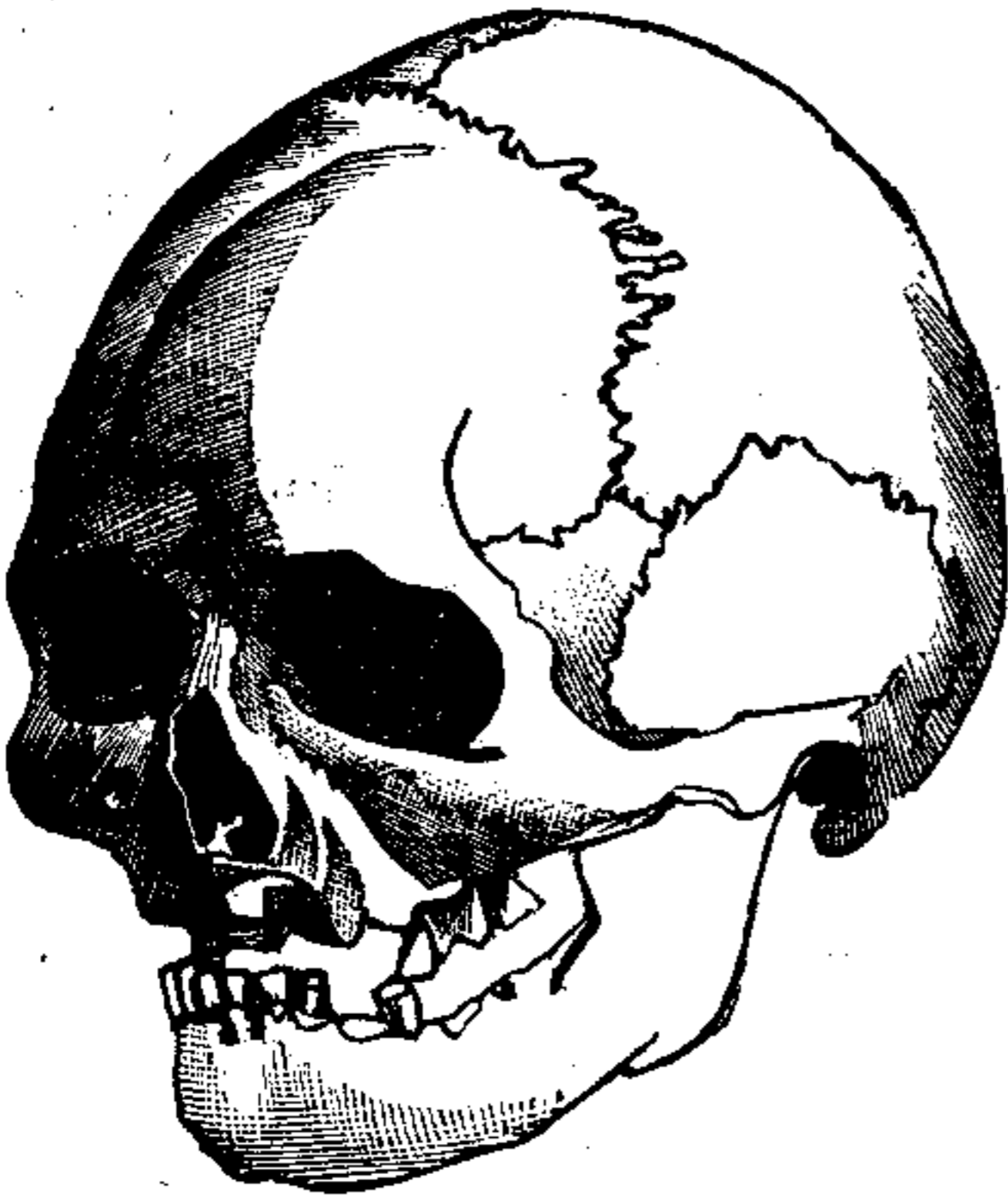
মস্তক মেরুদণ্ডের উপর স্থাপিত। মস্তকের তলদেশে বড় গোল ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্র দিয়া মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত মজ্জার সহিত মস্তিষ্কের সংযোগ আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মস্তকের দুই বিভাগ শিরোদেশ ও মুখমণ্ডল। শিরোদেশ মস্তিস্ক রক্ষার আধার। শিরোস্থির মুখ প্রদেশে দুইটী গহ্বর আছে ইহাদিগকে 'অক্ষিকোটর' বলে। এই দুই গহ্বরের মধ্যে নাসিকাবিবর রহিয়াছে। ইহার এক ছিদ্র সম্মুখে অপর ছিদ্র মুখের ভিতরে গলার কাছে। 'মুখ বিবর' তালু ও নীচের চোয়ালের মধ্যে। মুখ বিবরে জিহ্বা স্থাপিত। শিরোদেশের দুই পার্শ্বের হাড়ের ভিতরের ছিদ্রকে 'কর্ণকুহর' বলে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে মস্তিষ্ক এবং শ্বাস-নালী ও অন্ননালীর মধ্যস্থলে মুখ মণ্ডলেই ইন্দ্রিয় সকলের আড্ডা।

মাথায় অনেকগুলি হাড় আছে, সে হাড়-গুলিতে করাতের আগার মত খাঁজ কাটা আছে। হাড়গুলি সব খাঁজে খাঁজে বসান, কাযেই নাড়া চাড়া যায় না। মাথার হাড়ের যোড়গুলি এত কঠিন যে লাঠি মারিয়া হয়ত হাড় ফাটাইয়া দিতে পারা যায় তবুও যোড় খসান বড় কঠিন। মুণ্ডটা যেন গোলাকার একটী হাড়, তাহার সহিত নীচের চোয়াল কানের কাছে কব্জায় আবদ্ধএই কব্জার জন্য নীচের চোয়াল বা থুত্‌নি নামাইয়া মুখব্যাদন বা 'হা' করিতে পারি। শিরোদেশে অনেক হাড় আছে তন্মধ্যে, কপালের হাড় একটী, মূর্দ্ধার দুই পাশে দুইটী হাড়, কাণের উপর দুই পাশে দুইটী হাড়। এই হাড়কে ইংরাজিতে কালাস্থি বা জরাস্থি বলে কারণ কাল বা জরা এই খানেই প্রথমে নিজের প্রভুত্ব দেখায়, অর্থাৎ কাণের পার্শ্বের চুলগুলি সর্ব্বাগ্রে পাকে বা সাদা হয়। চোখের নীচে উচু উচু গালের দুটা হাড়। ইহাদিগকে 'হনু' বলে। নাকের নীচে উপরের চোয়ালের একটী হাড়। ইহাতে উপরের দাঁতের পাটি বসান। নীচের চোয়ালের একটী হাড়। ইহাতে নীচের দাঁতের পাটি বসান আছে। মস্তকের এই প্রধান প্রধান অস্থিখণ্ড।

কূপের-ভেক।

গভীর কূপের, নিথর-জলে, ছিল একটী ভেক,
আপন জাতি, সাঙ্গাত সাথী, ছিল না জনেক।
আপন মনে, খেল্‌তো জলে, থাক্‌তো মন সুখে,
ভয় ভাবনা, কিছুই সেতা, ছিলনাকো বুকে!
সেই কূপেরে, ভাব্‌তো ধরা, ব'ল্‌তো মুখে তাই
"এ পৃথিবীর, আমিই রাজা, আর্‌তো কেহ নাই!"
এই না ভেবে, ঘোর গরবে, উঠ্‌লো ফুলে গা!
চোক-বুজিয়ে, ভাসে জলে, ছড়িয়ে চারি পা!
সেই সময়ে, উপর হ'তে বাতাস পেটে নিয়ে,
নাম্‌লো ঘড়া, গলায় দড়া, ডুব্‌লো জলে গিয়ে।
বগ্‌-বগানীর ঘোর আওয়াজে, উঠ্‌লো মহারোল!
ভাঙ্‌লো রাজার সাধের ঘুম, শুনে গণ্ডগোল!
দেখেন চেয়ে, অদ্ভুত এক জন্তু সেথায় আসি,
গোল বাধিঁয়ে, ঢক্‌-ঢকিয়ে গিল্‌চে জলের-রাশি!
দেখে তারে, রাগের ভরে, বলেন রাজা ডেকে,
"এ পৃথিবীর আমিই রাজা, তুই এলি কো-থেকে?"
"আপন ভাল চাস্‌রে যদি, খাজানা দেরে মোরে!
"নয় এখনি দেখবি মজা, বাঁধ্‌বো ধ'রে জোরে।"
কানায় কানায় ভর্‌লো ঘড়া, থাম্‌লো গলার-ডাক।
দড়ার টানে, উপর পানে, উঠতে মারে পাক!
তাই না দেখে, দ্বিগুণ রেগে, রাজা মহাশয়
এক লাফেতে, চড়েন মাথে, রাঙ্গিয়ে আঁখি দ্বয়!
যেমন চড়া, অমনি ঘড়া, উঠ্‌লো ক'রে জোর!
ভাবেন রাজা, বড়ই মজা, বাহণ হোল মোর!
খানিক পরে, থাম্‌ল ঘড়া, নাম্‌লো মাটির গায়,
চোক-বুজিয়ে, বলেন রাজা, "এলেম রে কোথায়?"
যেমন বলা, ধাক্‌কা খেয়ে, পড়েন দূরে গিয়ে!
তাকিয়ে দেখে, বলেন ভয়ে, "কোথায় এলি নিয়ে?"
দেখেন নিজে, "বাহণ-হারা", কূপের ধারে প'ড়ে!
যাচ্ছে বাহণ, সোণার বরণ, কাহার কোলে চ'ড়ে!
এই না দেখে, বলেন বাবা একি বিষম দেশ?
আকাশ ঠেকে, লোকের মাথে, নাইকো যেন শেষ।
এই না ব'লে, ছোটেন রাজা, দেখেন আগে তাঁর,
বসে আছেন, বেঙেরদল, ঘিরে ডোবার ধার!
দেখে তাদের, তফাৎ হ'তে দাঁড়িয়ে রাজার মত!
ফুলিয়ে গলা, বলেন "শোন বেঙ র'য়েছ যত
আস্‌চি আমি আকাশ হ'তে, বেঙের রাজা হ'য়ে!
তোমরা সবে, চাকর হবে, দিলেন বিধি কয়ে!"
একটী বুড়ো চতুর বেঙ, থাকতো সেই দলে,
দেখেই তারে, চিন্‌লে ভাল, "কূপের-বেঙ" ব'লে!
সেই কথাটী, কাণের কাছে ব'ল্‌লে সবাকার!
কল্যে খানিক সবাই মিলে, কি যুক্তি একবার!
তার পরেতে দু-হাত তুলে, প্রণাম ক'রে কয়—
"আসুন প্রভু বেঙের-রাজা, আসুন মহাশয়!"
ব'লে সবাই, এগিয়ে এসে, হুলুর-ধ্বনি দিয়ে,
বরণ ক'রে, খুব আদরে, চ'ল্‌লো তারে নিয়ে!
ভাবেন রাজা, "বড়ই মজা, একি চমৎকার!
এক কথাতে হ'লেম রাজা, কি বুদ্ধি আমার!
ছিলাম কোথা, কূপের তলে, এলেম কোথা চ'লে!
বুদ্ধি থাক্‌লে, না হয় কিবা, আপনি কপাল ফলে!
এইরূপেতে, দু-দিন গেল আছেন রাজা সুখে,
শেষ পরেতে, শোনেন তিনি, জনেক দূতের মুখে—
"আস্‌চে কত বেঙের সেনা, আর এক রাজার!
মার্‌বে সবে, এদেশ নেবে, ক'র্‌বে ছারেখার!"
এই কথাতে, ভয়ে তাঁহার চম্‌কে ওঠে প্রাণ!
বলেন তবে, "হায় কি হবে, লুকাব কোন-খান?"
তাল ঠুকিয়ে, কয় সকলে, "ভয় কি মহাশয়!
ধ'র্‌ব খাঁড়া, মার্‌বো খাড়া, ক'র্‌বো শত্রুজয়!"
এই না বোলে, সবাই মিলে, ক'সে কোমর বাঁধে!
বিষম মোটা, মাসের ডাঁটা, ক'র্‌লে লাঠি কাঁধে!

বেঙের-ছাতা ঢাল হলো সে, খাঁড়া খড়ের-ডগা!
তাই না দেখে, ঠক্-ঠকিয়ে, কাঁপ্‌চে রাজার-গা!
এমন কালে, পেছন হ'তে, শত্রু সকল এসে—
বিষম জোরে প'ড়্‌লো ঘাড়ে, যুদ্ধ লাগ্‌লো শেষে!
লাঠির ঘায়ে, চীৎপাতিয়ে, পড়্‌লো কত ব্যাঙ্‌!
খাঁড়ার চোটে, পড়্‌লো কেহ, ছড়িয়ে চারি ঠ্যাঙ্‌!
প্রাণের ভয়ে, পলায় রাজা, ফিরে না তাকায়!
"মার বেটাকে", ব'লে সবাই, পাছে পাছে ধায়!
বসিয়ে দিলে, দু-দশ লাঠি, রাজার পিঠের পরে!
পিঠ্ নুইয়ে, ছোটেন রাজা, দু-চোকে জল ঝরে!
কূপের ধারে, দৌড়ে গিয়ে, দিলেন তাতে ঝাঁপ!
খিল্-খিলিয়ে, হাস্‌লো সবে, ঘুচলো সকল পাপ!
মরার মতন, ছিল য'-জন, তারাও উঠে হাসে!
সবাই মিলে, ডোবার জলে, গা-দুলিয়ে ভাসে!
কূপের রাজা, কূপের মাঝে, বিনিয়ে কেঁদে বলে—
"মিথ্যা-কথার, ধূর্ত্ত-পনার, শাস্তি উচিত দিলে।"

রামায়ণ ও মহাভারত।

মনুষ্যমাত্রেরই অন্তরে একটি শক্তি আছে যদ্দারা কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের জ্ঞান হয়। যে কাযটি করিলে ভাল অর্থাৎ হিত হয় তাহাকে কর্ত্তব্য কহে; আর যাহা করিলে মন্দ অর্থাৎ অহিত হয় তাহাকে অকর্ত্তব্য বলে। প্রত্যেক কার্য্য করিবার পূর্ব্বক্ষণেই কে যেন মনের মধ্য হইতে বলিয়া উঠে এটি কর, কারণ ইহা ভাল, অথবা এটি করিও না; কারণ ইহা ভাল নহে। মনে কর তুমি বেড়াইতে যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলে যে একজন প্রতিবেশীর বাগানে বড় পেয়ারা পাকিয়া সুগন্ধে চারিদিক আমোদ করিয়াছে। দেখিবা মাত্র ঐ পেয়ারা খাইতে তোমার বড় ইচ্ছা হইল। তুমি তৎক্ষণাৎ ঐ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া পেয়ারা গাছের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলে কিন্তু তখনই তোমার বুক কাঁপিতে লাগিল; মুখ শুকাইতে লাগিল; অন্তর হইতে কে যেন বলিয়া দিতে লাগিল "এ কার্য্যটি অন্যায়।" ইহা করিলে লোকে চোর বলিবে ও ইহাতে অহিত হইবে। যে শক্তি দ্বারা এই প্রকার ভাল মন্দ, হিতাহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের জ্ঞান হয় তাহার নাম বিবেক। বিবেক সকল সময়ে আমাদিগকে কর্ত্তব্য পরায়ণ হইতে বলিতেছে। যদি তাহার বাক্য পুনঃ পুনঃ অবহেলা করতঃ তাহাকে একেবারে নিস্তেজ না করি তবে আমরা এই বিবেক শক্তির সাহায্যে অনায়াসে স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য শুনিয়া বুঝিয়া লইতে পারি।

সাধারণতঃ আমাদিগের কর্ত্তব্য গুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা:—

১। ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য:—

২। আমাদিগের নিজের প্রতি কর্ত্তব্য:—

৩। অন্য মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণীর প্রতি আমাদিগের কর্ত্তব্য। ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভালবাসা ও ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা করা। তিনি সুখ বা দুঃখ যখন যাহা দিতেছেন তাহা প্রশান্তচিত্তে গ্রহণ করত তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া এবং ভবিষ্যতের জন্য তাহার প্রতি ঐকান্তিক-মনে নির্ভর করা; এইগুলি ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য।

আমরা যতগুলি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি তন্মধ্যে 'মা' এই শব্দটি সর্ব্বাপেক্ষা মধুর। মা বলিলে আমাদিগের মনে ভালবাসা, ভক্তি, আনন্দ একেবারে উথলিয়া উঠে। পাঠক তুমি কি তোমার জননীকে বাড়ীতে রাখিয়া বিদেশে বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে গিয়াছ? তোমার অন্তরের দিকে একবার দেখ দেখি। 'মা' এই শব্দটি উচ্চারণ করিবা মাত্র সেই স্নেহময়ী জননীর প্রশান্ত মূর্ত্তি তোমার হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যদিও তাঁহা হইতে তুমি বহুদূরে বাস করিতেছ, তথাপি তোমার বোধ হইতেছে যেন তাঁহারই ক্রোড়ে বসিয়া আছ। যত দিনের কথা তোমার মনে আছে তত দিনের মধ্যে তোমায় তিনি যত ভাল বাসা দেখাইয়াছেন সেইগুলি সমুদয় তোমার মনে হইয়া তুমি একেবারে কৃতজ্ঞতা রসে অভিষিক্ত হইতেছে। তখনই তোমার ছুটিয়া তাঁহার নিকট যাইতে ও সর্ব্বদা তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা হইবে। ইহাকেই প্রাণের সহিত ভালবাসা ও ভক্তি করা কহে। ঈশ্বরের প্রতি এই প্রকার ভালবাসা স্থাপন করা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য।

এই সংসারে চিরদিন কাহারও সমান ভাবে যায় না। আজ যিনি রাজা কাল তিনি পথের ভিকারী। আজ যিনি সুস্থকায় কাল তিনি রুগ্ন-শয্যায় শায়িত। যখন যে প্রকার অবস্থায় পড়িতে হয় তখন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া তজ্জন্য ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য। তোমার পিতা প্রভৃত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। তাহাতে তুমি পরম-সুখে প্রতিপালিত হইয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করিতেছ। এই জন্য কৃতজ্ঞ হইতে পার। কারণ সুখে থাকিয়া সেই সুখ লাভের জন্য ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া সহজ কিন্তু হঠাৎ কোন অনিবার্য্য কারণে তোমার পিতার অবস্থা হীন হইয়া পড়িল; তুমিও সেই সঙ্গে সঙ্গে কষ্টের মুখে পতিত হইলে। তখন তোমার এই বলিয়া সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, যে অবস্থায় তুমি পতিত হইয়াছ তদপেক্ষা আরও হীন-অবস্থাপন্ন হইতে হয় নাই। সুস্থকায় ও সবল শরীর থাকিয়া যে ব্যক্তি দিনান্তে কষ্টে স্বীয় উদর পূরণ করে তাহার এই কারণে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে তাহার পরিশ্রম করিবার উপযুক্ত অঙ্গ প্রতঙ্গ সকল আছে। যে ব্যক্তির একটি চক্ষু বা একখানি পা নাই তাহা-দিগের এই বলিয়া কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে তাহা-দিগের অপর অঙ্গগুলি সুস্থ ও ব্যবহারোপযোগী রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকে সুখের সময় একবার ভুলিয়াও ঈশ্বরকে স্মরণ করেন না, দুঃখে পড়িল ত আর কথাই নাই। কোন বালক অশিষ্ঠ ব্যবহার করিলে মাতা তাহাকে প্রহার করেন অমনি সেই বালক মা বলিয়া কান্দিয়া উঠে। তাহার নির্ভর জননীর উপর। সে জননী ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না। মা রাগত হইয়াছেন তখনি স্বান্তনা জন্য সন্তান মায়ের নিকট প্রার্থনা করে। মাকেই ডাকে এবং মাতা আসিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লয়েন। তুমি প্রাতে উঠিয়া লেখা পড়া কর, পরে আহার কর, পরে বিদ্যা-লয়ে যাও; আবার বাটী আইস, আবার আহার কর খেলা কর, পাঠ কর, দিন ফুরাইয়া যায় রাত্রে অকাতরে নিদ্রা যাও। কখনও ভাব না যে আহার কে দিবে বা কল্য কাহার কাছে খাবার পাইব। জননীর উপর এমনি নির্ভর আছে যে সময় মত আহার ও প্রয়োজন মত অন্যান্য দ্রব্য তিনি সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। আগামী কালের জন্যও তাঁহারই প্রতি নির্ভর রহিয়াছে তোমার কোন ভাবনা নাই। ঈশ্বরের প্রতি এই প্রকার নির্ভর করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

যে সকল কার্য্য দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাকে প্রলোভন হইতে মুক্ত রাখিয়া নিজের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি করিতে পারে তাহাই নিজ সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য। যে সকল রিপুগণ সর্ব্বদা আমাদিগকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া পাপের দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে তাহাদিগকে দমন করিবার নাম আত্মনিগ্রহ। আমরা ইতিহাস পাঠ করিয়া [illegible]য়ান, নেলসন, ওয়াসিংটন, গারিবলডী, রণজিৎ সিংহ প্রভৃতিকে অত্যন্ত বীর বলিয়া ম[illegible] করি। বাস্তবিক তাঁহাদিগের বীরত্ব এ[illegible] কারের। কিন্তু নিজের মনের ভিতরে যে স[illegible] সর্ব্বদা বাস করিতেছে তাহাদিগকে যিনি দমন [illegible]তে পারিয়াছেন তাঁহার বীরত্ব অন্য প্রকারের, আমাদিগের বিবেচনায় শেষোক্ত ব্যক্তিই প্রকৃত বীরপুরুষ। সুতরাং নিজের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আত্মনিগ্রহই প্রধান। এই শ্রেণীর দ্বিতীয় প্রকারের কর্ত্তব্যের নাম আত্মনির্ভর। এইটি শরীর ও মনের উন্নতির অত্যন্ত সহকারী। যত দুঃখীর সন্তান পরিণামে বড়লোক হইয়াছেন তাহা কেবল আত্মনির্ভরের গুণে। এই প্রকার অনেক বড় লোকের জীবন চরিত ইতিপূর্ব্বে সখায় প্রকাশিত হইয়াছে।

আবার অপরের প্রতি কর্ত্তব্য অর্থাৎ আমি ভিন্ন এই পৃথিবীতে যত মনুষ্য আছে তাহাদের সম্বন্ধে আমার কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য এবং এই জগতে যে সকল ইতর প্রাণী আছে তাহাদের সম্বন্ধেই বা আমার কি প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ইহাই তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

"মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু য পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥"

এই মহাবাক্যে যে নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে তদনুসারে চলিলে অনেক বিষয়ে কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়া যায়।

এ পর্য্যন্ত আমরা যাহা লিখিলাম তাহার মর্ম্ম এই যে আমাদের কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কর্ত্তব্য আছে এবং আমরা যখন কোন কার্য্য করিতে যাই তখন বিবেক আসিয়া আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে এইটি ভাল, ইহা কর; আর এইটি মন্দ, ইহা করিও না। তবে এমন সুবিধা থাকিতে কেন আমরা কেবল যে কার্য্য গুলি ভাল তাহাই করি না এবং কেনই বা আমরা ভাল মন্দের প্রভেদ করিয়া উঠিতে পারি না। অনেক সময় যাহা ভাল বলিয়া করি, তাহা মন্দ হইয়া যায়। এই সম্বন্ধে এইক্ষণ এই পর্য্যন্ত বুঝিয়া রাখ যে নিয়ত অবহেলা করিতে করিতে বিবেক শক্তির ধ্বনি এত মৃদু হইয়া পড়ে এবং আমাদিগের মনে রিপুজনিত ইচ্ছার এত অধিক বল হয় যে, আমরা ঐ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া অনেক সময়ে বিপথগামী হই। বালক বালিকাদিগের অনুকরণ প্রিয়তা ও অনুকরণ করিবার ক্ষমতা অত্যন্ত বলবতী। তোমাদের বাটীর ছোট খোকাকে কোলে করিয়া সর্ব্বদা ঝি বলিতেছে খোকা তাই দেও তাই দেও অমনি খোকা তাই দিল। একবার শিখিবা মাত্র যাই বলিবে খোকা তাই দেও অমনি খোকা তাই দিবে। এই প্রকার শিশুরা বাবা দাদা মা প্রভৃতি সমুদয় শব্দ ও নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী করিতে শিক্ষা করে। খোকার সম্মুখে তুমি মুখ বিকৃত কর সে তখনি তাহাই শিক্ষা করিবে। এই প্রকারে বালকেরা সর্ব্বদা যাহাদিগকে দেখে, সর্ব্বদা যাহাদিগের সহিত মেশে, সর্ব্বদা খেলা করে তাহাদিগের নিকট হইতে ভাল মন্দ উভয়ই শিক্ষা করে এবং এই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মন গঠিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বালকগণ যাহাতে সহজে স্বীয়

কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারে এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ হয় এই জন্য সর্ব্বাদাই সাধু দৃষ্টান্ত তাহাদিগের দৃষ্টিগোচর হওয়া কর্ত্তব্য। উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণ অধিকতর শিক্ষাপ্রদ এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত। যে সকল বড় লোকের জীবন-চরিত পাঠ করি তাহাতে উপকারও আছে অপকারও আছে। যাঁহার জীবন-চরিত পাঠ করিতেছি তাঁহার যে সকল সদ্‌গুণ থাকে তাহা যেমন শিক্ষা করা যায় এবং অনুকরণ করিতে ইচ্ছা হয় তেমনি তাঁহার যে সকল অসদ্‌গুণ অর্থাৎ দোষ থাকে তাহা দোষ বলিয়া ধারণা না হইয়া তাহাও অনুকরণ করিতে ইচ্ছা হয়। আক্ষেপের বিষয় এই যে গুণ অপেক্ষা দোষ সহজে অভ্যস্ত হয় ও অনেকে গুণ অনুকরণ করিতে গিয়া কেবল দোষ গুলিই পাইয়া বসেন। এই কথার একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা ইংরাজদিগকে দেখিয়া তাহাদিগের সদ্‌গুণ রাশিতে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অনুকরণ করিতে গিয়া তাহাদিগের প্রায় যতগুলি দোষ আছে তাহারই অধিকারী হইয়াছি কিন্তু তাহাদিগের উদ্যমশীলতা, অধ্যবসায়, সাহস, বীর্য্য, দেশহিতৈষনা স্বজনের উপচিকীর্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণ কয় জন ভারতবাসী শিখিতে পারিয়াছেন? এই জন্যই বলা হইয়াছে যে বড় লোকের জীবন-চরিত পাঠে উপকারও আছে অপকারও আছে। বালক বালিকাদিগকে প্রকৃত কর্ত্তব্য শিক্ষা দিবার জন্য তাহাদিগকে অনুকরণ করিবার জন্য তাহাদিগের হস্তে একটি আদর্শ চিত্র দেওয়া কর্ত্তব্য। এই আদর্শ চিত্র যাঁহার, তাঁহাকে সকলে দেবতা বলিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে।

হিন্দুদিগের পুরাণাদিতে যে সকল আদর্শ চিত্র আছে তাঁহাদিগকে হিন্দুরা সাক্ষাৎ নারায়ণের অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। খৃষ্টানদিগের আদর্শ চিত্রকেও তাঁহারা দেবতা বলিয়া মানেন এবং মুসলমান বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মালম্বীরাও তদ্রূপ।

রামায়ণ ও মহাভারতে এই প্রকার কয়েকটি আদর্শ চিত্র আছে তাহা সর্ব্বদা বালকদিগের চিত্তপেট অঙ্কিত থাকা কর্ত্তব্য এবং ঐ সকল চিত্রানুসারে বালকদিগের চরিত্র গঠিত হইলে তাহারা প্রত্যেকেই দেবতুল্য হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। এই কারণেই হয় হিন্দুরা বাল্যকাল হইতে রামচন্দ্র প্রভৃতির গুণানুবাদ শ্রবণে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে অনেক স্থানে প্রত্যহ রামগুণগান ও রামচন্দ্রের [illegible]াপন করত তাহা দেবতা জ্ঞানে নিত্য পূজ[illegible] থাকে। রামায়ণ ও মহাভারতে যে সক[illegible] বর্ণিত আছে তাহাদিগের প্রতি হিন্দুদিগের অপার ভক্তি রহিয়াছে এই ভক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিবার চেষ্টা করা আমরা নিতান্ত অন্যায় বলিয়া মনে করি। রামচন্দ্র বলিয়া কেহ থাকুন বা না থাকুন সে কথায় তোমার আমার কি ক্ষতি। আমরা দেখিতেছি যে রামায়ণ নামক একখানি গ্রন্থে রামচন্দ্র নামক এক ব্যক্তির চরিত্র বর্ণিত আছে। ঐ চরিত্র, মনুষ্যের যতগুলি কর্ত্তব্যের কথা বলা হইয়াছে তত্তাবতের আদর্শ স্বরূপ; আমরা আরও দেখিতেছি যে লক্ষ লক্ষ লোক সেই চরিত্রকে দেব জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেছে এবং তাহাকেই জীবনের আদর্শ মনে করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। রামায়ণ ও মহাভারতে যে সকল আদর্শ চরিত্রের বর্ণনা আছে আমরা এই প্রবন্ধে কেবল তাহাই দেখাইব। আমরা রামায়ণ হইতে আরম্ভ করিব।

ক্রমশঃ

সখা
নবম ভাগ। ১০ম সংখ্যা।
অক্টোবর, ১৮৯১।

বিবিধ।

বৈজ্ঞানিক-কৌশল।—বিজ্ঞান বলে বর্ত্তমান যুগে কত অদ্ভুত ও প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে! রেলওয়ের গাড়ী, টেলিগ্রাফের তার, বাষ্পীয় পোত প্রভৃতি বিজ্ঞান-কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে; এই সকল দ্বারা মানব সমাজের কত উপকার সাধিত হইতেছে। সম্প্রতি আর এক অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা এতকাল জানিতাম, প্রাকৃতিক ক্রিয়াতেই কেবল আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। সম্প্রতি বিজ্ঞানের সাহায্যে বৃষ্টিপাত করিয়া অনাবৃষ্টির অনিষ্টকারিতা নিবারিত হইতেছে! উত্তর আমেরিকাতে যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত টেক্সাস নামক প্রদেশে বিগত ২৬এ আগষ্ট তারিখে রাত্রি ১০টার সময় বেলুনে চড়িয়া আকাশে উঠিয়া কতকগুলি ডিনামাইট্ ছোড়া হয়। ডিনামাইট্ বারুদ পূর্ণ এক প্রকার গোলা বিশেষ। আকাশের যে স্থানে সেই ডিনামাইট ছোড়া হইয়াছিল, চতুঃপার্শ্ব হইতে তথায় বায়ুর সমাগম হইয়াছিল। সেই বায়ুর সহিত সংমিশ্রিত জলীয় বাষ্প শীতল হইয়া পরদিন বেলা ৩টার সময় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। এই সংবাদ পাইয়া মান্দ্রাজের অন্তর্গত কোদাপার কালেক্টরও ডিনামাইটের সাহায্যে বৃষ্টিপাত করিয়াছেন। মান্দ্রাজ প্রদেশে অনাবৃষ্টির দরুণ বৎসরাধিক কাল হইতে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে; তথায় বৃষ্টিরজলের নিতান্ত প্রয়োজন। কোদাপার কালেক্টর সাহেব ২৪এ সেপ্টেম্বর এক পাহাড়ের উপর হইতে প্রথমত একখানা ঘুড়ি উড়াইয়া দেন,—ঘুড়িখানা ৮ শত ফুট উচ্চে উঠিয়াছিল, সেই ঘুড়ির সূতাতে আর একখানা ঘুড়ি ও কয়েকটা ডিনামাইট বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এরূপ করিয়া ডিনামাইটে আগুন দেওয়ার বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, প্রথম ঘুড়ির নিকট যাইয়া তাহা ফাটিয়া যায়। সেদিন রাত্রিতে অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছিল। পরদিনও আবার এই উপায়ে আকাশে ডিনামাইট ছোড়ার প্রয়াস হইয়াছিল,—কিন্তু বাতাসের জোর অধিক হওয়াতে ঘুড়ি ৭৫০ ফুটের উপর উঠিতে পারে নাই। একটা উচ্চ পাহাড়ের উপর হইতেও ডিনামাইট ছোড়া হইয়াছিল। কিন্তু সেদিন একেবারেই বৃষ্টিপাত হয় নাই। ডিনামাইট না থাকাতে আর তাহা ছোড়া হয় নাই। ২৭এ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। অনাবৃষ্টির দরুণ ভারতের এক প্রদেশ না এক প্রদেশে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে,—যদি এই উপায়ে বৃষ্টিপাত হয়,

তবে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে দেশের লোক দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

* *
*

পতি-প্রেম।—আমাদের দেশের পুরাকালের সীতা দেবী বনবাসে রামচন্দ্রের সহগামিনী হইয়াছিলেন, দ্রৌপদী পঞ্চপতির সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন। এখন আর ওরূপ পতি-প্রেমের দৃষ্টান্তের কথা সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় না। সম্প্রতি ইউরোপের অন্তর্গত রুষদেশ হইতে এক রমণীর অদ্ভুত পতি-প্রেমের সংবাদ আসিয়াছে। বোরিস্ প্লিয়াস্কিন নামে রুষিয়ার এক সংবাদপত্র সম্পাদক মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের উপর কর্তৃপক্ষদিগের ঘোরতর অত্যাচার সম্বন্ধে এক তীব্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই অপরাধে তাঁহার সাইবেরিয়াতে চির নির্ব্বাসন দণ্ড হয়—এবং ১০ বৎসরকাল খনিতে কাজ করিবার আদেশ হয়। দুই বৎসর হইল, তিনি এনা মাইকেলোভ্না নাম্নী বিংশতি বর্ষীয়া এক রূপসী রমণীর পাণি গ্রহণ করেন। এই নিদারুণ দণ্ডের কথা শুনিয়া এনা মস্তিস্ক-জ্বরে আক্রান্ত হইলেন,—তাঁহার স্বামী সাইবেরিয়াতে প্রেরিত হইলেন। ক্রমাগত ৩ মাস কাল রোগে ভুগিয়া তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন,—তখন সাইবেরিয়াতে যাইয়া স্বামীর সহিত মিলিত হইবার জন্য সংকল্প করিলেন। মস্কো হইতে তাঁহার স্বামীর নির্ব্বাসন স্থান ৪ হাজার ৫ শত মাইল দূরে;—সাইবেরিয়ার সেই তুষার রাশির উপর দিয়া যাইতে হইবে। তাঁহার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহাকে এই সংকল্প পরিত্যাগ করিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন,—পতি-প্রাণা সতীর প্রাণ তাহাতে নিরস্ত হইল না। তিনি দারুণ শীতের প্রারম্ভে ডিসেম্বর মাসে স্বামীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তিন দিন রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিয়া সাইবেরিয়ার সীমাতে উপনীত হইলেন,—এখন বরফের উপর দিয়া চলিতে হইবে, ডাকগাড়ী ভিন্ন অন্য যান নাই। তিনি দিবা রাত্রি তাহাতে চড়িয়া যাইতে লাগিলেন,—টোমাস্ক হইতে ইর্কাটাস্ক পর্য্যন্ত ১২ শত মাইল ঘোড়াতে চড়িয়া গমন করিয়াছিলেন—তুষারাঘাতে তাঁহার লাবণ্য হীনশ্রী, পথভ্রমে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল; তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। কিরূপে তিনি সত্বর স্বামীর সহিত মিলিত হইবেন, কেবলই তাঁহার এই চিন্তা। গাড়ী শীঘ্র শীঘ্র পরিচালন জন্য গাড়োয়ানদিগকে অনুনয় বিনয় ও ঘুষপ্রদান করিতেন, দ্রুতগামী অশ্বপ্রদান জন্য পোষ্টমাষ্টারদিগের অনুগ্রহ ভিক্ষা মাগিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এইরূপে অনিদ্রা, অনাহারে, ও তুষারাঘাতে ক্লিষ্ট হইয়া অবশেষে নির্দ্দিষ্ট স্থান নর্টচিন্স্কে উপনীত হইলেন। প্লিয়াস্কিন কোন্ খনিতে কাজ করেন, তাহা জানিবার জন্য তখন তিনি ব্যগ্র হইলেন; অনেক কষ্টের পর খনির কর্তৃপক্ষদিগকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া তাহা জ্ঞাত হইলেন। কিন্তু আর এক অন্তরায় উপস্থিত হইল;—তাঁহার সেই খনিতে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। তখন সেই স্থানের খনির ইন্স্পেক্টরের শরণাপন্ন হইলেন। অনেক অনুনয় বিনয় ও অর্থ প্রদান করিয়া জানিতে পারিলেন,—খনির অভ্যন্তরে ঠিক কোন্ স্থানে তাঁহার স্বামী কাজ করেন। তারপর তিনি একদিন গভীর নিশীথে প্রহরী ও ওভারসিয়ারদিগের অজ্ঞাতে খনিতে অবতরণ করিবার গর্ত্তের মুখে উপনীত হইলেন। তথায় একটা ঝুরি দেখিতে পাইয়া অবতরণ করিবার কলে তাহা লাগাইয়া খনির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার মনে অন্য কোন চিন্তা

ছিলনা, কিরূপে স্বামীর নিকটবর্ত্তী হইবেন কেবল এই চিন্তাতেই তাঁহার হৃদয় মন পূর্ণ ছিল; তাই তিনি এই দুঃসাহসিক কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। খনির ভিতর অবতরণ করিয়া দেখেন, অদূরে মিট মিট করিয়া একটী আলো জ্বলিতেছে, তিনি সেই আলোর দিকে ছুটিয়া গেলেন। তথায় স্বামীকে জীর্ণ কায় ও বিবর্ণ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া "বোরিস্" "বোরিস্" বলিয়া গলা জড়িয়ে ধরিলেন। প্লিয়াস্কিন স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় প্রাণের প্রিয়তম পত্নীকে বাহুপাশে বক্ষে ধারণ করিলেন। তখন তাহাদের কি গভীর আনন্দ! কিন্তু তাঁহাদের সেই আনন্দ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। প্রভাতে ইন্স্পেক্টর পর্য্যবেক্ষণে আসিয়া দেখেন, একটা ঝুড়ি নাই;—খনিতে অবতরণ করিয়া দেখেন, প্লিয়াস্কিন আর এনা পরস্পরের আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইয়া উন্মত্তের ন্যায় কখন হাসিতেছেন কখন কাঁদিতেছেন। ইন্স্পেক্টর প্লিয়াস্কিনকে খনির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়া, এনাকে এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিবার জন্য প্রহরীদের উপর আজ্ঞা প্রচার করিলেন। রাজ-আদেশে অপরাধীদিগের আত্মীয় স্বজনদিগের তাহাদিগের নিকটে কিংবা নির্ব্বাসিত প্রদেশে বাস করিবার বিধি নাই। এনাকে ইর্কটাস্কে প্রেরণ করা হইল। তিনি তথায় আসিয়া বন্দী হইলেন,—তাঁহার আত্মীয় স্বজনদের প্রার্থনানুসারে অবশেষে তাঁহাকে মস্কোতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেওয়া হইয়াছে। এই কি অপূর্ব্ব পতি-প্রেমের দৃষ্টান্ত নহে?

* *
*

স্মৃতিচিহ্ন।—ঢাকাজেলার অন্তর্গত জয়দেবপুরের রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে ঢাকা কলেজে মাসিক দশ টাকার একটী বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ঢাকা কলেজিয়েট্ স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে একজন প্রবেশিকা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া এফ, এ পরীক্ষার জন্য পড়িবার সাহায্যার্থ এই বৃত্তি পাইবে। রাজা পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত এই বৃত্তির টাকা মাসে মাসে কলেজের অধ্যক্ষের হাতে নগদ দিবেন। তৎপর ৩ হাজার টাকা এককালীন প্রদান করিবেন; তাহার সুদ হইতে বৃত্তির টাকা প্রদত্ত হইবে।

*
* *

শোক-সংবাদ।—আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের সখার লেখক স্বর্ণলতা-প্রণেতা বাবু তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পক্ষাঘাত রোগে কিছুদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে তাঁহার লিখিত বিধিলিপি, যাহা সখায় মাসে মাসে বাহির হইতেছিল, তাহা আমরা শেষ করিতে পারিলাম না।

বাঙ্গালার শেঠ বংশ।

সখার পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে যাহারা বাঙ্গলার ইতিহাস পড়িয়াছ, তাহারা সকলেই জগৎশেঠের নাম বিশেষরূপ জ্ঞাত আছ। যে সময় সেরাজউদ্দৌলার অত্যাচারে সমস্ত বাঙ্গালা ভয়ে কাঁপিতেছিল, যে সময় ইংরাজেরা ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে প্রভুত্ব স্থাপনের পথ পরিষ্কার করিতেছিলেন, যে সময় গৃহস্থের ধন, প্রাণ, মান, পথিকের জীবন দস্যুভয়ে নিরূপদ্রব ছিল না, সেই সময়

মুরশিদাবাদে শেঠবংশ সম্পদে ও সম্ভ্রমে ভারতবর্ষে অদ্বিতীয় ছিল। এই শেঠবংশের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব বলিয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

অনেক বালকের মনে ধারণা আছে—জগৎশেঠ বলিতে একজনের নাম বুঝায়। জগৎ ব্যক্তির নাম, শেঠ—বংশের উপাধি; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। জগৎশেঠ সমস্তটাই বাদশাহ প্রদত্ত উপাধি। আজকাল যেমন গবর্ণমেণ্টে C. I. E. প্রভৃতি উপাধি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের উপর অজস্র বর্ষণ করিতেছেন—সে কালেও বাদসাহ বা নবাব রাজ-কর্ম্মচারিদিগের উপর—রায়, মজুমদার, মুন্সী, বক্সী প্রভৃতি এবং সম্ভ্রান্ত প্রজাবর্গের উপর রাজা, মহারাজা, উপাধি বিতরণ করিতেন। জগৎশেঠও সেইরূপ উপাধি। যাহা হউক এই বংশের সাধারণ-ভাবে একটু বিবরণ লিখিবার পূর্ব্বে, জগৎশেঠের পূর্ব্বপুরুষ হইতে, বর্ত্তমান কালে তাঁহার বংশীয় উত্তরাধিকারীর নাম লেখা গেল।

১। হরিনন্দ সাহো
২। মাণিকচাঁদ শেঠ (পুত্র)
৩। ফতেচাঁদ জগৎশেঠ (পোষ্যপুত্র)
৪। মহাতাপচাঁদ জগৎশেঠ (প্রপৌত্র)
৫। খোশালচাঁদ জগৎশেঠ (পুত্র)
৬। হরকচাঁদ জগৎশেঠ (পোষ্যপুত্র)
৭। ইন্দ্রচাঁদ জগৎশেঠ (পুত্র)
৮। গোবিন্দচাঁদ জগৎশেঠ (পুত্র)
৯। বিষ্ণুচাঁদ শেঠ (পিতৃব্য)
১০। কৃষ্ণচাঁদ শেঠ (পুত্র)
১১। গোলাপচাঁদ শেঠ (পুত্র)।

বাঙ্গালার শেঠ বংশীয়েরা রাজপুত জাতীয়। কলিকাতার ধনী সওদাগরের অধিকাংশই মাড়োয়ারী। এই মাড়োয়ারী সওদাগর ও বাঙ্গালার শেঠেরা একই জাতীয়। শেঠেরা জৈনধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদের আদি বাসস্থান নাগর। নাগর, যোধপুর রাজ্যের একটী প্রসিদ্ধ নগর। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে হরিনন্দ সাহো নামক জনৈক মাড়োয়ারী, অর্থ উপার্জ্জনের বাসনায়, জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালায় আগমন করেন। ইনি প্রথমে পাটনায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন,—তখন ইহার সন্নিকটেই ইংরাজ পর্টুগীজ ও ওলন্দাজদিগের বাণিজ্য কুঠী ছিল। হরিনন্দ সাহোর সাতপুত্র। ইহারা সকলেই ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সওদাগরী কারখানা স্থাপন করিয়া বিপুল সম্পত্তি সঞ্চয় করেন। হরিনন্দের জেষ্ঠপুত্র মাণিকচাঁদ ঢাকায় সওদাগরী ব্যবসা করেন। ইনিই প্রথম শেঠ উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সময় ঢাকা বাঙ্গলার রাজধানী ছিল। ১৭০৪ খ্রীঃ যখন মুরশিদকুলীখাঁ, ঢাকা হইতে মুরশিদাবাদে রাজধানী উঠাইয়া আনেন, সেই সময় মাণিকচাঁদও সেই সঙ্গে সঙ্গে মুরশিদাবাদে নিজের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। মুরশীদকুলীখাঁ মাণিক-চাঁদকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন—এবং তাঁহারই অনুগ্রহে শেঠবংশ বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েন। নবাব দরবারে ইহাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল—মুরশিদকুলীর দক্ষিণ পার্শ্বে ইহাঁর আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইনি সকল বিষয়ে মুরশিদকুলির পরামর্শ দাতা ছিলেন। জমীদারেরা যে সকল খাজনা সর-কারে দাখিল করিত, সে সমস্তই মাণিকচাঁদের হাত দিয়া রাজ-কোষে নীত হইত; এবং মাণিকচাঁদের * ১৷৷০ কোটী টাকা বাঙ্গালার খাজনা স্বরূপ দিল্লীর বাদসাহের নিকট প্রেরিত হইত।† মুরশিদাবাদে টাকা মুদ্রিত হইত, এই টাকশালের তত্বাবধানের ভারও মাণিকচাঁদের হাতে ছিল।

* নামীয় হুণ্ডীতে।
† দিল্লীতে মাণিকচাঁদের ভ্রাতার এক সওদাগারী কারখানা ছিল

এমনও শুনা যায় যে, নবাবের অনেক অর্থ মাণিকচাঁদের নিকট গচ্ছিত থাকিত। নবাব মুরশীদকুলীর মৃত্যুকালে প্রায় পাঁচ কোটী টাকা মাণিকচাঁদের কোষাগারে ছিল।

মাণিকচাঁদের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফতেচাঁদকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন এবং সমুদয় সম্পত্তি তাঁহাকেই প্রদান করিয়া যান। ফতেচাঁদও ইতিপূর্ব্বে সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন হইয়া শেঠ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দিল্লীতে তাঁহার সম্পত্তিও মাণিকচাঁদের সম্পত্তি অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। এক্ষণে পিতৃব্যের সম্পত্তির অধিকারী হইয়া তাঁহার সম্পত্তি দ্বিগুণিত হইল। তিনি বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন—ভারতবর্ষে তাঁহার ন্যায় ধনশালী লোক তখন আর ছিল না। ১৭২৪ সালে ফতেচাঁদ একবার দিল্লীতে গমন করেন—সেই সময় মহম্মদসা বাদসাহ তাঁহাকে জগৎশেঠ উপাধি প্রদান করেন। কেহ কেহ বলেন যে, বাদসাহ ফেরোকসা কর্ত্তৃক জগৎশেঠ উপাধি ফতেচাঁদকে প্রদত্ত হয়। যাহাই হউক, ফতেচাঁদই যে প্রথম জগৎশেঠ উপাধি প্রাপ্ত হন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ বা মতদ্বৈধ নাই। এরূপ প্রবাদ আছে যে, সম্রাট দরবারে ফতেচাঁদের এতদূর প্রতিপত্তি ছিল যে, একদা মুরশীদকুলীখাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ফতেচাঁদকে বাঙ্গালার নবাব করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল; কিন্তু ফতেচাঁদ এ প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই—মুরশীদকুলী তাঁহার পিতামহের আশ্রয়দাতা, ভারতবর্ষীয়েরা কোন দিনই অকৃতজ্ঞ নহে। অধিকন্তু ফতেচাঁদের অনুনয়ে বিনয়ে মুরশীদকুলীখাঁর উপর সম্রাটের যে রোষ হইয়াছিল, তাহা বিদূরীত হয়। বাদসাহের দরবারে শেঠবংশীয়ের এত সম্ভ্রম ছিল যে, বাঙ্গালার নবাবকে কোন খেলাত প্রেরিত হইলে, সেই সঙ্গে ফতেচাঁদকেও সেইরূপ খেলাত প্রদত্ত হইত। সম্রাট প্রদত্ত একটী মরকত অঙ্গুরী শেঠ পরিবারে বহুদিন পর্য্যন্ত যত্নের সহিত রক্ষিত ছিল। এই অঙ্গুরীতে "জগৎশেঠ" এক কয়টী কথা লিখিত ছিল।

মুরশীদকুলীর মৃত্যুতে, সুজাউদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব হন, ইনি ফতেচাঁদকে স্বীয় মন্ত্রী চতুষ্টয়ের একজন মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করেন। সুজাউদ্দৌলার পর সরফরাজ খাঁ নবাব হন, ইহাঁর সময়ও জগৎশেঠের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু কোন এক ঘটনায় সুজাউদ্দৌলার সহিত জগৎশেঠের অন্তবৈরিতা স্থাপিত হয়, এবং আলীবর্দ্দির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া নবাবকে সিংহাসনচ্যুত ও আলিবর্দ্দিকে সিংহাসনে স্থাপিত করেন। দিল্লীর বাদসাহ দরবারে ফতেচাঁদের যেরূপ প্রতিপত্তি ছিল, তাহাতে আলিবর্দ্দির পক্ষে সনদ পাইতে কোনই গোল হইল না।

ফতেচাঁদের মৃত্যুতে তাঁহার পৌত্র মহাতাপ রায় জগৎশেঠ উপাধির অধিকারী হয়েন, ফতেচাঁদের দুইপুত্র ছিল ফতেচাঁদের জীবদ্দশায়ই তাহাদের মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রের সন্তান মহাতাপ, কণিষ্ঠের—স্বরূপচাঁদ। মহাতাপ জগৎশেঠ, ও স্বরূপচাঁদ মহারাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। পিতৃসম্পত্তিতে উভয়েই সমান অধিকারী হইলেন, এই সময় ইহাদের সম্পত্তি কুবের তুল্য। প্রায় দশ কোটী টাকা ইহাঁদের মূলধন ছিল। কথিত আছে, ভাস্কর পণ্ডিত যখন মারহাট্টা সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, তখন জগৎশেঠদিগের প্রায় ২॥০ কোটী টাকার ক্ষতি হয়। সেই সময়ের লোকেদের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, জগৎশেঠের সমস্ত টাকা গঙ্গাগর্ভে ছড়াইয়া দিলে, গঙ্গার গতিরোধ হইয়া বৃহৎ বাঁধ প্রস্তুত হয়।

কিরূপে জগৎশেঠেরা এত ঐশ্বর্য্যশালী হইলেন, তাহা না বলিলে,বালকেরা বুঝিতে পারিবে না। তাই এখানে সংক্ষেপে অর্থ উপার্জ্জনের কয়েকটী উপায় লেখা গেল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জমীদারদের খাজানা গ্রহণ ও দিল্লী সরকারে খাজানা প্রেরণ, এই উভয় কাজই শেঠদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইত। এই উভয় কার্য্যের জন্য তাহারা বাটা পাইত। নোট বা টাকা ভাঙ্গাইতে গেলে যে পয়সা নেয় তাহার নাম বাটা। পুণ্যাহের * সময় এবং জমী-বন্দোবস্তের সময় সকল জমীদারদিগকেই মুরশিদাবাদে শেঠ ভবনে আসিতে হইত এবং শেঠদিগের সহিত হিসাব পরিষ্কার করিতে হইত। এই কার্য্যে জমীদারেরা শেঠদিগকে তাহাদের প্রাপ্য বাটা ছাড়াও বহু অর্থ প্রদান করিত। মুরশিদাবাদে টাকশালে জগৎশেঠের মুদ্রা অঙ্কিত হইত। এই কার্য্যের জন্য তাহাকে শতকরা ৷৷০ আনা করিয়া নবাব সরকারে দাখিল করিতে হইত।

ইউরোপীয় সওদাগরদিগের সহিত কারবারেও ইহাদের বিলক্ষণ আয় হইত। এইরূপ নানা প্রকারে জগৎশেঠ ভারতের রথ-চাইল্ড নামে ইংরাজদের দ্বারা অভিহিত হন। ইহাদের সম্পত্তি ও প্রতিপত্তির প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটী বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

১৭৪৯ খৃঃ অব্দে যখন নবাব আলীবর্দ্দি কাশিম-বাজারের কুঠি লুঠ করেন, সেই সময় ইংরাজেরা ১২ লক্ষ টাকা নবাবকে দিয়া অব্যাহতি পান। জগৎশেঠ দ্বারা ইংরাজদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়, এই কার্য্যে জগৎশেঠ ঐ ১২ লক্ষের কিছু অংশ প্রাপ্ত হন। ১৭৫৩ সালে ইংরাজেরা কলিকাতায় প্রথম টাকশালা স্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু জগৎশেঠদিগের ভয়ে তাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যেহেতু ইংরাজদের তখন এমন অর্থ বল ছিল না যে, নবাবকে জগৎশেঠ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে অর্থ দিয়া সম্মতিপত্র প্রাপ্ত হইতে পারেন, কিন্তু যখন ইংরাজেরা গোপনে সরাসর দিল্লীর বাদ-সাহের নিকট হইতে কলিকাতায় টাকশালা স্থাপ-নের অনুমতি পত্র প্রাপ্ত হয়েন, তখনও তাঁহাদের টাকশালে মুদ্রিত টাকা, বাজারে বেশী প্রচলিত হইতে পারে নাই। ইংরাজ বণিকেরাও কলিকাতার টাকা লইতে সম্মত হয় নাই, যেহেতু তাহা হইলে তাহাদিগকে শতকরা ৫ হইতে ১০ টাকা পর্য্যন্ত লোকসান দিতে হইবে। বাঙ্গালায় জগৎশেঠের তখন এমনই আধিপত্য ছিল।

আলীবর্দ্দি খাঁর মৃত্যুর পর জগৎশেঠের সঙ্গে ইংরাজদের বন্ধুতা আরও ঘনিষ্ট হয়। কলিকাতা বিজয়ের পর ইংরাজদের সহিত নবাবের যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধিতে জগৎশেঠ ইংরাজদের পক্ষ হইতে নবাবের নিকট অনুরোধ করেন। সিরাজউদ্দোল্লা নিতান্ত অপরিণামদর্শী ছিলেন, কোন কারণে এই সময় তাঁহার সহিত শেঠদিগের বিবাদের সূত্রপাত হয়, এবং শেষে এই বিবাদ এতগাঢ় হয় যে, নবাব অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া জগৎশেঠ মহা-তাপকে ও মহারাজ স্বরূপচাঁদকে কারারুদ্ধ করেন। প্রথমে কোন সূত্রে বিবাদ আরম্ভ হয়, তাহা জনরবে পরিপূর্ণ; কিন্তু বিবাদ দৃঢ় হইবার কারণ এই :— পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জগৎশেট জমীদারের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া নবাব সরকারে দাখিল করিতেন। সিরাজউদ্দৌলা নিজের উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবে রাজকোষ প্রায় শূন্য করিয়া ছিলেন এবং টাকার জন্য অভাব অনুভব করিয়া জগৎশেঠকে সওদাগর-দিগের নিকট হইতে তিন কোটী টাকা আদায় করিতে অনুমতি করেন। জগৎশেঠ ইহাতে সম্মত

* পুণ্যাহ।

হয়েন না, নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া দুই ভাইকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন।

এই কারণে বাঙ্গালার ধনকুবের নবাবের প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়ান, সিরাজউদ্দোলার অত্যাচারে দেশের লোক তখন জ্বালাতন হইয়া উঠে। রাণী ভবানী, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, পূর্ব্ববাঙ্গালার রাজা রাজবল্লভ, ইহাঁরা সকলেই কোন না কোন কারণে নবাবের ভীষণ শত্রুস্থানীয় হন; সুতরাং সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, পলাসীর যুদ্ধে ইংরাজদের বড় বেশী বল-ক্ষয় করিতে হয় নাই। কথিত আছে, ইংরাজ সেনাপতির চাতুরী ও অসীম সাহসিকতা এবং জগৎশেঠের প্রভূত অর্থ রাশি এই উভয় দ্বারা বাঙ্গালার অধিকার মুসলমানদিগের হাত হইতে ইংরাজের হাতে পতিত হয়, সুতরাং জগৎশেঠকে বাঙ্গালা বিজয়ের প্রধান সহায় বলিতে হইবে।

শেঠদিগের সাহায্যেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, মীরজাফর বাঙ্গালার নবাব হইলেন। এই সময় হইতে ইংরাজদের নিকট হইতে নবাবীপদ কিনিয়া লইতে, মীরজাফরকেও সুতরাং অধিক পরিমাণে অর্থ দিতে হইয়াছিল এবং এই অর্থে যে জগৎশেঠের, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কাজেই বলিতে হয় শেঠদিগের সাহায্যেই মীরজাফর মসনদে আরোহণ করেন। কিন্তু এই শেঠদিগের সহিত তাঁহার বন্ধুতা স্থায়ী হয় নাই। একদা দুই ভ্রাতা অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইয়া পরেশনাথ তীর্থে গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে মিথ্যা সন্দেহে তাঁহাদের গমনের পথ রোধ করা হয়; কিন্তু নবাবের অসদভিপ্রায় পরিপূর্ণ হইতে পারে নাই। অধিকন্তু শেঠেরা তাঁহার শত্রু হইয়া দাড়াইলেন এবং ইহারই ফল মীরজাফরের সিংহাসন চ্যুতি। সিরাজউদ্দোলার সিংহাসন চ্যুত হইবার পর হইতেই শেঠদিগের অধঃপতন আরম্ভ হয়। এইক্ষণ মীরজাফরের পর তদীয় জামাতা মীর কাশিম বাঙ্গালার নবাব হন। মীর কাশিম তেজস্বী, বুদ্ধিমান, কর্ত্তব্যপরায়ণ, সমদর্শী নবাব ছিলেন। যদি এই সময়ের ইংরেজের স্বার্থের দাস না হইতেন, তবে মীর কাশিমের শাসন কাল অকলঙ্ক ও গৌরবের হইত; দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই সময়ে ইংরাজেরা এক মাত্র অর্থের উপাসক ছিলেন—যে কোন উপায়ে হউক অর্থ সংগ্রহই তাঁহাদের একমাত্র কার্য্য ছিল। সমদর্শী মীর কাশিমকে তাঁহাদের বড় ভাল লাগিল না। তুচ্ছ ছলনায় বিবাদের সূত্রপাত হইল, বিবাদের প্রারম্ভেই নবাব জগৎশেঠদের কারাগারে নিক্ষেপ করেন; এই কার্য্যে তাঁহার প্রধান অভিপ্রায়, যাহাতে ইংরাজেরা শেঠদিগ হইতে অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত না হন। অশুভলগ্নে মীরকাশিম ইংরাজের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন—অশুভক্ষণে সেই বিবাদের শেষ হয়। মীরকাশিম উদয়নালা যুদ্ধে পরাস্ত হন—ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া নবাব ইংরাজদিগকে নৃশংস ভাবে হত্যা করেন। এই সময় জগৎশেঠ ও তাঁহার ভ্রাতা এবং অন্য কতিপয় স্বদেশদ্রোহী মীরকাশিম কর্ত্তৃক গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হন।

মহাতাপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদের মৃত্যুর পর, মহাতাপের জ্যেষ্ঠ পুত্র খোশালচাঁদ এবং স্বরূপচাঁদের পুত্র উদয়চাঁদ তাঁহাদের সম্পত্তির অধিকারী হন। খোশালচাঁদ জগৎশেঠ উপাধি এবং উদয়চাঁদ মহারাজ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। মহাতাপচাঁদের কনিষ্ঠপুত্র ও স্বরূপচাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র তাঁহাদের পিতার সহিত মীরকাশিম কর্ত্তৃক আবদ্ধ হয় এবং মীরকাশিমের পলায়নের সময় তাহারা অযোধ্যায় উজিরের হাতে অর্পিত হয়। উজির ভ্রাতা দ্বয়ের মুক্তির জন্য বহু অর্থ প্রার্থনা করেন। খোশালচাঁদ ও উদয়চাঁদ এই জন্য অনেক অনুনয়

বিনয় করিয়া কলিকাতায় লর্ডক্লাইবের নিকট পত্র লিখেন। বলা বাহুল্য তাঁহাদের প্রার্থনা পূরণ করা হইয়াছিল না। ইহার পর শেঠ ভ্রাতারা কোম্পানির নিকট প্রায় ৬০ লক্ষ টাকাও প্রার্থনা করেন। এই টাকা কোম্পানী জগৎশেঠের নিকট হইতে ধার করিয়া ছিলেন। এই যাটলক্ষের ।২১ লক্ষ মীরজাফর ও ইংরাজেরা একত্র হইয়া সৈন্যব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ধার করিয়াছিলেন। ক্লাইব এই টাকার জন্য দায়ী থাকেন। যাহা হউক, এই টাকা দেওয়া হইল কি না, তাহা জানিবার আবশ্যক করে না অধিকন্তু শেঠদিগের নিকট আরো ১॥০ লাখ টাকা ঋণ প্রার্থনা করা হয়।

যে সময় ইংরাজেরা দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে বাঙ্গালার দেওয়ানীপদ প্রাপ্ত হইলেন তখন ক্লাইব খোশালচাঁদকে জগৎশেঠ উপাধি প্রদান করিয়া কোম্পানির সরিফ করেন, ৩১ বৎসর বয়সের সময় খোশালচাঁদের মৃত্যু হয়। পরেশনাথ পর্ব্বতে ইহাঁর নির্ম্মিত একটী জৈন মন্দির আছে। মন্দির মধ্যে যে সব মূর্ত্তি আছে—তাহাতে খোদিত আছে যে, ১৭৬৮ খ্রীঃ খোলাশচাঁদ কর্ত্তৃক এই মন্দিরে এই মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। এই মন্দিরের ব্যয়ভার মুরশিদাবাদের সওদাগর মহোদয় কর্ত্তৃক বর্ত্তমান কালে নির্ব্বাহ হয়।

খোশালচাঁদের মৃত্যুর পর হরকচাঁদ জগৎশেঠ উপাধি প্রাপ্ত হন। হরকচাঁদ খোশালচাঁদের পোষ্য-পুত্র, ইনি জৈন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। এই হইতে মুরশিদাবাদের শেঠেরা বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। হরকচাঁদের বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বনের একটী প্রবাদ আছে। হরকচাঁদের বহুদিন অবধি কোন পুত্র সন্তান হয় না—জৈন ধর্ম্মানুমোদিত নানা ক্রিয়া কলাপ করিয়াও কোন ফল হইল না, শেষে কোন বৈরাগী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং অভীষ্ট ফল লাভ করেন।

যদিও অধুনা শেঠবংশীয়েরা বৈষ্ণব, কিন্তু ইহাঁরা এখনও জৈনদিগের দ্বারা সম্মানের চক্ষে দৃষ্ট হয়েন। এখনও জৈন পরিবারের সহিত ইহাঁদের আদান প্রদান হইয়া থাকে। জৈন পরিবারের কন্যাকে এ পরিবারে প্রবেশ করিয়াই বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়।

হরকচাঁদের দুই পুত্র—ইন্দ্রচাঁদ ও বিষ্ণুচাঁদ। ইন্দ্রচাঁদ জগৎশেঠ উপাধি প্রাপ্ত হন, ইন্দ্রচাঁদের পুত্র গোবিন্দচাঁদ, গোবিন্দচাঁদ নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থায় পড়িয়া বহুকালের যত্নে সঞ্চিত ও রক্ষিত রত্নাদি বিক্রয় করিয়া সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে ১২,০০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করেন। এই বৃত্তি গোবিন্দ-চাঁদের মৃত্যুর পর ৮০০০ টাকায় পরিণত হয়। বিষ্ণুচাঁদের পুত্র কৃষ্ণচাঁদ এই বৃত্তি প্রাপ্ত হন, এখনও সাধারণ উৎসবে শেঠবংশীয়ের উত্তর পুরুষেরা নবাবের দক্ষিণ পার্শ্বে গদি প্রাপ্ত হন। কিন্তু সেই নবাব আর এই নবাব—সেই জগৎশেঠ আর এই শেঠ !! কালের কি কুটীল গতি! বিধাতার কি অপূর্ব্ব খেলা !!!
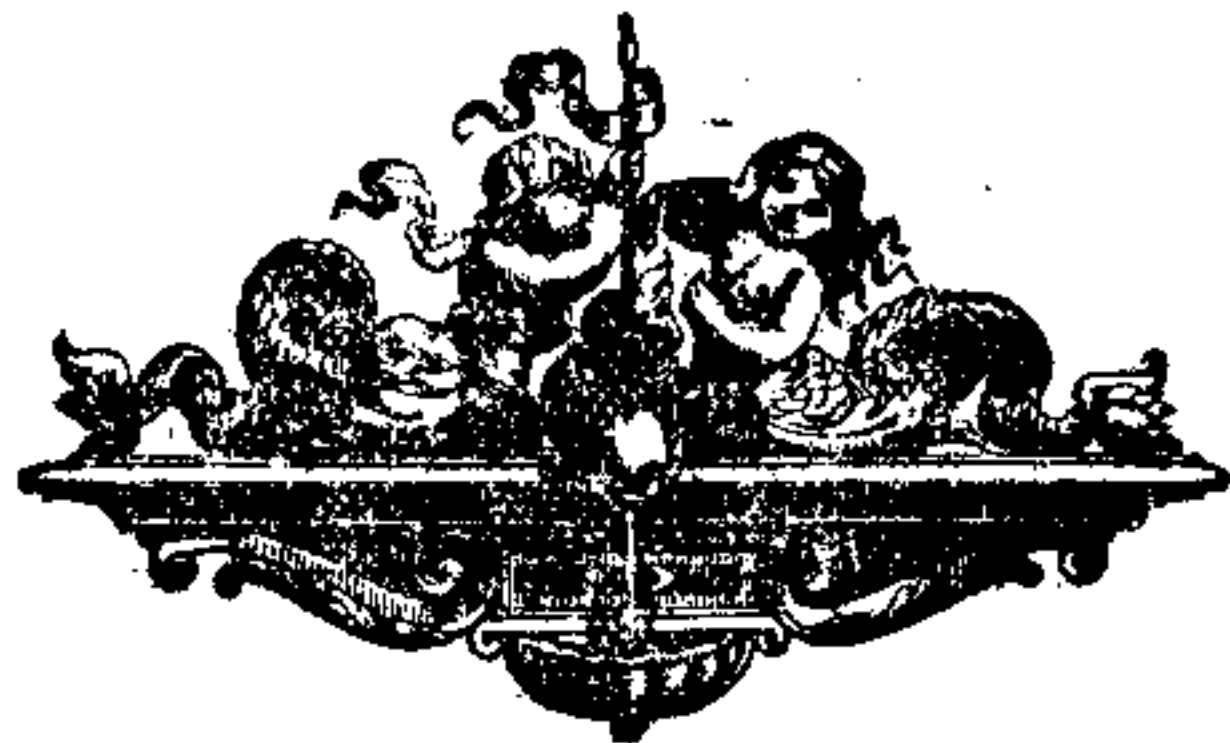
শাখা—হস্ত ও পদ।

শরীরের শাখা—হস্ত ও পদ। ঊর্দ্ধশাখা—হস্তের পাঁচ বিভাগ, যথা—(১) স্কন্ধ; (২) প্রগণ্ড বা ঊর্দ্ধবাহু; (৩) প্রকোষ্ঠ বা নিম্নবাহু; (৪) মণিবন্ধ (৫) হস্ততল। হস্তের অস্থিগুলি নিম্নরূপে বিভক্ত করা হয়।—
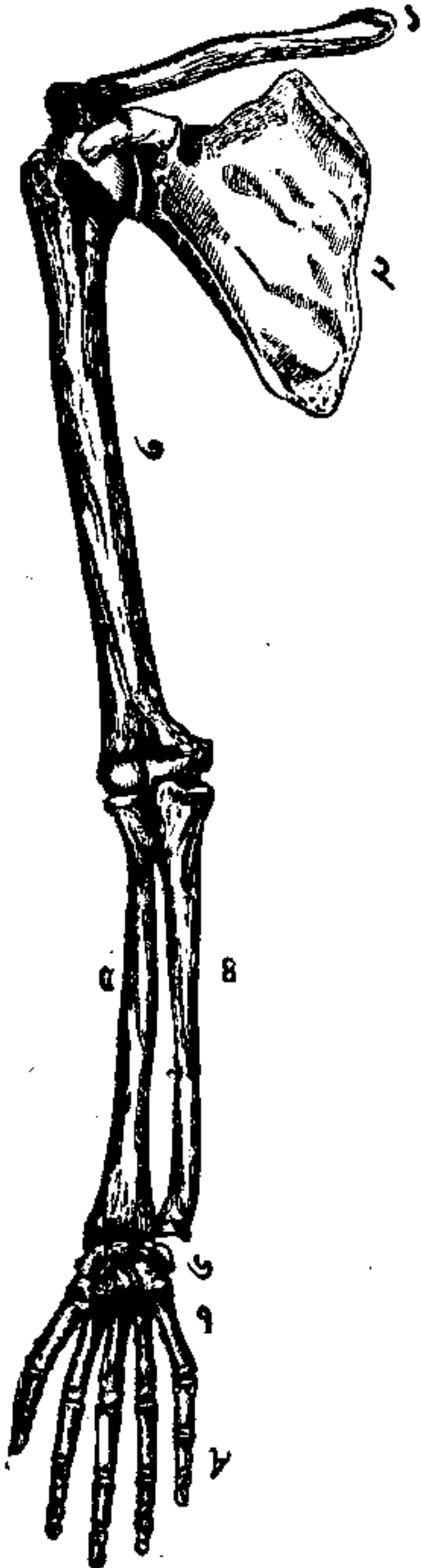
কণ্ঠাস্থি[১] ও অংসফলক[২] এই দুইএর একত্রে স্কন্ধদেশ গঠিত। প্রগণ্ড[৩] বা ঊর্দ্ধবাহুতে একটী অস্থি। প্রকোষ্ঠ বা নিম্নবাহুতে দুইটী—'বৃদ্ধাঙ্গুলিরদিগের অস্থি[৪] ও 'কনিষ্ঠাঙ্গুলিরদিগের অস্থি[৫]। মণিবন্ধের[৬] ৮ খানি হাড়। হস্ততলের[৭] ৫ খানি হাড়। অঙ্গুলির[৮] হাড়।

কণ্ঠাস্থির একদিক বুকের হাড়ের উপরের দিকে এবং অপরদিক স্কন্ধফলকের সহিত কব্জায় আবদ্ধ। কণ্ঠাস্থি স্কন্ধদেশকে ঠেলিয়া রাখে। কুকুর ও বিড়ালের কণ্ঠাস্থি নাম মাত্র রহিয়াছে; বানর কাঠবিড়াল প্রভৃতি যে সকল জন্তুরা গাছে উঠে তাঁহাদের কণ্ঠাস্থি বড় হয়। অংসফলক ত্রিভুজাকার। সম্মুখেরদিক মসৃণ ও গর্ত্ত এবং বুকের পশ্চাদ্দিকের গোলভাগের উপর খুব সহজেই সরিয়া বেড়ায়। অংসফলকের উপরদিকে বাটির ন্যায় একটা গর্ত্ত আছে। প্রগণ্ডের হাড়ের উপরেরদিকের গোল মাথাটা বসিয়া যায়। এইরূপে কব্জার হাড় অবিকদূর ও চারিদিকে ঘুরাণ ফিরাণ যায়।

প্রগণ্ডের হাড় খুব শক্ত। এই লম্বা হাড়ের দুইদিকের শেষভাগ বর্ত্তুলাকার। ইহার উপরের মাথাটা অংসফলকের গহ্বরে প্রবিষ্ট। গহ্বর হইতে হাড়টা সহজে খসিয়া না আইসে এই জন্য অংসফলকের গহ্বরের নিকট হইতে দুইখানি সরু বক্র হাড় হাতের মাথার গোল অংশকে ধরিয়া রাখে। এই জন্য হাতে করিয়া খুব ভারি বস্তু টানিলে বা উঠাইলে স্কন্ধ হইতে হাত বিযুক্ত হইয়া যায় না।

প্রকোষ্ঠ বা নিম্নবাহুর দুই হাড়। কড়ে আঙ্গুলের দিগের হাড়ের উপরদিকটা স্থূল এবং প্রগণ্ডের হাড়ের সহিত কবাটের কব্জার মত কব্জায় আবদ্ধ অর্থাৎ এই কব্জা দরজার একদিকেই খুলে বা বন্ধ হয় অপরদিকে বাঁকান যায় না। পশ্চাৎ বা উল্টাদিকে হাত বাঁকান যায় না। বুড় আঙ্গুলের দিগের

হাড় উপরদিকে সরু এবং গর্ত্তযুক্ত—এই গর্ত্ত প্রগণ্ডের হাড়ের শেষভাগের গোল মাথাটাকে ধরিয়া রাখে। ইহার নীচের অংশ মণিবন্ধের হাড়ের সহিত সংযুক্ত। হাড়ের তলা উপরদিকে করিয়া যদি হাতটাকে একটা টেবিলের উপর রাখি তবে প্রকোষ্ঠের দুই হাড় পাশাপাশি থাকে। তার-পর যদি হাতটা ঘুরাইয়া হাতের পিঠটা উপরদিকে আনি তবে দেখিতে পাইব যে কড়ে আঙ্গুলেরদিগের হাড়টা সরিয়া যায় নাই,কেবল বুড় আঙ্গুলেরদিকের হাড়ের শেষ অংশটা ঐ হাড়ের উপর দিয়া এড়ো-ভাবে গিয়া হাতটাকে উল্টাইয়া দিয়াছে। মণিবন্ধে দুই সারিতে ৪ খানি করিয়া আটখানি ছোট ছোট হাড় আছে। এই হাড়গুলি পরস্পরের ও নিকটস্থ অন্যান্য হাড়ের সহিত বন্ধনির দ্বারা আবদ্ধ। হস্ত-তলে সরু সরু লম্বা লম্বা ৫টা হাড় আছে, হাতের তেলো টিপিলে এই হাড়গুলি টের পাওয়া যায়। অন্যান্য অঙ্গুলি অপেক্ষা বৃদ্ধাঙ্গুলি অধিক ঘুরাণ যায়। ঘুরাইয়া অন্যান্য অঙ্গুলির উপর আনা যায় বলিয়া আমরা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিতে এবং ক্ষুদ্র দ্রব্য খুঁটিয়া লইতে পারি। অঙ্গুলির হাড়গুলি 'হস্ততলের' হাড়গুলির সহিত সংযুক্ত। বৃদ্ধাঙ্গুলির দুইটী ও অন্যান্য অঙ্গুলিতে তিনটী করিয়া হাড় আছে। প্রত্যেক হাতে অঙ্গুলিতে চৌদ্দটি করিয়া হাড় আছে।

নিম্নশাখা বা পদের হস্তগুলি এইরূপে বিভক্ত :—

বস্তির হাড়, উরুর হাড়, হাঁটুর (কব্জার) হাড়, জঙ্ঘার বড় ও ছোট দুই হাড়, গুল্ফ বা পায়ের কব্জার হাড়, পায়ের পাতার হাড়, আঙ্গুলের হাড়, পায়ের আঙ্গুলের হাড়। বস্তির দুই কটিপার্শ্বের হাড়ের নীচেরদিকে বাটির মত গর্ত্ত[২] আছে। সেই গহ্বরে উরুর হাড়ের গোল অগ্রভাগ[২] প্রবিষ্ট থাকিয়া কব্জার মত কায করে। উরুর হাড়[৩] প্রগণ্ডের হাড়ের সদৃশ; দেখিতেও অনেকটা উহারই মত, তবে সমস্ত শরীরের ভার বহন করিতে হয় বলিয়া অধিকতর বড় ও দৃঢ়। উরুসন্ধির কব্জা ঠিক কক্ষসন্ধির অনুরূপ। তাতে সমস্ত হাতটা যতদূর পর্য্যন্ত ঘুরাণ ফিরাণ যায় পা ততদূর যায় না।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
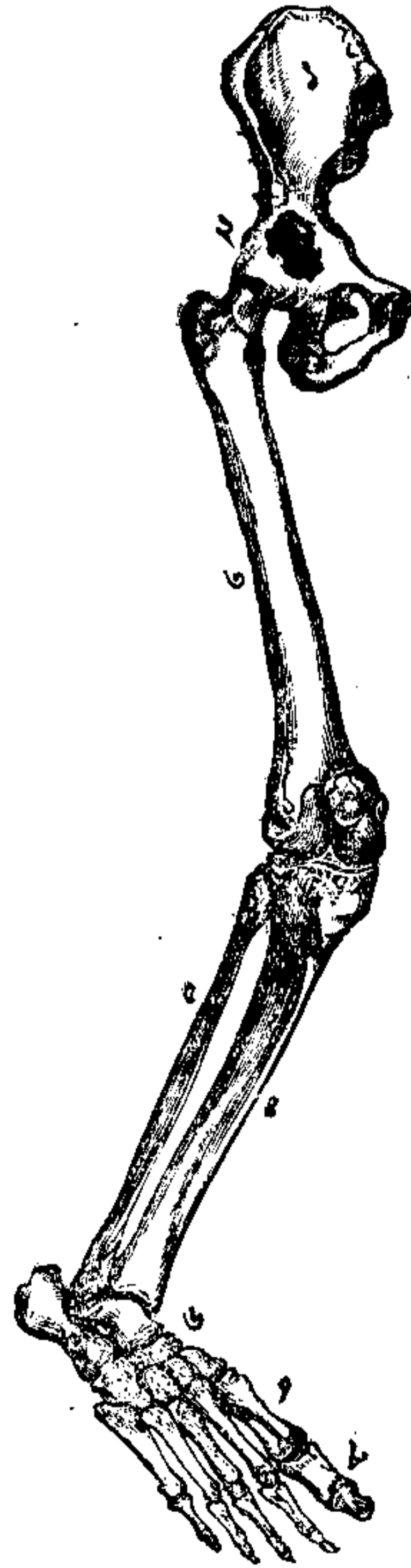
প্রকোষ্ঠ বা নিম্নবাহুর ন্যায় জঙ্ঘাতে দুইটি হাড়[৪,৫] আছে। এই দুই হাড় প্রকোষ্ঠের হাড়ের

সদৃশ কিন্তু কড়ে আঙ্গুলেরদিগের হাড়ের উপরে যেমন বুড় আঙ্গুলেরদিগের হাড় আনা যায়, জঙ্ঘায় সেরূপ কিছু করা যায় না। ছোট হাড়খানি খুব সরু এবং বড় হাড়খানির সহিত উপরে ও নীচে উভয়দিকে দৃঢ়রূপে সংযুক্ত। উরুর হাড়ের সহিত জঙ্ঘার বড় হাড় কব্জায় আবদ্ধ। এ কব্জা উরু বা কুচ্‌কির কব্জার মত নহে। দরজার কব্জার মত একইদিকে ভাঙ্গা যায়। হাঁটুর কব্জা কুনুইএর কব্জার অনুরূপ। হাঁটুর সম্মুখে একটা ছোট চাক্‌তির মত হাড়[১] আছে; কুনুইতে ওরূপ হাড় নাই।

গুল্‌ফ বা পায়ের কব্জায়[১] ৭ খানি হাড় আছে। ইহাদের মধ্যে একখানি খুব বড় এবং পশ্চাৎদিকে বাহির হইয়া পড়িয়া পায়ের গোড়ালি গঠিত করিয়াছে। পায়ের পাতার হাড়[১] হাতের পাতার হাড়ের অনুরূপ। ইহাদের সংখ্যা ৫টী ও প্রত্যেকটী এক একটী অঙ্গুলির হাড়ের সহিত সংযুক্ত।

পায়ের আঙ্গুলের হাড়[১] ঠিক হাতের আঙ্গুলের হাড়ের অনুরূপ। হাতের বুড় আঙ্গুলের ন্যায় পায়ের বুড় আঙ্গুলে দুইখানি হাড়। ও অন্যান্য অঙ্গুলিতে ঐরূপ তিন খানি করিয়া হাড় আছে।

বিড়ালের ঝগড়া।

১

রাজুদের খাবার থালায়
দুইজন বিড়াল তাকায়;
ভুলো সে পুরুষ, তাই বলে তাড়াতাড়ি
"মেও মেও, হেথা কেন পুষি লক্ষী ছাড়ি!
তুই কেন এলি মোর সাথে—
এই বেলা স'রে যা' তফাতে!"

২

পুষি বলে "মেউ মেউ মেউ—
এমন শুনেছে কবে কেউ?—
দুজনে করেছি আশা দুজনেই খা'ব,
তুমি বুঝি বাহাদুর আমি চ'লে যা'ব?
কথা দেখি ভারি জোর জোর
তুমি রাজা আমি যেন চোর!"

৩

ভুলো বলে "মেও মেও ছাই—
কোথাকার আপদ বালাই!
ফের্ যদি কথা ক'বি সমুচিত পাবি
এত আশা তোর মনে মোর সাথে খা'বি!
ভাল চা'স্ চলে যা' তফাতে,
খা'ইতে পাবি না মোর সাথে!"

৪

পুষি বলে "মেউ মেউ হায়
সবারি সমান খিদে পায়!"
ভুলো বলে "মেও মেও অই কথা ফিরে?—
এক চড় দিয়ে মাথা ভেঙ্গে দেব কি রে?—
ও সব আমার নাহি স'য়,
মেয়ের বাড়ানি ভাল নয়!"

৫

পুষি বলে "মেউ মেউ মেউ—
বিচার দেখে যা' তোরা কেউ!
পেটে খিদে, খেতে গেলে ভেঙ্গে দিবে মাথা
এ দিকে সহেনা গা'য় মেয়েদের কথা
ভুলো বটে 'পণ্ডিত' হয়েছে,
খুব শাস্ত্র বাহির করেছে!"

৬

ভুলো বলে "মেও মেও, বটে;
দেখ্ তোর কপালে কি ঘটে!—

নিতান্ত ডেকেছে যম তাই এ বড়াই—
আয় তবে তার বাড়ী এখনি পাঠাই!"
পুষি বলে "মেউ মেউ মেউ
বীর পণা দেখে যা' গো কেউ!"

৭

হেন কালে "ঝি" আসিল ছুটে,
এঁটোগুলি নিয়া খুঁটে খুঁটে—
উঠানে কুকুর চন্দ্র দাঁড়াইয়া ছিল,
যতনে খাবারগুলি তার কাছে দিল;
তিনি এক আদুরে গোপাল,
মাখা ভাত খান চিরকাল?

৮

একমুঠা শেষ যাহা ছিল—
পুষিকে, ঝি তাই খেতে দিল;
আড়ে আড়ে চায় ভুলো চোখ রাঙ্গাইয়া
এত অপমান হ'ল "পুরুষ" হইয়া!
ঝি'র ভয়ে খেতে নারে কাড়ি,
সার মাত্র হাই ছাড়াছাড়ি!!

৯

অহঙ্কার বুকে জাগে যার,
এই দশা চিরদিন তার!
তাই বলি ভাই বোন? সদা মনে রেখ,
বড় হও সুখে রও নত হয়ে থে'ক,
দর্পহারী দেব ভগবান,
তাঁর কাছে সকলে সমান!

প্রভুর নিমিত্ত সেলিমর আত্ম বিসর্জ্জন।

সম্প্রতি কালীঘাটের হালদার বংশীয় একটি ভদ্রলোক কোন কার্য্যের জন্য আলিপুরে গিয়াছিলেন। সেইখানে এক জন লোক কুলি সংগ্রাহক আড়কাঠীর ছলনায় নিতান্ত বিপদগ্রস্থ হইয়াছে দেখিয়া তিনি দয়ার্দ্র চিত্তে তাহাকে আসন্ন বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া সঙ্গে করিয়া নীজ বাটীতে লইয়া গেলেন ও তথায় তাহাকে আহারাদি দিয়া রাত্রে শুইয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু ঐ কৃতঘ্ন হতভাগা এই উপকারের বিনিময়ে অবসর বুঝিয়া হালদার মহাশয়ের কতকগুলি বহুমূল্যের অলঙ্কারাদি চুরি করিয়া প্রস্থান করিয়াছে।

এই ত গেল মানুষের চরিত্র।

এই প্রকার শত শত ঘটনা আমরা চারিদিকে দেখিতে পাই। এই প্রকার লোক যে পশু হইতেও অধম তাহা "সখার" পাঠক পাঠিকাগণকে বলিয়া দিতে হইবে না।

পশু জাতিও এরূপ কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতক হয় না। ভগবান তাহাদিগকে যে জ্ঞানটুকু দিয়াছেন তাহার অপব্যবহার তাহারা করে না। উপকারী জনের উপকার করিতে তাহারা সর্ব্বদাই যত্ন করে। কুকুরের প্রভুভক্তির বিষয় তোমরা অনেক গল্প শুনিয়াছ ও পাঠ করিয়াছ। আজ আমরা সেলিমের আশ্চর্য্য প্রভুভক্তির বিষয় তোমাদিগকে বলিব। তোমরা ভাবিতেছ সেলিম বুঝি একজন মুসলমান চাকর, না হয় একটা কুকুর হ'বে। কিন্তু

তোমরা শুনিয়া বিস্মিত হইবে সেলিম মানুষও নয় কুকুরও নয়; সেলিম একটি বাঘ; প্রকাণ্ড একটা বাঘ, ৬ হাত লম্বা এবং ভয়ানক বলশালী। 'সেলিমের' জীবন বৃত্তান্ত যতদূর জানা গিয়াছে তাহা এই :—

সিখ্‌দিগের সহিত ইংরাজদিগের প্রথম যে যুদ্ধ হয় তাহার ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে একদিন জনৈক ইংরাজ কাপ্তেন কয়েকজন শিকারী সঙ্গে করিয়া পাঞ্জাবের প্রান্তভাগে এক নিবিড় জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল বনে বনে বেড়াইয়া একটি বড় বাঘিনী কাপ্তেন সাহেবের গুলিতে প্রাণত্যাগ করিল। শিকারীরা তৎক্ষণাৎ আগুন জ্বালাইয়া তাহার মুখের চতুষ্পার্শ্বের গোঁপের মত লোমগুলি পোড়াইয়া দিল; কারণ তাহাদের বিশ্বাস যে ঐ সকল লোমে এক প্রকার বিষ আছে তাহা শরীরে প্রবেশ করিলে মৃত্যু হয়। গোঁপগুলি পোড়াইয়া ফেলার পর তাহারা মৃত পশুর চামড়া ছাড়াইবার আয়োজন করিতে লাগিল। কাপ্তেন সাহেব একটি বৃক্ষের তলায় বন্দুকে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন ও চুরুট খাইতেছেন। বাঘিনীর একটিমাত্র শিশু শাবক মাতার মৃত দেহের চারিদিকে ঘুরিতেছে ও কোন সময়ে ডাকিতেছে ও কোন সময়ে বা আপন গাত্র মাতার গায়ের উপর ঘসিতেছে, ও এবম্বিধ নানা উপায়ে মাতাকে সচেতন করিবার চেষ্টা করিতেছে। শিকারী কাপ্তেন সাহেবের আদেশ অপেক্ষায় শাবকটিকে কিছু বলিতেছে না। শিকারীরা যখন অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চামড়া ছাড়াইতে অগ্রসর হইল তখন তাহাদিগের হস্তে আর দয়া পাইবার আশা নাই ভাবিয়াই যেন ব্যাঘ্র শাবকটী দৌড়াইয়া কাপ্তেন সাহেবের পদতলে পতিত হইল এবং দীন নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। যিনি বাল্যকাল হইতে সমর ব্যবসায় শিক্ষা করিয়াছেন, [যিনি স্বহস্তে শত শত শত্রুর প্রাণ বিনাশ করিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও ক্ষুব্ধ হয়েন] নাই আজ অসহায় মাতৃহীন ব্যাঘ্র শিশুর এই কাতর ভাব দেখিয়া সেই সাহেবের পাষাণ হৃদয় গলিয়া গেল, তাঁহার চক্ষে জল আসিল; বলিয়া উঠিলেন "আমি নিশ্চয়ই এই ব্যাঘ্র শাবকের প্রাণ রক্ষা করিব; সকলে বলে যে বাঘ কখন পোষ মানে না, আমি দেখিব যে দয়ালু ব্যবহার করিলে বাঘের হিংস্র স্বভাব ঘুচিয়া সে পোষ মানে কি না।" এই বলিয়া তিনি পদানত ব্যাঘ্র শাবককে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন ও বাঘিনীকে মারিয়া ভাল করিলাম কি মন্দ করিলাম এই ভাবিতে ভাবিতে শিবিরাভিমুখে চলিলেন। কাপ্তেন সাহেবের এই অদ্ভুত দয়া দেখিয়া শিকারীরা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

এই ঘটনার পর ৯ বৎসর চলিয়া গিয়াছে; কাপ্তেন সাহেবের পদোন্নতি হইয়া তিনি করণেল হইয়াছেন; আর ব্যাঘ্র-শাবক সেলিম ৬ হাত লম্বা প্রকাণ্ড এক বাঘরূপে পরিণত হইয়াছে। সেলিম প্রভুর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছে। প্রভু যেখানে যান তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যায়, রাত্রে যখন প্রভু ঘরের ভিতরে নিদ্রা যান, সেলিম তখন বারাণ্ডায় বসিয়া প্রহরীর কার্য্য করে। সেলিমের ভয়ে কেহ করণেল সাহেবের ঘরের সীমানায়ও আসিতে পারে না।

এই সময়ে হিমালয় পর্ব্বতবাসী কয়েক দল দস্যু পর্ব্বতের সমীপস্থ গ্রামবাসী প্রজাগণের উপর ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করায় দস্যুদিগকে দমন করিবার জন্য অল্পমাত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে করণেল সাহেব প্রেরিত হইলেন; সেলিমও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। যে স্থান দিয়া দস্যুগণ আসিয়া গ্রামবাসীদিগকে আক্রমণ করে তাহার নিকটবর্ত্তী

এক স্থানে কাপ্তেন সাহেব ছাউনি করিয়া আত্মরক্ষার জন্য একটি ক্ষুদ্র পরিখা ছাউনির চতুর্দ্দিকে খনন করাইলেন। যখন দস্যুরা আসিয়া কোন গ্রাম আক্রমণ করিত তখনি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার ও সম্ভব হইলে বন্দি করিয়া আনিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিতেন। এই প্রকারে অনেক সময়ে তাঁহাকে অতি সামান্য সংখ্যক সেনা লইয়া ছাউনিতে থাকিতে হইত।

একদিন অধিকাংশ সেনা ভিন্ন ভিন্ন দস্যুদলের অনুসরণার্থ ছাউনি হইতে গিয়াছে, করণেল সাহেব কয়েকটি মাত্র সেনা লইয়া ছাউনিতে আছেন। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে প্রহরীগণ সতর্ক ভাবে আছে কি না তাহা দেখিবার নিমিত্ত ছাউনির চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে গেলেন। যাইবার সময় সেলিম তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য ব্যগ্রতা দেখাইতে লাগিল কিন্তু তিনি তাহাকে বান্ধিয়া রাখিয়া গেলেন। কিয়দ্দূর গেলে শুষ্ক পত্রের এক মরমর শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, বোধ হইল যেন কোন লোক অন্ধকারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে অগ্রসর হইতেছে। চমকিত হইয়া তিনি সেই খানেই দাঁড়াইলেন ও অভিনিবেশ পূর্ব্বক শুনিতে লাগিলেন; পদ শব্দ ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বারুদ পূর্ণ গোলা জ্বালিবার আদেশ দিলেন ও সেই আলোকে দেখিতে পাইলেন যে বহুসংখ্যক পার্ব্বত্য দস্যু তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। করণেল সাহেব তখনি বন্দুক মারিবার আদেশ করিলেন, কিন্তু দস্যুদল এইক্ষণ এত বেগে আসিতেছিল যে তাহাদিগের মধ্যে অনেকের বন্দুকের গুলি লাগিয়া ভূতলশায়ী হওয়া সত্ত্বেও অবশিষ্ট দস্যুগণ একেবারে তাঁহাদিগের উপরে আসিয়া পড়িল। সেনাগণ পুনরায় বন্দুকে গুলি বারুদ পুরিবার ও সময় পাইল না। তখন ভয়ানক হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ হইল। করণেল সাহেবের সৈন্যাপেক্ষা দস্যুরা অনেকগুণে অধিক। অমিত তেজা কর্ণেল পাশবদ্ধ সিংহের ন্যায় এক বার এখানে একবার ওখানে সকল স্থানেই সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন ও নিজে অমানুষিক পরাক্রম সহকারে তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। কিন্তু দস্যুদিগের লোক বল অত্যন্ত অধিক। ক্রমে একে একে করণেল সাহেবের সৈন্যেরা ধরাশায়ী হইতে লাগিল। এই সময়ে ৫ জন দস্যু একবারে আসিয়া কর্ণেল সাহেবকে ঘিরিল। ক্ষিপ্রহস্তে কর্ণেল সাহেব এক জনের শিরশ্ছেদ করিলেন ও আর এক জনের মস্তকের উপর এমন জোরে আঘাত করি[illegible] ব তাহার মস্তকের এক পার্শ্ব কাটিয়া ফেলিলে[illegible]। [illegible]ীম বেগে কঠিন বস্তুতে আঘাত লাগায় কর্ণেলের তরবারি খানিও ভাঙ্গিয়া গেল। কর্ণেল সাহেব নিরস্ত্র হইলেন, তখনই অপর এক জন দস্যু তাঁহার প্রাণনাশার্থে স্বীয় তরবারি উত্তোলন করিল। তন্মুহূর্ত্তেই এক ভীষণ শব্দে বন আকুল হইল এবং আততায়ী দস্যু বিকট চিৎকার করিয়া ভূতলশায়ী হইল। কর্ণেল সাহেব চাহিয়া দেখিলেন যে সেলিম তাঁহার শত্রুকে ভীষণ আঘাতে ধরাশায়ী করিয়াছে এবং অন্য দস্যুদিগকে দুর্দ্দমনীয় বেগে আক্রমণ করিতেছে। বনের বাঘকে সাহেবের সাহায্য করিতে দেখিয়া দস্যুগণ ভাবিল যে সাহেবের প্রতি ভগবতীর কৃপা আছে, ইহা ভাবিয়া তাহারা ভয়ব্যাকুলিত হইল। ইতিমধ্যে কর্ণেল সাহেবের অপর সেনা সকল যাহারা কার্য্যান্তরে গিয়াছিল তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। দস্যুরা একেবারে পরাভূত হইয়া পলায়ন করিল।

সেলিম্ স্বীয় পশুবুদ্ধি দ্বারা প্রভুর বিপদ জানিতে পারিয়া বন্ধন রজ্জু কাটিয়া আসিয়া প্রভুর প্রাণ রক্ষা করিল।

সেলিম প্রভুর প্রাণ রক্ষা করিয়া পলায়ন পরায়ণ দস্যুদিগকে আক্রমণ করিতেছে এমন সময়ে দৈবাৎ কর্ণেল সাহেবের দলের জনৈক সেনার বন্দুকের গুলিতে সেলিম প্রাণত্যাগ করিল।

তোমরা কি জান সেলিমের প্রভু এই কর্ণেল সাহেব কে? কলিকাতার যাদুঘরের দক্ষিণে পার্ক ষ্ট্রীটের চৌরাস্তায় যে একটী অশ্বারোহী বীর পুরুষের তাম্র প্রতিমূর্ত্তি আছে, যাহার প্রশান্ত গভীর মুখশ্রী ও ভীমকায় দেখিলে মনে এককালিন ভয় ও ভক্তির উদয় হয়; ভয়ানক সিপাহী বিদ্রোহের সময় যে তিন জন বীর পুরুষ ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন ইনি তাঁহাদিগেরই মধ্যে এক জন, ইনিই ইতিহাসে জেনেরেল সার্ জেমস্ আউটরাম নামে বিখ্যাত।

হস্ত বিহীন মনুষ্য।

বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে কোথায় যে কিরূপ অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতেছে তাহার নিশ্চয় কে করিতে পারে? তাঁহার অনুগ্রহে কত কত অসম্ভব ঘটনা সম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, মানুষের স্থূল বুদ্ধি তাঁহার কার্য্যকলাপের লেশমাত্রও বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তবু মানুষ এমনি অহঙ্কারী যে বিজ্ঞানের, দর্শনের সাহায্য লইয়া, তাঁহার কার্য্যকলাপের বিচার করিতে বসে, যাহা হউক আমরা অদ্য একটী হস্ত বিহীন মনুষ্যের কিঞ্চিৎ বিবরণ সখার পাঠক পাঠিকাদিগকে দিব, দেখিবে ঈশ্বরের সামান্য ইচ্ছামাত্রে কেমন অদ্ভুত কার্য্য ঘটনা হয়।

মুরশিদাবাদ জেলার মধ্যে কান্দী মহকুমার অন্তর্গত সাওপাড়া (সাহাপাড়া?) গ্রাম বৈষ্ণব চরণের জন্মভূমি। জন্ম হইতেই ইহার হাত দুখানি নাই, হাত যেখান হইতে আরম্ভ হয় সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুটী মাংস খণ্ড আছে, তদ্দারা কোন কাজই হয় না। কথিত আছে বৈষ্ণবচরণ জন্মিলে তাহার মাতা বড় ভয় পায়, কুসংস্কার বশে রাক্ষস বলিয়াই বৈষ্ণব চরণের মাতার মনে বিশ্বাস হয় এবং এই বিশ্বাসে বৈষ্ণবচরণকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বৈষ্ণবের পিতা ইহার মধ্যেই পাড়ায় পাড়ায় বলিয়া আসিয়াছিল "ওগো দেখ এসে আমার ঘরে জগন্নাথ ঠাকুর জন্মেছে।" শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ মূর্ত্তির পট বোধ হয় বৈষ্ণবের পিতার দেখা ছিল, কিন্তু জগন্নাথ বলরামের হাত আছে, সুভদ্রারই সাগরের গর্জ্জন ভয়ে হাত পেটে ঢুকিয়া গিয়াছিল, এটী বোধ হয় তাহার জানা ছিল না। সে যা হউক পাড়ার অনেক লোক বৈষ্ণব চরণকে দেখিতে আসায়, বৈষ্ণবের জীবন রক্ষা হইল। সেই বৈষ্ণবচরণ এখন সাওপাড়ার পাঠশালার পণ্ডিত, মাসে এখন সে ৫।৬ টাকা উপার্জ্জন করে।

কান্দীর স্কুল সবইন্স্পেক্টর বাবু অরুণচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাসায় আমি স্বচক্ষে এই লোকটাকে দেখিয়াছি—সেই দিন আমার সমক্ষে পা দিয়া লিখিয়াছিল, একখানি কাগজ তাহাকে দেওয়া হইল—সে বাঁ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তৎপার্শ্বস্থ অঙ্গুলী দ্বারা কাগজখানি ধরিয়া, ডান পায়ের ঐ অঙ্গুলী দ্বারা পেন ধরিয়া তাড়াতাড়ি অবলীলাক্রমে নিজের নাম লিখিয়া দিল। একখানি

সহজ পরিমিতি তাহার সম্মুখে রাখা হইল, সে ঐরূপ বাঁ পায়ে পুস্তকখানি ধরিয়া ডান পায়ের অঙ্গুলী দ্বারা পুস্তকের একটী একটী করিয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল, সে পায়ের সাহায্যে যে ভাবে পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া পড়িতে লাগিল, আমরা হাতের সাহায্যে অনেক সময় তাহা পারিয়া উঠি না। সাহাপাড়া স্কুলে সরকার হইতে মাসিক দুইটী করিয়া টাকা বরাদ্দ আছে, বৈষ্ণবচরণকে তিন মাসের ৬ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইলে সে তাহা লইয়া পায়ের সাহায্যে কাপড়ে বান্ধিয়া লইল, কিন্তু বন্ধন তত দৃঢ় না হওয়ায় আর একটী লোক তাহার টাকা শক্ত করিয়া বান্ধিয়া দিল। যাইবার সময় পায়ের সাহায্যে ছাতা মেলিয়া কাঁন্ধে বাধাইয়া লইল। সামান্য বাতাসের কথা দূরে থাকুক, সাধারণ বলে ও তাহার নিকট হইতে ছাতা কাড়িয়া লওয়া যায় নাই।

শুনিলাম বাটীতে তাহার মাতা ও ভগ্নী আছে তাহারা তাহাকে খাওয়াইয়া দেয়। কিন্তু তাই বলিয়া সে তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া থাকে না। সে অনায়াসে দক্ষিণ পদের অঙ্গুলীর সাহায্যে চামচ ধরিয়া ভাত খাইতে পারে। পায়ে গামছা ধরিয়া মুখ পুছিতে পারে। পায়ের সাহায্যে কাণ চুলকাইতে পারে। বৈষ্ণবচরণ ময়রা জাতীয়, তাহার মাতার মুদীখানার ও মিঠাইএর দোকান আছে, মাতা কিম্বা ভগ্নীর অনুপস্থিতি কালে বৈষ্ণবচরণ দাঁড়ি পাল্লা ধরিয়া জিনিস ওজন করিয়া দিতে পারে। বাঁ পায়ের অঙ্গুলী দ্বারা তুলাদণ্ডের দড়ি ধরিয়া ডান পায়ের দ্বারা তুলার একপাশে ওজন উঠাইয়া দেয় এবং তুলার অপর পাশে ডা'ল কিম্বা চা'ল তুলিয়া লয়, বেশী হইলে ডান পা দিয়া তুলার সেই পালা ধরিয়া নাড়া দেয় এবং অতিরিক্ত দ্রব্য পাত্রস্থ করে, কম হইলে ওড়ন দ্বারা দ্রব্য উঠাইয়া পালায় যথা প্রয়োজন দেয়। পায়ের সাহায্যে শুনিয়াছি সে মাছ ধরিতেও পারে, আমাদের হাতের দ্বারা যে যে কাজ হয়, বৈষ্ণবচরণ পা দিয়া তাহা করিতে পারে, কেবল মাথায় তেল দিতে, স্নানান্তে মাথা পুছিয়া ফেলিতে এবং কাপড় পরিতে, বাহে যাওয়ার পর ভাল করিয়া শৌচ করিতে পারে না। যাহা হউক যাহাকে তাহার মাতা একদিন মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কালক্রমে সে ঈশ্বরপ্রসাদে আপনার জীবিকা আপনি উপার্জ্জন করিতে শিখিয়াছে, আপনার প্রায় সমস্ত কার্য্য আপনি দেখিয়া শুনিয়া করিতে পারে।

জুলাই মাসের ধাঁধার উত্তর।

১ম। দানব।

২য়। শীতল।

হেঁয়ালির উত্তর। নক্ষত্র।

এই সকল ধাঁধার উত্তর অনেকেরই ঠিক হইয়াছে। এত নাম সখায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। গ্রাহকগণ মাপ করিবেন।

নূতন ধাঁধা।

জীবদেহে সদা আমি করি অধিষ্ঠান,
আমার বিহনে সবে স্থাবর সমান।
তিনটী অক্ষরে মাত্র নামের গঠন,
প্রথম ছাড়িলে হই বিজন কানন।
দ্বিতীয় অক্ষর শূন্য করিলে আমার,
অশ্বসজ্জা হয়ে করি নর উপকার।
তৃতীয়ে বঞ্চিত যদি কভু আমি হই,
জঙ্গম জগতে তবে বিদ্যমান রই।
সলিল যে আমিও সে ভেদ মাত্র নাম,
কেহ নাহি জানে মোরে কোথা মম ধাম।

সখা।

নবম ভাগ। ১১ম সংখ্যা।

নবেম্বর, ১৮৯১।

বিবিধ।
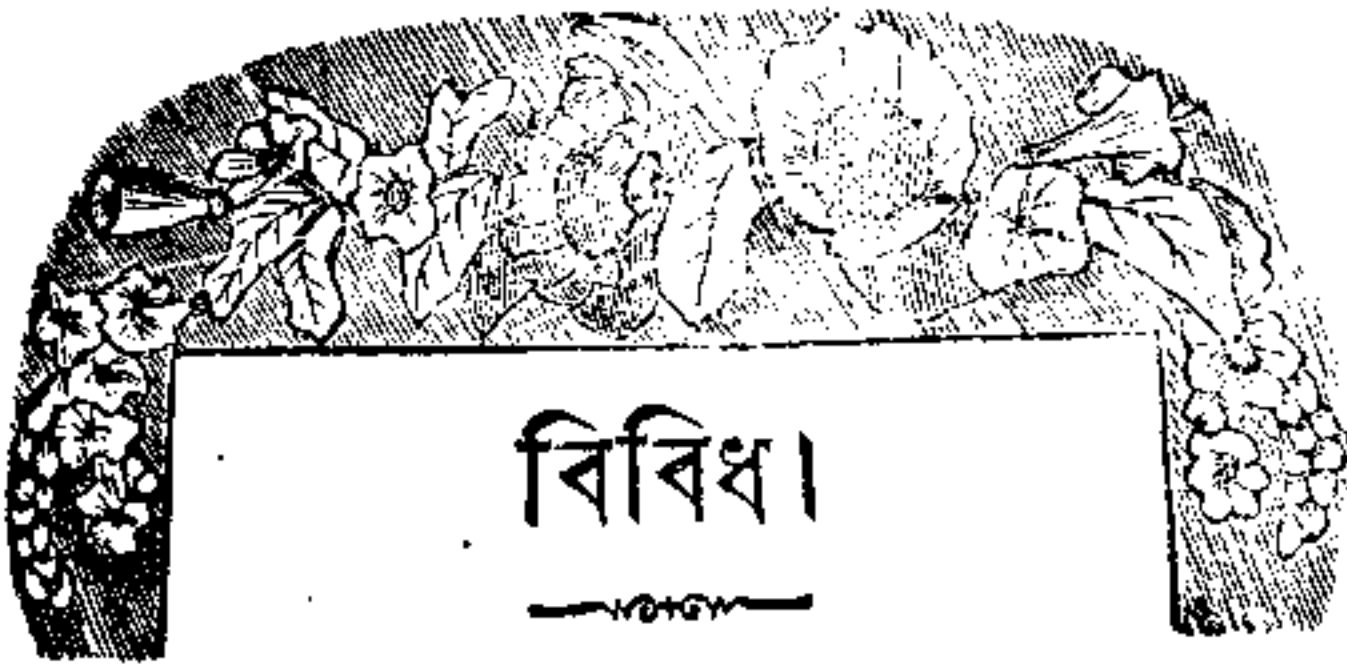
মাছির বিষ।—আমরা পূর্ব্বে মানুষের দাঁতে বিষ আছে বলিয়াছি। মাছির হুলে বিষ আছে সকলেই জানেন। কিন্তু সেই বিষে মৃত্যু হইতে পারে, বোধ হয় তাহা অনেকেই জানেন না। ঝিলমে একটী ৫০ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোক শাক-শব্জী বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সে তখনও বেশ সবল ছিল। একদিন হঠাৎ একটী মাছি আসিয়া তাহাকে কামড়াইল, সে তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িল, কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার মৃত্যু হইল। সকলেরই সাবধান থাকা কর্ত্তব্য।

*
* *

বোম্বাইয়ে বেলুন বাজি।—বেলুনবাজ স্পেন-সরের কথা সখার পাঠক পাঠিকারা জানেন। সম্প্রতি বোম্বাই সহরে লেফ্‌টেনাণ্ট মান্‌স্‌ফিল্ড বেলুনে উঠিয়া ৭½ মিনিটে ১১৪০০ ফুট ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন, এবং ১৫ মিনিটে প্যারাস্যুট সাহায্যে নামিয়াছিলেন।—এত ঊর্দ্ধে আর কেহ উঠিতে পারেন নাই।

*
* *

বন্ধিনীদিগের বীরত্ব।—সম্প্রতি যে ঝড় হইয়া গিয়াছে উহার প্রকোপ আন্দামানদ্বীপে অধিক পরিমাণে অনুভূত হইয়াছে। কয়েকটী লোক ঝড়ের সময় জলে ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া, কয়েকজন বন্ধিনী নিজ নিজ জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও সেই ভীষণ বাত্যা-পীড়িত সমুদ্রে সন্তরণ দিয়া ঐ লোকগুলিকে রক্ষা করিয়াছে। যাহারা এক সময় ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিয়া দ্বীপান্তরে বাস করিতেছিল আজ তাহাদেরই দয়ায় কয়েকজন জীবন পাইল।

*
* *

আশ্চর্য্য সন্তান।—কলিকাতা ট্রেটিবাজারে এক মুসলমান স্ত্রীলোক বাস করে। সম্প্রতি তাহার একটী বিকৃত মৃত সন্তান জন্মিয়াছে। সন্তানটীর নাসিকা, গল দশ অথবা চক্ষু নাই কিন্তু কপালের মধ্যদেশে একটী চক্ষু। শরীর হইতে মস্তক পৃথক নহে। মস্তকের স্থানে গোলাকৃতি মাংস-পিণ্ড। বহুলোক এই আশ্চর্য্য সন্তান দেখিতে যাইতেছে।

* *
*

মানুষও চামড়া বদলায়।—সর্পের খোলষ হইয়া থাকে, ও যথা সময়ে তাহা দেহচ্যুত হয়, সকলেই জানেন; কিন্তু মানুষের পুরাতন চর্ম্ম উঠিয়া নূতন চর্ম্ম জন্মিবার কথা কখন কেহ শুনিয়াছেন কি? কয়েক দিন হইল আমেরিকা হইতে এইরূপ পুরাতন চর্ম্মত্যাগ ও নূতন চর্ম্ম হওয়ার দুইটী সংবাদ আসিয়াছে। ডাক্তার জর্জ ফ্রাঙ্ক চিকাগো মেডিক্যাল সোসাইটীতে সেদিন একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহাতে লিখিত ছিল, একব্যক্তির গাত্রে প্রতি বৎসর নূতন চর্ম্ম উঠিত, জুলাইমাস পড়িলেই তাহার কম্পজ্বরের মত একপ্রকার পীড়া হইত,—এই পীড়া একাদিক্রমে ১২ ঘণ্টাকাল স্থায়ী হইত, তাহারপর পুরাতন চর্ম্ম লোহিতবর্ণ হইয়া ক্রমে উঠিয়া যাইত এবং নিম্নস্তরে একপ্রকার গোলাপী রংএর চর্ম্মমাত্র অবশিষ্ট থাকিত;—এই চর্ম্মাবরণ এত নরম যে পুরাতন চর্ম্ম পতনের পর প্রথম সপ্তাহ তাহাকে অতিশয় কোমল পরিচ্ছদাদি পরিধান করিতে হইত। তাহারপর ক্রমশঃ ঐ নূতন চর্ম্ম স্থূল ও কঠিন হইত। দ্বিতীয় ঘটনার অবলম্বীভূত বিষয় একটী রমণী, বয়স ৩৯ বৎসর; ১৮৭৬ সাল হইতে প্রতি দুই বা তিন বৎসর অন্তর তাহার শরীরের চর্ম্ম উঠিয়া নূতন চর্ম্ম জন্মিতেছে।

একটী পুরাতন গল্প।

মেনিপাস্ নামক একজন গ্রীস্ দেশীয় পণ্ডিত একদিন স্বর্গে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। কথিত আছে, সেকালের লোকেরা যখন তখন স্বর্গে যাইতে পারিতেন, স্বর্গের কোনও স্থানে যাওয়া তাঁহাদের নিষেধ ছিল না; তাই মেনিপাস্ একেবারে প্রভাতেই জুপিটারের দরবারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। জুপিটারের দরবারে পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ের বিচার হয়। সেখানে তাঁহার একটা প্রকাণ্ড সিংহাসন আছে আর ঐ সিংহাসনের নীচে একটা ছিদ্র আছে, তাহার ভিতর দিয়া ত্রিভুবনের সমস্ত শব্দ প্রবেশ করে।

যখন মেনিপাস্ জুপিটারের নিকট উপস্থিত হইলেন তখন জুপিটার দরবারের কার্য্য আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন। মেনিপাস্‌কে নিকটে বসিতে বলিয়া কার্য্যে মন দিলেন। তখন সিংহাসনের নীচের সেই ছিদ্র খোলা হইল, এবং তৎক্ষণাৎ পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ কষ্টের কান্না ঐ ছিদ্র দিয়া শুনা যাইতে লাগিল। প্রথমতঃ চীৎকার ও ক্রন্দনের ঘোর রোল ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাওয়া গেল না। মেনিপাস্ অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেব এ ঘোর রোল কিসের এবং কোথা হইতেই বা আসিতেছে?" জুপিটার উত্তর করিলেন,—"পৃথিবীতে লোকে আমার উদ্দেশে যে প্রার্থনা করে তাহাই এই ছিদ্র দিয়া আমার কাণে প্রবেশ করে।"

জুপিটারের এই কথা শুনিয়া মেনিপাসের কিছু কৌতূহল জন্মিল। তিনি ঐ সমস্ত প্রার্থনার ভাষা

বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রার্থনা এইরূপ শ্রুত হইল ঃ—"হে ঈশ্বর, আমার জ্ঞান এবং দাড়ী বৃদ্ধি কর।" য়্যাথেন্স (Athens) নগরের কোন একজন পণ্ডিত এই প্রার্থনাটী করিয়াছিলেন। দাড়ীটা নাকি জ্ঞানের চিহ্ন, তাই পণ্ডিতজীর দাড়ীর জন্য এত আকিঞ্চন। এর পরই আর একটা প্রার্থনা শুনিতে পাওয়া গেল, সেটী এইরূপঃ—"আমি বাণিজ্যে যাইতেছি; যদি ধনরত্নে জাহাজ পূর্ণ করিয়া নিরাপদে বাড়ী ফিরিতে পারি, তবে জুপিটারকে একটা রূপার পেয়ালা উপহার দিব।" জুপিটার প্রার্থনাকারীকে ধন্যবাদ দিলেন।

অতঃপর একটী বড় সুন্দর প্রার্থনা শুনিতে পাওয়া গেল। একটী খুব মৃদু ও একটী খুব সতেজস্বর এক সঙ্গে আসিতেছিল। কোনও একজন অত্যাচারী রাজার সম্মুখে তাঁহার প্রজারা রাজার দীর্ঘজীবন ও মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে জুপিটারকে ডাকিতেছে; আবার তখনই মনে মনে বলিতেছে, "হে জুপিটার! এ পাপের হাত হইতে কতকালে উদ্ধার পাইব? যত শীঘ্র হয় এ হতভাগাকে পৃথিবী হইতে দূর কর।" এইরূপ আশ্চর্য্য প্রার্থনা শুনিয়া জুপিটার অত্যন্ত বিরক্ত ও রাগত হইয়া বলিলেন,—"এ লোকগুলি কি ভয়ানক কপট! মনে যাহার মৃত্যু ইচ্ছা করে মুখে তাহারই স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করে। এ কপটতার উপযুক্ত শাস্তি কি হইতে পারে? ইহাদের প্রথম প্রার্থনাই পূর্ণ করা যাক্—রাজা দীর্ঘজীবী-ই হউন।" শাস্তি উপযুক্ত হইল কি না পাঠক পাঠিকাগণ বিবেচনা করুন।

এরপর মেনিপাস্ দেখিতে পাইলেন কেমন একটী তেজোময় শিখা ও কতকগুলি ধূমাকার পদার্থ ঐ ছিদ্র পথে প্রবেশ করিতেছে, তিনি জুপিটারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেব একি?" জুপিটার প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"কতকগুলি লোক ডাকাইতির ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে; প্রতিদিন রাত্রে আমার উদ্দেশে পূজা ও যাগ যজ্ঞ করিয়া থাকে। তাহাদের দুষ্কার্য্যে আমার সাহায্য পায়, এই তাহাদের প্রার্থনা। ইহারা মনে করে যে দেবতাদিগকে কিছু উপহার দিলেই যে কোন কাজেই তাঁহাদের সাহায্য লাভ করা যায়। মূর্খেরা জানে না যে, অসৎকার্য্যে দেবতাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলে কেবল পাপের বোঝা বৃদ্ধি করা হয় মাত্র।"

এইরূপ কথা বার্ত্তা চলিতেছে ইতিমধ্যে হঠাৎ এক চীৎকার ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল; জুপিটার বলিতে লাগিলেন,—"এই একটা দুষ্টলোক সমুদ্রে তুফানে পড়িয়া চীৎকার করিতেছে, এ ব্যক্তি বারম্বার নিজের দোষে বিপদে পড়ে আর আমি উদ্ধার করিয়া দিই, বারবার নিজের চরিত্র ভাল করিতে প্রতিজ্ঞা করে কিন্তু বিপদ হইতে মুক্ত হইলে আর কিছু মনে থাকে না। ঠিক এই সময়েই একটী পীড়িত লোকের ক্রন্দন শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ঐরূপ এ লোকটাও নিজের দোষে বারম্বার পীড়ায় কষ্ট পায়, বারবার আমি মুক্ত করি; হাজারবার নিজের দোষ সংশোধন করিতে প্রতিজ্ঞা করে; কিন্তু রোগ মুক্ত হইলে কিছুই করে না। প্রথম লোকটা আবার ভয়ানক প্রতারক; একপয়সার সঙ্গতি নাই কিন্তু আমাকে একটা স্বর্ণমন্দির প্রস্তুত করিয়া দিতে চাহিতেছে। ইহাদের কিছু শাস্তি হওয়া উচিত।"

কোন একটী লোক বড় বিপদে পড়িয়া প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; বিপদটী এইরূপ ঃ তাঁহার পিতার যথেষ্ট ধন সম্পত্তি আছে কিন্তু পিতা তাঁহাকে ইচ্ছামত খরচ করিতে দেন না, যখন যা' দরকার নিজেই কিনিয়া দেন; ছেলের মনে এজন্য বড়ই কষ্ট, তিনি প্রার্থনা করিতেছেন,—"হে ঈশ্বর

আমার পিতা আর কতকাল সংসারের কষ্ট ভোগ করিবেন? দয়া করিয়া তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যাও।” প্রার্থনা শুনিয়া জুপিটার বলিলেনঃ—“এ ব্যক্তি টাকার লোভে পিতার মৃত্যু প্রার্থনা করিতেছে! যাহা হউক ইহার একটু উপকার করিতে হইবে,—ইহার পিতা আরও কিছুদিন জীবিত থাকুন।”

ইহার পর আরও কতকগুলি প্রার্থনা শুনিয়া জুপিটার সে দিনের কার্য্য বন্ধ করিলেন।

আমরা সখার পাঠক পাঠিকাদিগকে এই পুরাতন গল্পটী বলিলাম। এটী যদিও গল্পমাত্র তবুও ইহার ভিতরে শিখিবার অনেক কথা আছে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা সকলেই করে, কিন্তু লোকের হিতাহিত জ্ঞান না থাকায় প্রার্থনা কার্য্যকারী হওয়া দূরে থাকুক বরং হাস্যাস্পদ হয়।

শান্তি ও অশান্তি।

দ্য শারদীয়া পূর্ণিমার রজনী, নির্ম্মল গগন মণ্ডল বিমল চন্দ্রকিরণে কেমন শোভা ধারণ করিয়াছে। কিরণ ধারা পৃথিবীর সকল বস্তুকে স্নেহ মাখাইয়া যেন লাবণ্যময় করিয়া তুলিয়াছে; কাননরাজি ক্রমে কুসুমরাজির শোভায় পরিশোভিত; আবার চন্দ্রমা তাহাতে আপন লাবণ্য ঢাকিয়া দিয়া কি যে মনোহর করিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। একে কুসুমের দলে দলে বর্ণের লাবণ্য, তাহাতে আবার চন্দ্রের লাবণ্য সেখানে পড়িয়া লাবণ্যের তরঙ্গ তুলিয়াছে। অন্যত্র তরঙ্গপূর্ণ নদী সকল আকাশের একটি চাঁদ দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া নিজ হৃদয়ে শত শত চাঁদ আঁকিয়া আনন্দে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। নির্ম্মল সরোবর কুমুদরূপ সহস্র প্রীতি প্রফুল্ল লোচনে ঐ চাঁদপানে চাহিয়া আহ্লাদে আটখানা হইতেছে। এইরূপ যেদিকে দেখি তাহাতেই মনে হয় যেন পৃথিবী সুখের সাগরে ডুবিয়া আছে। কোথাও কোনও প্রকার অসুখের লেশ নাই। জগতের স্থাবর জঙ্গম সকলেই বিপুল বিরাম লাভ করিতেছে। এমন সময় একি! দেখিতে দেখিতে একখানা কাল মেঘ দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে দেখা দিল। ক্রমে মেঘ গগন মণ্ডল ছাইয়া ফেলিল; মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ আপনার ভীষণ বজ্রাগ্নি জ্বালিয়া জগৎ ধ্বংশের আয়োজন করিতে লাগিল। প্রবল বেগে ঝটিকা বহিতে আরম্ভ হইল। কোথায় বা সে শরচ্চন্দ্রমার অপরূপ কিরণচ্ছটা, কোথাই বা কুসুম কাননের অপরূপ লাবণ্যের উচ্ছ্বাস। পূর্ব্বে যাহা কিছু সুখকর দেখা গিয়াছিল এখন সে সকল কোথা গেল? এখন একি ভাব!! পূর্ব্বে সকল জগৎ সুখসাগরে ভাসিতেছিল, এখন সে সুখ কোথা গেল? এখন কেবলই দুঃখ; জগৎ যেন দুঃখের সাগরে ডুবিয়া গেল।

বালক বালিকাগণ! উপরে যে দুই প্রকার চিত্র দেখিলে উহা শান্তি ও অশান্তির প্রতিরূপ। জগতে যখন শান্তি ছিল তখন সকলে কি সুখেই ছিল, আর এখন কিরূপ ঝটিকায় সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দুঃখের—অশান্তির অতল জলে ডুবিল। শান্তিময় সংসারেও এইরূপ কত ঝড় উপস্থিত হইয়া

সে সংসারকে ছারখার করিয়া ফেলে, অদ্য সেই চিত্রই তোমাদিগকে দেখাইব।

শান্তি শব্দটি বড়ই শ্রুতিমধুর, ইহার অভ্যন্তরে যে কি এক অভূতপূর্ব্ব অমৃতরস নিহিত আছে, তাহা ব্যক্ত করা সহজ নহে; মানব মাত্রেই সেই রসের আস্বাদনে লোলুপ; কিন্তু সকলের ভাগ্যে সে সুখ সংঘটিত হওয়া দুরূহ ব্যাপার। প্রত্যেক ব্যক্তিই জীবনে শত শতবার ইহা লাভের জন্য যত্নবান হইয়াছেন; কিন্তু কেহই যে চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন এরূপ বোধ হয় না। অথচ কেহ ইহাঁর অনুগ্রহ হইতে একেবারে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহাও বোধ হয় না। সকলকেই ইনি স্বীয় অমৃতময় ক্রোড়ে বিরাম প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত; মানুষ স্বীয় কর্ম্মদোষে শান্তিহারা হইয়া আশান্তির দারুণ অঙ্কুশাঘাতে জর্জ্জরীভূত হয়।

শান্তি সংসারের আরাধ্য দেবতা। নিয়ত ইহার সেবা করিতে পারিলে বিবাদ, বিসংবাদ, আত্মবিচ্ছেদ, শোক তাপ, পাপের দাহ প্রভৃতি যাহা কিছু লোকের অশান্তিকর, সে সকলই দূরে পলায়ন করে। যে গৃহে নিয়ত এই দেবীর পূজা হয়, সেখানে এক স্বর্গীয় পবিত্র ভাবের অধিষ্ঠান হয়। সে গৃহের সকলেরই মুখশ্রীতে শান্তি-প্রভা বিকশিত হইতে থাকে। মুখে যেন স্বর্গীয় লাবণ্য ক্রীড়া করিতে থাকে। সকলের অন্তঃকরণ যেন স্নেহ-রসে মাখা, সকলের নয়নযুগলে প্রীতির জ্যোতি ক্রীড়া করিতে থাকে, পরস্পরে যেন হিংসা দ্বেষ কাহাকে বলে জানে না। নিয়ত এ, উহার হিত-কামনায় ব্রতী, এ উহার মঙ্গল সাধনে রত, সকলেই এমন আত্মবিস্মৃত, যে পরই আপনি, আপনিই পর; পরের সুখ বৃদ্ধিতেই যেন আত্ম সুখ, পরের উন্নতিতেই যেন হৃদয়ে অতুলানন্দ, গৃহের সকলে পরস্পর যেন পরস্পরের উপর নির্ভর করিয়াই আছে। অথচ প্রকারান্তরে সকলেই তুল্য ফলভোগী। এ বড় সুন্দর আত্মত্যাগ, এ আত্মত্যাগে সুখে স্বার্থ সাধিত হয়। তুমি যদি সংসারে দশজনের সুখের জন্য লালায়িত হও, দশ-জন তোমার জন্য অবশ্যই লালায়িত হইবে। তুমি একা দশগুণ ফল লাভ করিবে। সংসারে যদি সুখী হইতে চাও, যদি শান্তি পাইতে ইচ্ছা কর, তবে আপনাকে ভুলিতে হইবে। যিনি স্বার্থের দাস তিনি অন্যকে কখনও প্রাণ খুলিয়া ভাল বাসিতে পারেন না, আদর ও যত্ন করিতে পারেন না, তাঁহার কুটিল কটাক্ষ দেখিয়াই সকলে স্থির করিবে ইনি পর হইয়াছেন, আমাদিগকে পর ভাবেন। অমনি তাহারা সতর্ক হইবে, অমনি তাহারাও কুটিল কটাক্ষ আরম্ভ করিবে; এইরূপে একজনের দোষে শান্তির সুখময় ক্রোড় হইতে সকলে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। অচিরে সে সংসারে অশান্তি আসিয়া আগুন লাগাইয়া সকলকে দাহ করিতে থাকিবে; সংসার বিষময় হইয়া পড়িবে। কলহ সদা সকলের জিহ্বাগ্রে নৃত্য করিতে থাকিবে। কুটিলতা আসিয়া পরস্পরকে পরস্পরের কার্য্যে বক্রদৃষ্টি করিতে উপদেশ দিবে। হৃদয়ে সারল্য এবং উদার ভাব আর স্থান পাইবে না। সহোদর ভ্রাতা ভগিনী পর হইবে। স্নেহের পুত্তলী ভ্রাতৃসন্তান এবং ভগিনী সন্তান বিষদৃষ্টিতে পতিত হইবে।

আশন বসন প্রভৃতি উপভোগ্য জিনিষগুলি আর কেহ সুখে ভোগ করিতে পারিবে না। রাত্রি দিন সমস্ত পরিবার অসুখে ও অশান্তিতে অতি-বাহিত করিবে।

বহু পরিবার এইরূপে অসুখ সাগরে ভাসিয়াছে। নিতান্ত সামান্য সামান্য ঘটনার শেষে ভয়ঙ্কর আত্ম-বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। এইরূপ হইবার কারণ অনুসন্ধান

করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সংসারে সকলের দৃষ্টির অভাব। যে আগুন জ্বলিয়াছে, তাহাতেই উভয় পক্ষ আহুতি দিতে থাকেন, অগ্নি কিরূপে লাগিল, কে জ্বালাইল, তৎপ্রতি কাহারও দৃক্‌পাত নাই। হেতু নির্দ্দেশ হইলে অবশ্যই অনায়াসে রোগের চিকিৎসা হইত। কিন্তু কেহই তাহাতে মনোযোগী হইলেন না। একটা সামান্য উদাহরণ দিয়া দেখাইতেছি।

প্রায় পাঁচশত টাকা ব্যয় করিয়া একটা বাটীর উঠান শান বাঁধা হইল। কনিষ্ঠ ভ্রাতার শিশুবালকটী পড়িয়া গিয়া আঘাত লাগায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। ভ্রাতা, ছেলে কেন কাঁদে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, বৃষ্টি পড়িয়া শান পিচ্ছল হওয়ায় ছেলে পড়িয়া আঘাত পাইয়াছে; অমনি ভ্রাতার মনে দারুণ আঘাত লাগিল। "ছেলে কষ্ট পাইয়াছে" অমনি দাদার উপর বিরক্তিভাব আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিলেন "পাঁচশত টাকা খরচ করিয়া ছেলে মারার ফাঁদ পাতিয়াছেন, এখনই শান ভাঙ্গিয়া ফেল।" শান ভাঙ্গার আদেশ হইল, অমনি আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া সমস্ত ঘটনা অবগত হইলেন, ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, আরক্তলোচন হইয়া দশনে দশন নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর এ জন্মে পাষণ্ডের মুখাবলোকন করিবেন না। বাটী পৃথক হইল, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির বিভাগ হইতে আরম্ভ হইল, তদুপলক্ষে আজীবন লাঠালাঠী, মারামারী, কাটা-কাটী চলিল। যে আগুন জ্বলিল তাহা আর নিবিল না, উত্তরোত্তর আহুতি পাইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহার পরেও দারুণ ক্ষোভজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাতে পাষণ্ডেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ভ্রাতাদের কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা চিন্তা করিয়া উঠা যায় না। কনিষ্ঠ ভ্রাতা মৃত্যুশয্যায় শায়িত। অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপ প্রাণের কনিষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ বাসনা করিয়া জ্যেষ্ঠ, সংবাদ পাঠাইলেন। কনিষ্ঠ মনের আবেগ সংবরণ করিতে পারিবেন না, বুঝিতে পারিয়া, বলিয়া পাঠাইলেন, আর না,— মুমূর্ষ অবস্থায় আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাস সহ্য করিতে পারিব না, আর না! কি ভয়াঙ্কর হৃদয় বিদারক ঘটনা! কি অমানুষিক ব্যাপার! মৃত্যু-শয্যায় যে সহোদরকে দেখিলে ক্ষণকালের জন্য মৃত্যু যাতনা, রোগের তাড়না, সমস্ত ভুলিয়া যাইতে হয়, সেই প্রাণসম সহোদরের সহিত আর এ জীবনে, সাক্ষাৎ হইল না। একটি শিশুর সামান্য আঘাত প্রাপ্তিতে একটা সংসার ছারখার হইল। পরিবারস্থ সকলের মন হইতে শান্তিদেবী চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। একি সামান্য ক্ষোভের বিষয়! একি সামান্য পরি-তাপের বিষয়!! এত একটি বড় বাটীর বড় কর্ত্তা-দের ব্যাপার। আবার একটি ক্ষুদ্র বাটীর ক্ষুদ্র ঘটনা দেখিলে দারুণ মর্ম্মাহত হইতে হইবে। এক পরিবারস্থ দুইটি শিশুভ্রাতা। একটি পিতৃ-মাতৃহীন, অপরটির পিতা-মাতা উভয়েই বর্ত্তমান। পিতৃ-মাতৃ-হীন বালকটির অভিভাবক অপর বালকের পিতা-মাতা। একস্থানে দুইটি বালক আহার করি-তেছে, মাতৃহীন বালকটি স্বহস্তে, অপরটি মাতৃ-হস্তে আহার করিতেছে এবং আহার করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা কি দিয়া খাইতেছিস?" দাদা বলিল,—"কেন, খলিসা মাছ;" ভাইটি বলিল "বাঃ, আমি দেখি মাগুর মাছ দিয়ে খাচ্ছি"। অন্য দর্শক থাকিলে এ ঘটনায় বজ্রাহত হইতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই গূঢ় রহস্য ভেদ হওয়ায় ঐ মাতার মনে কি হইল জানি না। যদি এই শিশুর পিতা-মাতা উভয়ই বর্ত্তমান থাকিয়া, এই ঘটনা অবগত হইতেন, তাহা হইলে কি আর এ সংসারে, ক্ষণকালের জন্যও শান্তি বিরাজমান

থাকিতে পারিতেন! এইরূপ কত সংসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা লইয়া কত কুরুক্ষেত্র ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে—হইতেছে—ও হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। এ সকল ঘটনার জন্য কর্তৃপক্ষ অপরাধী, তাঁহারা যদি ক্ষুদ্রচেতা হন তবেই সংসারে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। রাজার যেমন সকল প্রজাকেই তুল্য চক্ষে দেখা কর্ত্তব্য, সকলকে তুল্যাধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য, তাঁহার ন্যায় দণ্ড যেমন সকলের উপর প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক, তদ্রূপ গৃহ রাজ্যের রাজাকেও পরিবারস্থ সকলকেই সমান চক্ষে দেখা আবশ্যক। যাহার যাহাতে অধিকার, তাহাই তাহাকে তাঁহার দেওয়া কর্ত্তব্য এবং সকলের উপর ন্যায় দণ্ড চালনা করা কর্ত্তব্য। গৃহকর্ত্তাকে অনেক সময় বিচার কর্ত্তার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে, সকলের গতি বিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। সকলের অভিপ্রায় বুঝিয়া কায করিতে হইবে। সকলের নিকট আত্ম-বিক্রয় করিতে হইবে। যিনি স্বীয় সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য ব্যাকুল; তিনি কর্ত্তার সম্পূর্ণ অযোগ্য। তাঁহাকে এমনভাবে চলিতে হইবে, যে তিনি যেন কেবল ভয়ের কারণ না হন, প্রত্যুত শ্রদ্ধার পাত্র হন। সকলে তাঁহার নিকট অভাব জানাইবে, তিনি সংগত অভাব পূরণ করিবেন, অসংগত প্রার্থনা এমনভাবে প্রত্যাখ্যান করিবেন যেন তাহাতে প্রার্থী মনঃকষ্ট না পায়। কর্ত্তা যাহাকে যাহা দান করিবেন গৃহীতা সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাই গ্রহণ করিবেন। আর যিনি অসঙ্গত প্রার্থনা করিয়াছেন, তিনি যেন স্বীয় প্রার্থনার অসংগততা বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হন।

"রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট; গৃহীর দোষে ঘরের কষ্ট।" বালক বালিকাগণ! তোমরাই ভবিষ্যতে গৃহরাজ্যের রাজা হইবে। এবং তাহাতেই তোমাদিগকে একদিন রাজত্ব করিতে হইবে, তখন যাহাতে তথায় শান্তি স্থাপন করিয়া সুখে কাল কাটাইতে পার এখন হইতে তাহার জন্য আপনাদিগকে প্রস্তুত করিতে থাক। নচেৎ অশান্তির আগুনে নিরন্তর জ্বলিয়া মরিতে হইবে। শান্তিহারা হইয়া জীবনকে ভারবহ বোধ করিবে।

রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প।

রামবনবাস।

ইতিপূর্ব্বে রত্নাকর চরিত, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান প্রভৃতি কয়েকটি রামায়ণের গল্প তোমরা সখাতে পাঠ করিয়াছ। আজ রামচন্দ্রের জীবনের একটি বৃত্তান্ত তোমাদিগকে বলিব। রামায়ণে বর্ণিত আছে অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী নামে তিন মহিষী ছিলেন। অনেক বয়স পর্য্যন্ত রাজা দশরথের কোন পুত্র সন্তান জন্মে নাই। পরে পুত্রেষ্টি যাগ করিয়া জ্যেষ্ঠা মহিষী কৌশল্যার গর্ভে রামচন্দ্র, মধ্যমা সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন, এবং কনিষ্ঠা কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত নামক চারিটি পুত্র লাভ করেন। রাজপুত্রগণ অল্পকাল মধ্যে নানা বিদ্যা শিক্ষা করিলেন; এবং সেকালে যুদ্ধ বিদ্যা যেরূপ চলন ছিল তাঁহারা তৎসমুদায়েতেই বিশেষ নিপুণতা লাভ করিলেন।

প্রজাবর্গ রামচন্দ্রকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিত। তখন প্রজাদিগের মনের ইচ্ছা কি রাজারা তৎপ্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতেন ও তদনুসারে কার্য্য করিতেন। প্রজাগণ রামের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ও তিনি যুবরাজ পদে অভিসিক্ত হউন প্রজাদিগের এই ইচ্ছা জানিতে পারিয়া রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

বহুবিবাহের বিষময় ফল চিরকালই সমান ফলিতেছে। সপত্নী পুত্র যুবরাজ হইবেন শুনিয়া কনিষ্ঠা মহিষী কৈকেয়ী যাহাতে রামের পরিবর্ত্তে নিজের ছেলে ভরত যুবরাজ হইতে পারেন তাহার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। কুঁজী নামে কৈকেয়ীর বাপের বাড়ীর এক বুড়ো দাসী ছিল; তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে ইতিপূর্ব্বে মহারাজের শুশ্রূষা করাতে তিনি কৈকেয়ীকে দুইটী বর দিতে চাহিয়াছিলেন। এইক্ষণে ঐ বর চাহিয়া লইয়া তদ্দ্বারা স্বীয় দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবেন।

রাজা দশরথ অন্তঃপুরে আসিবামাত্র কৈকেয়ী রাজার নিকট পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত দুইটি বর প্রার্থনা করিলেন। রাজা সাত পাঁচ না ভাবিয়া যেমন বর দিতে স্বীকার করিলেন, অমনি কৈকেয়ী বলিলেন, তবে এক বরে রামকে ১৪বৎসরের জন্যে বনে পাঠাও, আর দ্বিতীয় বরে আমার ভরতকে যুবরাজ কর। সতিনের এমনি হিংসা, শুধু ভরতকে রাজা করিলে চলিবে না; রামকে একেবারে দেশ হইতে দূর করিতে হইবে। রাজা কৈকেয়ীকে এই দারুণ প্রতিজ্ঞা হইতে নিরস্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে রাজা বলিলেন যে রামবনবাসে গেলে সেই মুহূর্ত্তেই পুত্রশোকে তাঁহার মৃত্যু হইবে। কৈকেয়ী কহিলেন তুমি মর সেও ভাল তথাপি রামকে বনে পাঠাইতে হইবেই।

পৌরজনেরা এই সংবাদ শুনিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। তাহারা রামকে বলিতে লাগিল রাজা বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীর বাধ্য হইয়া পাগলের ন্যায় কার্য্য করিতেছেন, আপনি রাজার এই আদেশ কখন প্রতিপালন করিতে বাধ্য নহেন। আপনি আমাদিগকে অনুমতি করিলে আমরা অল্পকাল মধ্যে রাজাকে ও কৈকেয়ীকে অযোধ্যা হইতে তাড়াইয়া দিয়া আপনাকে রাজসিংহাসনে বসাই। রামচন্দ্র তাহাদিগের বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি অত্যন্ত পিতৃবৎসল ও সত্যপ্রিয় ছিলেন। তিনি জানিতেন যে পিতা সত্যে আবদ্ধ হইয়া এই প্রকার নিদারুণ আদেশ করিতেছেন। পিতা সাক্ষাৎ দেবতা; সেই পিতাকে সত্যভ্রষ্ট করিয়া নিজে তুচ্ছ রাজ্য ভোগ করা বা ধন সম্পত্তির প্রতি লোভ করা অত্যন্ত অন্যায় ভাবিয়া তিনি প্রজাদিগকে মিষ্ট বাক্যে প্রবোধ দিয়া বিদায় দিলেন এবং নিজে বনে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে আর এক বিপদ উপস্থিত হইল: রামের স্ত্রী সীতাদেবী যখন শুনিলেন রাম বনে যাইবেন, তখনই তিনি বলিলেন,—আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। রাম কত প্রবোধ দিলেন, কত বাঘ ভল্লুকের ভয় দেখাইলেন, কত দুঃখ কষ্টের কথা কহিলেন, কিন্তু, পতিপ্রাণ সীতা কিছুতেই ভয় পাইলেন না; তিনি বলিলেন যে স্ত্রী-লোকের পতিই একমাত্র গতি, পতিই একমাত্র সহায়, পতির সহিত বনবাসও স্বর্গবাস তুল্য। তুমি যেখানে যাইবে আমিও সেইখানে যাইব। তোমার সুখে আমার সুখ তোমার দুঃখে আমার দুঃখ। অনেক তর্কের পর রাম সীতাকে সঙ্গে লইতে স্বীকার করিলেন। এই কথোপকথন হইতেছে এমন

সময়ে লক্ষ্মণ আসিয়া বলিলেন দাদা আমিও আপনার সহিত বনে যাইব। আমি বনে যাইয়া ভৃত্যের ন্যায় আপনাদের দুইজনের সেবা করিব। বারম্বার নিষেধ করাতেও লক্ষ্মণ নিবৃত্ত হইলেন না। তিনজনে বনে গেলেন।

কৈকেয়ীর নৃশংস ব্যবহারের ফল হাতে হাতে ফলিল। রাম বনে গেলে রাজা দশরথ পুত্র শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই ঘটনার সময়ে ভরত মাতুলালয়ে ছিলেন। তিনি অযোধ্যায় আসিয়া কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণায় রামের বনোগমন ও দশরথের মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, নিজে রাজ্য লইতে অস্বীকার করিলেন ও যথা সময়ে পিতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া প্রজাবর্গকে সঙ্গে লইয়া রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বনে গমন করিলেন। রামের সহিত সাক্ষাৎ করত তাঁহাকে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া রাজত্ব করিতে বারম্বার অনুরোধ করিলেন; কিন্তু রাম তাহাতে কোনমতে সম্মত হইলেন না। ভরত রাম থাকিতে রাজসিংহাসনে উপবেশন করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। অবশেষে রামের পাদুকা লইয়া তাহাই রাজসিংহাসনে স্থাপন করত রামের পুনরাগমন পর্য্যন্ত ভরত রাজত্ব করিবেন স্বীকার করিয়া তথা হইতে গমন করিলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন। আশ্চর্য্য সত্যপ্রিয়তা, ও ধর্ম্মভীরুতা; আশ্চর্য্য পিতৃভক্তি; আশ্চর্য্য স্বার্থত্যাগ; আশ্চর্য্য সতীত্ব এবং আশ্চর্য্য ভ্রাতৃস্নেহ। যে ব্যক্তি দশরথের ন্যায় ধর্ম্মভীরু ও সত্যপ্রিয়, যে ব্যক্তি রামের ন্যায় পিতৃভক্ত, ও যে ব্যক্তি রাম ও ভরতের ন্যায় স্বার্থত্যাগী, যে নারী সীতার ন্যায় পতিপ্রাণা, যে ব্যক্তি লক্ষ্মণ ও ভরতের ন্যায় ভ্রাতৃবৎসল তাহার জীবন ধন্য।

খবরের কাগজ।

ছোট ছোট তিনটী ভায়ে
খেল্‌তে খেল্‌তে গিয়ে,
বস্‌ল শেষে পথের ধারে
"বেঞ্চি" খানা নিয়ে।
চারুর কিছু বয়স বেশী
পড়্‌তে শুনতে জানে,
দাদার ঘরের কাগজ বই,
যাহা পায় তাই আনে।
আজ্‌কে তাহার দাদাবাবু
বাহিরে গেলে পরে,
চারু গিয়ে দেখে কি এক
কাগজ খানা প'ড়ে।
অম্‌নি নিয়ে তাড়াতাড়ি
পড়ে দেখে তায়,
দেশ বিদেশের নানা কথা
লেখা তাহার গায়।
বাহিরে এসে কটি ভায়ে
ডেকে এনে তাই,
ব'সে গেল করতে বিচার
কি আছে কি নাই।
এপিট ওপিট দেখে শেষে,
চারুর হল জ্ঞান,
কি ছাই খবর আছে এতে,
শুধুই ঘ্যান ঘ্যান।
সতুর কেমন নূতন জুতা
তাহার কথা কই,
দাদার কেমন বড় বড়
মোটা নূতন বই।

কাল আমাদের মেনি বিড়াল
তিনটা মাছ খেয়ে,
লুকিয়ে ছিল সারাটা বেলা
আঁধার ঘরে গিয়ে।

কাল্ ও পাড়ার দুষ্ট গোপাল
গাছের উপর চড়ে,
পাখীর ছানা পাড়তে গিয়ে
গিয়াছিল প'ড়ে।
মা বলিলেন দেখো চারু
থেকো সাবধানে,
এমনি ধারা হয় দিলে
কষ্ট পরের প্রাণে।
বাড়ীর পাশে গরীব মধু
খেতে পায়নি কাল,
আমায় দিয়ে পাঠিয়ে দেন মা,
একটী হাঁড়ি চাল।
আমায় দেখে মধুর মাতা,
কোলে নিলেন তুলে,
কতই চুমো দিলেন আমায়
যাব না তা ভুলে।

বাড়ী এলে বল্‌লেন মা
সে সব কথা শুনে,
"পরের দুঃখ বড় হলে
রেখো বাবা মনে।"
এ সব খবর নাইক লেখা
আছে কেবল ছাই,
ঘরের কথা নাইক যাতে
তাহা পড়্‌তে নাই।

ভাই ব'ন

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দুরবস্থার একশেষ।

নেপাল আরোগ্য লাভ করিয়া স্কুলে যাইতে আরম্ভ করিল, এবং পরীক্ষার জন্য নিয়মমত পড়াশুনা করিতে লাগিল। মুরলার হাতে যাহা কিছু ছিল কয়েক মাস তাহাতে তাহাদের কোন-মতে চলিল; কিন্তু শীঘ্রই তাহারা বড় দুরবস্থায় পড়িল। মুরলার হাতের শিল্পকার্য্য ইত্যাদি এখন আর বাজারে কিছুই বিক্রয় হইত না,—আর বিক্রয় হইলেও তাহাতে কিছু লাভ হইত না। সুতরাং মুরলার হাতের টাকা কয়েকটী দেখিতে দেখিতে ৮।৯ মাসের মধ্যে নিঃশেষ হইল।

বিপদের উপর বিপদ। তাহাদের এই ভয়ানক দারিদ্র্যের সময় মুরলা ও নেপালের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা

পরীক্ষা করিবার জন্যই যেন ভগবান দেশে ভয়ানক মন্বান্তর উপস্থিত করিলেন। অন্নাভাবে দেশে হাজার হাজার লোক মারা যাইতে লাগিল। এক মুঠা অন্নের জন্য দুঃখী কাঙ্গালী দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল। মুরলা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বদা ভয় নেপালের কোন দিন বা অনাহারে থাকিতে হয়। নেপাল বুদ্ধিমান; সে তাহার দিদীর ভয়ভাবনা সবই বুঝিত, এবং তাহারই জন্যই যে দিদীকে এত কষ্ট পাইতে হইতেছে ইহা মনে করিয়া সর্ব্বদা মর্ম্মে মরিয়া থাকিত। একদিন আর না থাকিতে পারিয়া মুরলার নিকট বলিল,—"দিদি, আমার জন্য কেন এত কষ্ট পাও, কেন এত ভাবনা কর? আজকালকার দিনে দেশের হাজার হাজার লোক উদরে দু'টী অন্ন দিতে না পারিয়া মারা যাইতেছে, তাহাতে আমার যদি একবেলা উপবাস করিতে হয়, কিম্বা একদিন পেট ভরিয়া আমি না খাইতে পাই—এই ভাবনায় তুমি কেন এত ব্যস্ত থাক এবং মন-কষ্ট পাও? ভগবান যখন যে ভাবে রাখিবেন, সেই ভাবেই থাকিতে হইবে। ভাবিয়া কোন ফল নাই। তবে চেষ্টায় যতদূর দুরবস্থা দূর হয় তাহাই দেখিতে হইবে।

এই যে দুঃখী কাঙ্গালীগুলি না খাইতে পাইয়া দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে, ইহাদের দুরবস্থা দেখিলে আর মুখে কিছু তুলিতে ইচ্ছা করে না আমরা সকলেইত সেই এক জগজ্জননীর সন্তান। এরা কেন না খাইয়া মরে?"

মুরলা। ভাই, তোমার কথায় আমার প্রাণে আশ্বাস পাইলাম, মনে বল পাইলাম। তুমি এত-দূর বুঝিয়া চল বলিয়াই তোমার দুঃখিনী দিদী এত দুরবস্থার মধ্যেও তোমার মুখ চাহিয়া কত সুখী। তোমার মত ভাই কয়জনের আছে? ভাই তোমার পরীক্ষার আর অধিক দেরী নাই। এখন আমরা এই দুরবস্থায় পড়িয়াছি। কি হইবে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার হাতে আর কিছু নাই বলিলেই হয়। পূর্ব্বে দুই একখান জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারিলে, তাহাতে কিছু আয় দেখিত, এখন আর তাহাও নাই। এখন কি করিয়া দিনের খরচ চালাইব তাই ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়াছি।

নেপাল। দিদি, ভাবিয়া ফল নাই, চেষ্টা করিতে হইবে এখন কি করিয়া চালান যায়। আমি মাষ্টার মহাশয়কে আমাদের এই দুরবস্থার কথা বলিয়াছি। তিনি স্কুলে আমাকে বিনা বেতনে নিবেন বলিয়াছেন। স্কুলের মাহিয়ানার হাত হইতে তাহা হইলে বাঁচা গেল। এখন খাওয়াটা কিসে চলে তাহাই দেখিতে হইবে। আমার ইচ্ছা ঝিকে দিয়া অনুসন্ধান নিয়া কোন বাড়ীতে রান্ধুনি-বামুন হইতে চেষ্টা করি। দুই বেলা সকাল সকাল রান্ধিয়া বাড়িয়া দিয়া আসিব, তাহাতে যদি খাওয়াটা দেয় এবং ৩।৪ টা টাকা মাসে দেয়। পড়াশুনা ইহার পর যথাসাধ্য করিব তাহাতে ত্রুটি হইবে না, আমার এ প্রস্তাবে তুমি কি বল?"

মুরলা। ভাই, তোমার এই প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারি না, তবে এইমাত্র বলিতে চাই যে আপাততঃ তোমাকে আমি রান্ধুনি-বামুনের কর্ম্ম নিতে দিতে পারি না। যদি ঐ কাজ যোটে তবে উহা এখন আমি গ্রহণ করিব। তুমি খুব মনযোগ সহকারে পড়িয়া যাহাতে আগামী পরীক্ষায় একটী বৃত্তি পাইতে পার তাহার চেষ্টা কর। আমার রান্ধুনী হইতে কোন অপমান নাই। ভগবানের রাজ্যে সৎপথে থাকিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার উপায় করাতে কোন অসম্মান হইবার কথা নহে। তুমি কিছু মনে করিও না। লক্ষ্মী ভাই আমার, তুমি খুব পরিশ্রম করিয়া পড়; তোমার ভবিষ্যতে উন্নতির কোন ব্যাঘাত যেন না হয়।

নেপাল দিদীর কথায় কখনও প্রায় দ্বিরুক্তি করিত না। আজও দিদীর প্রস্তাব তাহার নিকট নিতান্ত অপ্রীতিকর হইলেও সে তাহাতে বাধা জন্মাইল না। সে জানিত যে দিদী যাহা করেন, ভালর জন্যই করেন। তাঁহাদের সেই পুরাণ ঝিটী এখন আর তাহাদের বাড়ীতে কাজ করে না। সেই পাড়ারই একটী ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে সে দিনের বেলা কাজ করিত, এবং রাত্রিতে আসিয়া মুরলা ও নেপালের কাছে শুইয়া থাকিত। রাত্রিকালে ঝি তাহাদের মস্ত একটা বল ছিল। আজ ঝি রাত্রিতে শুইতে আসিলে মুরলা তাহার নিকট ভাই ব'নে যে পরামর্শ করিয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত করিলেন এবং কোনরূপ একটী সুবিধাজনক কর্ম্মের অনুসন্ধান করিতে বলিলেন।

ঝি বলিল,—"মা, তুমি কি তাহা পারিবে? তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে তোমার কি অতটা সহ্য হবে? ও কাজে কত সময়ে কত গালাগালী শুনিতে হইবে, মিছামিছি কত লাঞ্ছনা পাইতে হইবে। অত কি তুমি সহিতে পারিবে? পারত আমি একটী কর্ম্ম যোটাইয়া দিতে পারি।

মুরলা। ঝি, কেন সহিতে পারিব না? দুরবস্থায় পড়িলে সবই সহ্য করিতে হয়। দুইটা কটু-কথায় আর আমার গা ক্ষয়ে যাবে না। তুমি বল, তোমার অনুসন্ধানে কোথায় কাজ আছে। আমি উহা গ্রহণ করিব।

ঝি। মা, যদি পার ভালই। আমি যে বাড়ী কাজ করি তাহারাই একটী বামুনী খুঁজিতেছে। দেখি তাহাদের সঙ্গে কি বন্দোবস্ত করিতে পারি।

পরদিবস ঝি গিয়া তাঁহার মনিব ঠাকুরাণীর নিকট মুরলাদের অবস্থা সমস্ত খুলিয়া বলিল এবং মুরলা যে রান্ধুনী হইয়া তাহার ভাইয়ের পড়াশুনা চালাইতে কৃতসংকল্প হইয়াছে ইহা শুনিয়া গৃহিণী মনে মনে মুরলার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার একটী বিধবা কন্যা ও বাটীর আর কয়েকটী প্রাচীণা স্ত্রী-লোকের জন্য রান্ধিতে হইবে। খাটুনি বেশী নহে। মুরলাকে রাখিতে তিনি সম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন যে মাসিক ২৲ টাকা মাহিয়ানা ও দিবেন। ঝি আসিয়া মুরলাকে সমস্ত জানাইল। মুরলা সন্তুষ্টচিত্তে ঐ বন্দোবস্তে রান্ধুণীর কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আনন্দাশ্রু।

মুরলা রন্ধন কার্য্যে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। তাঁহার কাজ কর্ম্মও বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ছিল। সকলই প্রায় তাহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। কেবল প্রাচীণাদের মধ্যে দুই একজন মিছামিছি খুঁত ধরিয়া তাঁহাকে কটূক্তি করিতেন। মুরলা তাহা শুনিয়াও শুনিতেন না; তবে নেপাল যখন সে সব কথা শুনিতে পাইত সে বড়ই মনকষ্ট পাইত এবং নির্জ্জনে অশ্রুপাত করিত। নেপালের মুখ দেখিয়া সময় সময় মুরলা তাহার মনকষ্ট বুঝিতে পারিতেন, এবং নানা প্রকার প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেন। সর্ব্বদা নেপালকে পড়াশুনায় উৎসাহিত করিতনে। একদিন খাইতে বসিয়া নেপাল শুনিতে পাইলেন যে, মুরলাকে মিছামিছি ভয়ানক তিরস্কার করিতেছে। তরকারী রান্না ভাল হয় নাই না কি একটা অছিলা করিয়া অনর্থক কতক গুলি মর্ম্মান্তিক কথা শুনাইতেছে। নেপালের আর সেদিন খাওয়া হইল না। আধ-পেটা খাইয়া সে অশ্রুপাত করিতে করিতে স্কুলে গেল। অসুখ করিয়াছে বলিয়া বিকালে আর কিছু খাইল না।

রাত্রিতে মুরালাকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"দিদি, আমার পড়াশুনায় কাজ নাই; আমি তোমাকে আর রান্ধুনীর কাজ করিতে দেব না। তুমি মিছামিছি অমন গালগালাজ খাইবে, আমার তাহা সহ্য হয় না তুমি ঘরে থাক আমি রান্ধুনি-বামুনের কাজ করিব কিম্বা অন্য কোন কর্ম্ম করিয়া আমাদের খাওয়া পরা চালাইব। আমি বড় লোক হইতে চাই না। আমি গরীবের ছেলে, গরীবের মত থাকিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব।"

মুরলা। নেপাল, আবার পাগলামী আরম্ভ করিলে? ভাই, তুমি ওসব কথায় কাণ দেও কেন? আমাকে মিছামিছি গাল দেয় তাহাতে ত আর আমার গা ক্ষয় হইয়া যাইতেছে না? যাহারা ওরূপ কুব্যবহার করে, তাহারা নিজেদেরই স্বভাবের পরিচয় দেয়। আর ওসব লোকের কথায় কেন কাণ দেও। তাঁহারা সাবেকীলোক। সামান্য সামান্য বিষয়ে অত্যন্ত ক্ষুদ্ধা হন। আমিত উহাঁদের কোন কথায় কাণ দি না এবং কোনরূপ মনকষ্টও পাই না। সৎপথে থাকিয়া গতর খাটাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব। ইহাতে অপমানের ভয় করিলে চলিবে কেন? ভাই তুমি মন দিয়া পড়। দিন পাইলে সব দুঃখ কষ্ট দূর হইবে। এই সব গালিগালাজের কথা সব ভুলিতে পারিব। আর তুমি পাগলামি করিলে সব মাটি হইবে। যাও, স্থির হইয়া পড়াশুনা কর। পরীক্ষা ক্রমশঃ নিকট হইয়া আসিল। তুমি দুইটী খাইয়া চলিয়া আসিও, কোন কথা কাণে তুলিও না।

মুরলার উপদেশ পাইয়া নেপাল স্থির হইল এবং পড়াশুনায় মন দিল। এখন দুইবেলা যাইয়া কেবল দুইটী খাইয়া আসে; কোন কথায় আর কাণ দেয় না। কিসে ভালরূপ পাশ হইয়া বৃত্তি পাইতে পারে কায়মনোবাক্যে সেই চেষ্টায় নিযুক্ত হইল। পরীক্ষার যে কয়েকটী মাস বাকী ছিল দেখিতে দেখিতে তাহা কাটিয়া গেল। নেপালদের ক্লাশের বাছনিপরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। ঐ পরীক্ষায় নেপাল প্রথম হইল। শিক্ষকগণ সকলেই আশা করিতে লাগিলেন যে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় খুব উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিবে। বাস্তবিক বাছনিপরীক্ষায় সে সব বিষয়ে যেরূপ নম্বর পাইয়াছিল তাহাতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় তাহার খুব উচ্চস্থান অধিকার করিবারই কথা। মুরলা কেবল ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন তাঁহার নেপাল যেন সুস্থ শরীরে পরীক্ষা দিয়া ভালরূপ পাশ হইতে পারে।

নেপালের পরীক্ষার দিন উপস্থিত হইল। সকাল সকাল খাইয়া সে পরীক্ষা দিতে গেল। পরীক্ষার ৪ দিনই সে সমস্ত বিষয়ে ভালরূপ উত্তর করিয়া আসিল। শিক্ষকগণ সকলেই বলিলেন যে নিশ্চয়ই সে বৃত্তি পাইবে। নেপাল নিজে ততদূর আশা করিতে পারিল না। সমস্ত বিষয়ে খুব ভালরূপ উত্তর করিয়া আসিলেও সে নিজে মনে মনে তাহার উত্তরে ততটা সন্তুষ্ট হয় নাই। মুরলা উদ্বিগ্নচিত্তে নেপালের পরীক্ষার ফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রায় দেড়মাস কাটিয়া গেল। পরীক্ষার ফল আজ বাহির হইবে কাল বাহির হইবে বলিয়া সহরময় জনরব পড়িয়া গেল। সমস্ত লোক আগ্রহের সহিত প্রতিদিন অনুসন্ধান লইতে লাগিল। একদিন হঠাৎ সন্ধ্যার পূর্ব্বে—বিশ্ববিদ্যালয়গৃহে পরীক্ষার ফল লটকাইয়া দিল। নেপাল গোলদিঘীর পাড়ে বেড়াইতে আসিয়াছিল। খবর পাইয়া দৌড়িয়া পরীক্ষার ফল দেখিতে আসিল। দেখিল সে প্রথম বিভাগে পাশ হইয়াছে। অবিলম্বে দিদীর নিকট গিয়া ঐ সংবাদ দিল। মুরলা শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং

ভগবানকে বারম্বার ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে খবর বাহির হইল নেপাল ২০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছে। মুরলা আনন্দ-সাগরে ভাসিলেন। আজ পিতা-মাতাকে স্মরণ করিয়া ভাই ব'নে অনেক অশ্রুপাত করিলেন।

গোলাপের বক্তৃতা।

মতি, চুনি, আশু ননি প্রভৃতি বালকগণ এক ছুটীর দিনের বৈকালে তাহাদের বাড়ী হইতে কিছুদূরে কোন উদ্যানে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিল। ঐ বাগানে অনেক ফুলের গাছ ছিল। তাহারা একদিকে দেখিল যে, সে দিক গোলাপ গাছে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কোন গাছে কুঁড়িগুলি পাতার অন্তরাল হইতে উঁকি মারিতেছে, আবার কোন গাছের চূড়ার উপর প্রকাণ্ড রক্তবর্ণের গোলাপ চতুর্দ্দিকে আপনার সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। বালকেরা যেখানে স্থলপদ্মের মত একটি পর্লানিরন্ ফুটিয়াছিল তথায় দাঁড়াইয়া উহার অপূর্ব্ব লাবণ্য দর্শন করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। যখন তাহারা ঐরূপ অবাক হইয়া কুসুমটির পানে তাকাইয়া আছে তখন উদ্যানস্বামী বেড়াইতে বেড়াইতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি বালকদিগের আনন্দ দেখিয়া বলিলেন, কিহে গোলাপ ফুলের সহিত তোমরা কি কহিতেছ? মতি বলিল, না মহাশয়, আমরা অনিমেষ নয়নে কেবল ইহার শোভা দেখিতেছি, আহা কি মনোহর ফুল!

উদ্যানস্বামী বলিলেন, বাস্তবিকই গোলাপ তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছে! মতি কহিল, মহাশয় আমরা ত তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, অনুগ্রহ করিয়া যদি আমাদিগকে গোলাপ কি উপদেশ দিতেছে বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে আমরা সকলে উপকৃত হই।

উদ্যানস্বামী বলিলেন গোলাপ তোমাদের নিকট যে উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করিতেছে তাহা মন দিয়া শুন।

গোলাপ বলিতেছে বালক বালিকারা ফুল বড় ভালবাসে, আমি পুষ্পের মধ্যে উৎকৃষ্ট সুতরাং আমায়ও তাহারা অত্যন্ত ভালবাসে। তাহারা আমায় আপনাদের পড়িবার গৃহে রক্ষা করে, কখন আমায় হস্ত বা পদ দ্বারা দলন করে না। আমি ও তাঁহাদিগকে ভালবাসি, আমি তাহাদিগকে কখনও কোন আঘাত করি না। যদি ও কখন আমায় তুলিতে গিয়া তাহাদের হাতে কাঁটা ফুটে সে কাঁটা আমার গাত্রের নহে। ছেলে মেয়েদের সঙ্গে থাকিতে আমি বড় ভালবাসি। তাহারা কচি কচি অঙ্গুলগুলি দ্বারা যখন আমায় তুলিয়া লয় আমার তাহা বড় ভাল লাগে। যখন পীড়িত হয় তখন আমি তাহাদের শয্যার উপর একপাশে অবস্থিতি করি, তাহারা রোগের কষ্টের মধ্যে যখন আমার দিকে ফিরিয়া চায় তখন তাহাদের রোগকাতর মুখেও হাসির উদয় হয়। আমি তাহাদের সুখ দুঃখের বন্ধু। বালক বালিকাগণ আমায় বড় ভালবাসে, তাহারা আমায় বলে গোলাপ তুমি এত সুন্দর যে আমরাও তোমার মত হইতে ইচ্ছা করি। আমি বলি তোমরাও ইচ্ছা করিলে আমার ন্যায় সুন্দর হইতে পার। যদি তোমরা বল, তোমাদের আকার তেমন ভাল নয়, তোমাদের মুখ তেমন সুগঠিত নয়, তোমাদের পটল চেরা উজ্জ্বল চক্ষু, কৃষ্ণবর্ণ কেশ, তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ প্রভৃতি কিছুই নাই। তবে কিরূপে আমার ন্যায় সুশ্রী বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিবে।

তাহার উত্তরে আমি এই বলি তোমরা যে সৌন্দর্য্যের কথা বলিতেছ তাহা আমার কথিত সৌন্দর্য্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি যে সৌন্দর্যের বিষয় বলিতেছি তাহা তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছি।

সেই যে একটী বালিকার কথা তোমরা সখায় পড়িয়াছ, যে বালিকা তাহার পিতার সহিত ইংলণ্ডের উত্তরদিকে সমুদ্রের মধ্যে একটী দ্বীপস্থ কোন আলোক লঞ্চে বাস করিত তাহার কথা স্মরণ কর।

একদিন ঘোরতর ঝটিকা উঠিয়া সমুদ্রকে নাচাইতেছিল এমন সময়ে বালিকা দেখিল, অদূরে একখানি জাহাজ বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইতেছিল। বালিকা নাবিক ও আরোহীগণের মৃত্যু সন্নিকট দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পিতার কাছে দৌড়িয়া গেল। যাহাতে তাহার পিতা ছোট নৌকায় করিয়া গিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষার উপায় করেন বালিকা তজ্জন্য পিতার কাছে সানুনয় প্রার্থনা করিল। বহুদর্শী বালিকার পিতা দেখিলেন এ সময়ে সমুদ্রে একখানা ছোট নৌকা ভাসাইয়া যাওয়া বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি যাইতে অস্বীকার করিলেন কিন্তু বালিকা কোনমতে ছাড়িল না, নিজেও সেই নৌকায় পিতার সহিত যাইবে বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিল। পিতা কন্যার এই সাধু অনুরোধ অবজ্ঞা করিতে পারিলেন না। কন্যা ও পিতা তরঙ্গিত সমুদ্রে নৌকা ভাসাইলেন। নৌকাখানি একবার তরঙ্গের উপর উঠিতে লাগিল আবার পরক্ষণেই গভীর স্রোতের ভিতর পড়িয়া অদৃশ্য হইতে লাগিল, কি ভয়ানক দৃশ্য? কিন্তু তাহারা অবশেষে সেই জাহাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আরোহীগণকে নৌকায় তুলিয়া নিরাপদে আলোকমঞ্চে পৌঁছিলেন।

এই বালিকার মুখখানি সুন্দর ছিল কি না তাহা আমি বলিতে পারি না—তাহার চক্ষু ও কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও বড় বড় ছিল কি না তাহাও বলিতে পারি না, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি তাহার ন্যায় সুন্দরী বালিকা ভূমণ্ডলে বড় বিরল। আমার ইচ্ছা যে বালক বালিকাগণ তোমরাও এইরূপ সুন্দর হও। আমি তোমাদের আকার বা গঠনের সৌন্দর্য্য চাই না, যাহাতে তোমাদের চরিত্র সুন্দর হয় ইহাই প্রার্থনীয়। আপনাদিগকে সুন্দর দেখাইবার চেষ্টা করিও না। যাহাতে প্রকৃত সুন্দর হইতে পার তাহাই কর। চেষ্টা করিলে সকলেই এইরূপ সুন্দর হইতে পারে। যদিও শারিরীক সৌন্দর্য্য নিজের ইচ্ছায় লাভ করা যায় না। কেহ তাহার হাত পায়ের গঠন, চক্ষু ও চুলের রং বদ্‌লাইতে পারে না বটে, কিন্তু সকলেই মনে করিলে লোকের উপর দয়া প্রকাশ করিতে পারে, অপরকে ভালবাসিতে পারে, স্বার্থত্যাগ করিতে ও সাধু হইতে পারে। যে এইরূপ করিতে পারে সেই নিঃসন্দেহ পরম সুন্দর হয় ও লোকের মন হরণ করে। এই সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য। যে দেখিতে নিতান্ত কদাকার সেও এই সৌন্দর্য্য লাভ করিতে পারে। গোলাপ আরও বলিতেছে, যদি তোমরা আমার মত হইতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে আমি যেমন একটু একটু করিয়া বর্দ্ধিত হই, তোমাদিগকেও সেইরূপ বাড়িতে হইবে। একদিনে আমি এমন সুন্দর হই নাই অল্পে অল্পে আমাকেও গজাইতে হইয়াছে। তোমাদিগকেও একটু একটু করিয়া জ্ঞান ও চরিত্রের উন্নতি করিতে হইবে। যদি তোমাদের দেহের আকার বাড়ে তাহা প্রশংসার বিষয় নহে, যাহাতে তোমাদের জ্ঞান বর্দ্ধিত হয় ও যাহাতে তোমরা সাধু হও তাহা করিবে। যদি তোমাদের দেহ বর্দ্ধিত অথচ তোমরা কুসঙ্গে পড়িয়া হৃদয়ের সরলতা হারাও ও সত্য হইতে বিচলিত হও তবে আমি বলিব যে তোমরা শ্রীহীন হইতেছে।

বাগানের মধ্যে পিপ্ড়া, সামুক, প্রভৃতি অনেক শত্রু আছে, তাহারা সুবিধা পাইলেই বাগানের ফুলদিগকে নষ্ট করিতে ক্রুটী করে না। সেদিন আমার সঙ্গী অপর একটী গোলাপের নিকট কোন পোকা আসিয়া তাহার দলের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তথায় ডিম পাড়িল, ক্রমে ফুলটী কদাকার হইয়া পড়িয়াছে, সে আর গজাইতেছে না, ঐ দেখ তাহার কি অবস্থা হইয়াছে। বালক বালিকাগণ তোমাদেরও এইরূপ কতকগুলি শত্রু আছে যদি আমার ন্যায় সুন্দর হইতে চাও তবে খুব সাবধান, এই সকল শত্রু যেন তোমাদের মনে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বনাশ না করে। যখন দেখিবে এই শত্রুদিগের মধ্যে কেহ অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবে নচেৎ ইহারা মনের মধ্যে কিছুদিন বাস করিলে কাহার সাধ্য তাহাদিগকে আর স্থান ভ্রষ্ট করে? যে সকল পোকা মনের ভিতর প্রবেশ করিলে ইহা ছারখার করে তাহাদের নাম জানিতে কি তোমাদের ইচ্ছা হয়? যে পোকা ইচ্ছা করিলে রক্ত, ও কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিতে পারে, যাহার গতি বড় দ্রুত, উহার নাম ক্রোধ; ইহার বড় প্রভাব ইহা মনুষ্যকে কর্কশ ও কটু বাক্য উচ্চারণ করায় ও ইহার বশীভূত হইয়াই একজন অপরের সর্ব্বনাশ করে

আর একটী কদাকার পোকার নাম স্বার্থপরতা; ইহা লোককে নিজের সুখে এত ব্যস্ত করে যে অপরের কষ্টের দিকেও তাহার দৃষ্টি পতিত হয় না। ইহা যেমন মানুষকে কদাকার করে এমন কিছুতে করে না। আবার ইহার বিপরীত স্বার্থনাশ মানুষকে যেমন সুশ্রী করে এমনও আর কিছুতে হয় না। তৃতীয় পোকা সর্ব্বদা লুকাইয়া থাকিতে ভালবাসে ও আস্তে আস্তে চলে ও কেহ ইহাকে সহজে ধরিতে পারে না, ইহার নাম অসত্য। সাবধান—ইহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া বড় কঠিন। যদি কেহ বলে এই বালককে বিশ্বাস করা যায় না তাহার তুল্য দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই।

চতুর্থ পোকাটী দেখিতে বড় উজ্জ্বল, নানা বর্ণে চিত্রিত—তৃতীয় পোকার ন্যায় ইহা লুকাইয়া ধীরে ধীরে যায় না। ইহা সাহসের সহিত চারিদিকে ভ্রমণ করে এবং সকলকে আপনার রূপ প্রদর্শন করে। যে সকল বালক বালিকা দেখিতে সুন্দর বা খুব বুদ্ধিসম্পন্ন এই পোকা তাহদের অধিক অনিষ্ট করে, এ পোকার নাম গর্ব্ব। আর একটী কদাকার পোকা আছে এই পোকা প্রতিদিন বালক বালিকাগণের বালিশের উপর কখন বা তাহাদের চক্ষের উপর বিচরণ করে। ইহা তাহাদিগকে জৃম্ভণ করায় এবং "আর একটু ঘুমাই আর একটু ঘুমাই", এবং "আমি এত পড়া তৈয়ার করিতে পারি না" এইরূপ কথা উচ্চারণ করায়। এই পোকার নাম অলসতা।

আর অনেকগুলির নাম বলিয়া যাই—অবাধ্যতা, নির্দ্দয়তা, অপবিত্রতা, তাহারা যেন কোনরূপে মনের ভিতর প্রবেশ করিতে না পায়। যদি কখন মনের মধ্যে প্রবেশ করে তাহাদিগকে যত্ন পূর্ব্বক তাড়াইয়া দিবে। ইহারা সহস্র সহস্র বালক বালিকাকে নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। এই সকলের বিপরীত বিনয়, পরার্থতৎপরতা, সত্য, লজ্জা, মনোযোগিতা, বাধ্যতা, দয়া ও পবিত্রতা, নামক গুণগুলি যাহাতে মনে স্থান পায় তদ্বিষয়ে যত্নশীল হও। উদ্যান স্বামীর কথা শেষ হইলে বালকগণ আনন্দে করতালি দিতে লাগিল। বালকগণ সন্ধ্যা আগত প্রায় দেখিয়া গোলাপের কথা কহিতে কহিতে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল।

সখা।
নবম ভাগ। ১২শ সংখ্যা।

ডিসেম্বর, ১৮৯১।

বিবিধ।

পার্সি সম্প্রদায়ের দান।—ভারতবর্ষের মধ্যে যত জাতি ও যত সম্প্রদায় আছে, তন্মধ্যে বোম্বাইর পার্সি সম্প্রদায়ের ন্যায় স্বজাতির উন্নতি কল্পে আর কোনও জাতি বা সম্প্রদায় অকাতরে এত অর্থ দান করে নাই। বোম্বাইর পার্সি সম্প্রদায় দানশীলতার জন্য বিখ্যাত। বিগত আড়াই শত বৎসর হইতে তাঁহাদের এই স্বজাতি-হিতৈষণার সূত্রপাত হইয়াছে। এই পার্সি সম্প্রদায়ের আদিম অধিবাস পারস্য দেশের অন্তর্গত ইরান প্রদেশে। ইরান আদিম আর্য্যভূমি,—হিন্দু ও পার্সি এই উভয় জাতির পূর্ব্ব পুরুষ একই বংশসম্ভূত। সম্প্রতি এই পার্সি সম্প্রদায়ের একজন বড় লোকের মৃত্যু হইয়াছে,—তাঁহার নাম এল, এম, পেটিট। তিনি জীবদ্দশায় ১৬ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। পার্সি সম্প্রদায়ের পিতৃমাতৃহীন অনাথ শিশুদিগের লালনপালন জন্য এক আশ্রম করিয়া গিয়াছেন,—তজ্জন্য ১০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন।

*
* *

শিশুদের দয়া।—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মান্দ্রাজে একবার মহাদুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। তখন নানাদেশ হইতে মান্দ্রাজবাসীদের সাহায্যার্থ অর্থ প্রেরিত হইয়াছিল। বাঙ্গলাদেশ হইতেও অনেকে টাকা পাঠাইয়াছিলেন। তখন বিলাতের এক পরিবারের কয়েকটী ছেলে চা পানের সঙ্গে চিনি খাওয়া বন্ধ করিয়াছিল। বিনা চিনিতেই চা পান করিত। তাহাতে যে পয়সা বাঁচিয়াছিল, তাহা দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদের সাহায্যের জন্য দান করিয়াছিল। বোম্বাই সহরে নিরাশ্রয় কুষ্ঠরোগীদের বাসের জন্য এক আশ্রম প্রস্তুত হইবে,—বিলাতের তিনটী বালক সেই আশ্রমের সাহায্যার্থ চাঁদা তুলিয়া ১৭৲টী টাকা পাঠাইয়াছে। এই ১৭৲টী টাকার দাম ১৭ লক্ষ টাকা। কোথায় বোম্বাই, আর কোথায় বিলাত;—আর সেই দেশের ৩টী শিশু আমাদের দেশের কুষ্ঠরোগীদের কষ্ট দূরের জন্য অর্থ পাঠাইয়াছে। এই সংবাদ পাঠ করিয়া কি দুর্ভাগ্য কুষ্ঠরোগীদের কষ্ট ভাবিয়া সখার পাঠক পাঠিকাদিগের প্রাণ বিগলিত হইবে না?

*
* *

ধর্ম্মবীর।—খৃষ্টধর্ম্ম সম্প্রদায়ের "মুক্তি-ফৌজের" দল বর্ত্তমান সময়ে জগতে তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছেন। খৃষ্টজগতের যে সকল লোক পানাশক্তি ও কুপ্রবৃত্তিতে মজিয়া জগতে পাপের স্রোত বৃদ্ধি

করিতেছে, এই ফৌজের লোকেরা তাঁহাদের অনেককে পাপের হস্ত হইতে মুক্ত করিতেছেন। জেনেরল বুথ এই ফৌজের অধিনায়ক। দারিদ্র্য অনেক দোষের আকর—পাপের সহচর। লোকের দারিদ্র্য দুঃখ দূর করিতে না পারিলে তাহাদিগকে পাপের হস্ত হইতে রক্ষা করা কঠিন। বুথ সাহেব তাহা বুঝিতে পারিয়া ইংলণ্ডের গরীব লোকদের জন্য অষ্ট্রেলিয়া দেশে এক উপনিবেশ স্থাপন করিবার আয়োজন করিতেছেন। তাঁহার এই উপনিবেশের সাহায্যার্থ খৃষ্টজগতের লোকেরা মুক্ত-হস্তে অর্থ দান করিতেছেন। যে গরীবদের অবস্থার উন্নতির উপায় ভাবিয়া দেশশুদ্ধ লোক হতাশ হইয়াছিলেন, ধর্ম্মবীর বুথ তাহার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। এই মহাপুরুষ ভারতবর্ষ ভ্রমণে আসিয়াছেন,—আগামী ৮ই জানুয়ারি হইতে ১২ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা নগরীতে অবস্থান করিবেন এবং স্থানে স্থনে বক্তৃতা করিবেন।

* **

স্বার্থত্যাগ।—"মুক্তিফৌজের" প্রচারক ও প্রচা-রিকাগণ সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীর বেশে দিন যাপন করেন। তাঁহাদের ত্যাগ স্বীকার দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। সামান্য আহার ও সামান্য বেশভূষা করিয়া থাকেন। ইহার উপর আবার, বৎসরে এক সপ্তাহ কাল তাঁহাদের বৈরাগ্যের সময় আছে—সামান্য আহার্য্য [illegible] হইতেও অর্থ বাঁচাইয়া এখন গরীব দুঃখীদের [illegible] সাহায্যার্থ দান করিয়া থাকেন। যাঁহারা দীনের বেশে দিনযাপন করেন, তাঁহাদের আবার দান করা কি মহত্ত্বের কার্য্য নহে? এই ফৌজের সৈন্যগণ বৎসরে এই বৈরাগ্য সপ্তাহে ২ লক্ষ ১২॥০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহারা গত বৎসর ভিক্ষা করিয়া ১৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই টাকা দ্বারা ২ লক্ষ দরিদ্রের শয্যা ও ২০ লক্ষ দরিদ্রের আহার যোগাইয়াছেন।

* **

জন্ম, মৃত্যুর তালিকা।—জর্ম্মণ দেশীয় একজন লোক পৃথিবীর জন্ম মৃত্যুর তালিকা দেখিয়া ঠিক করিয়াছেন মানুষের গড় আয়ু ৩৭ বৎসর কাল। ১৭ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই এক শতের মধ্যে ২৫ জনের মৃত্যু হয়; এক হাজারের মধ্যে এক জন মাত্র এক শত বৎসর এবং ৬ জন ৬৫ বৎসর কাল বাঁচিয়া থাকে। বৎসরে ৩ কোটী ৫২ লক্ষ ১৪ হাজার, প্রতিদিন ৯৬ হাজার ৪ শত ৮০ জন, ও প্রতি ঘণ্টাতে ৪ হাজার ২০ জন লোকের মৃত্যু হয়; আর বৎসরে ৩ কোটি ৬৭ লক্ষ ৯২ হাজার, প্রতি-দিন ১ লক্ষ ৮ শত ও প্রতি ঘণ্টাতে ৪ হাজার ২ শত লোক জন্মগ্রহণ করে। দীর্ঘকায় লোক খর্ব্বা-কৃতি লোকদের অপেক্ষা দীর্ঘজিবী হয়। '৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা অধিক সংখ্যক জীবিত থাকে—৫০ বৎসর পার হইলে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষেরা অধিক বাঁচে। অবি-বাহিত অপেক্ষা বিবাহিতেরা অধিক দিন বাঁচে। বসন্ত ঋতুতে যাহাদের জন্ম হয়, তাহারা অন্য ঋতুতে যাহারা জন্মে, তাহাদের অপেক্ষা বলবান হয়। দিবাভাগ হইতে রাত্রিতে জন্ম, মৃত্যু অধিক হইয়া থাকে।
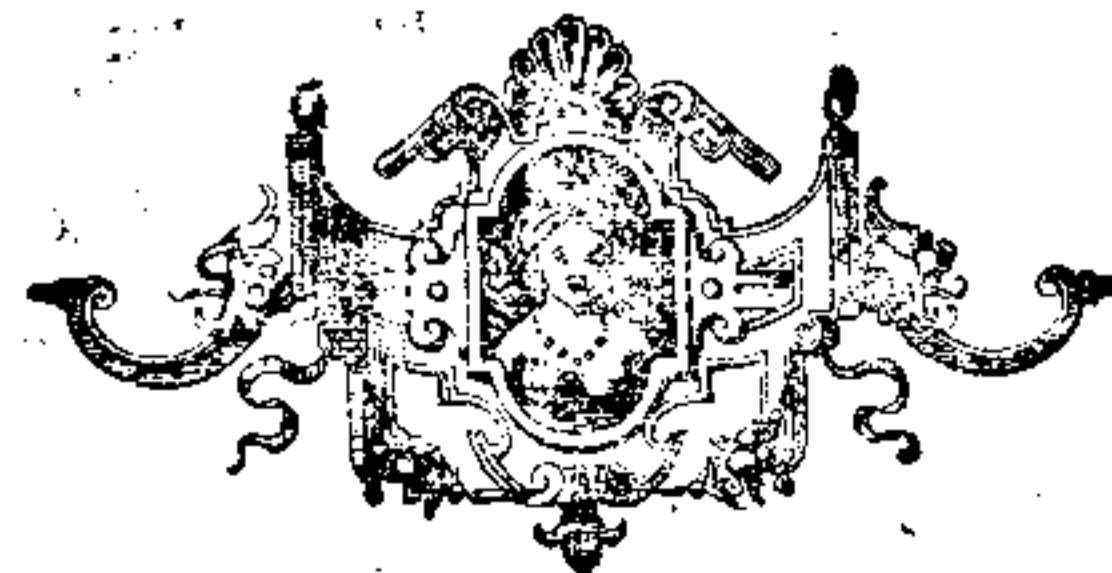
বনফুল।

"সখা"র হৃদয়ে কিবা শোভে বনফুল!
দেখে ভাই হয় নাকি পরাণ আকুল?
দেখ কিবা প্রতিথরে বর্ণের বাহার!
বনের কুসুম তবু শোভা চমৎকার!

সে আজ সেজেছে ভাল ভালবাসি যারে
তাই এত হৃদয়েতে হাসি নাহি ধরে।
"সখা"র সরল প্রাণে সুমধুর হাসি—
আমি সদা দেখিবারে বড় ভালবাসি।

বল সখা কে দিয়াছে সাজায়ে তোমারে
সুখবর দিয়াছিলে কবে বুঝি কারে?
ফেলেছিলে কা'র দুঃখে বুঝি অশ্রুবারি!
তাই আজ লভিয়াছ কৃতজ্ঞতা তারি।

মায়া দয়া সরলতা হৃদে আছে যার
কেনা তারে ভালবেসে দিবে উপহার?
পর দুঃখে যায় যেবা আপনারে ভুলে
কেনা তারে সাজাইবে চারু বনফুলে?

অধ্যবসায়।

(প্রাপ্ত)

যেই পৃথিবীতে যে ব্যক্তির অধ্যবসায় আছে, তিনি যে কোন প্রকার বিপদ বা বিঘ্নে পতিত হউন না কেন—সহজে অতিক্রম করিতে পারেন। মানুষের যত প্রকার সদ্‌গুণ থাকা উচিত, তন্মধ্যে অধ্যবসায় একটি। কথিত আছে, যখন উইলিয়াম কবেট্ বালক ছিলেন তখন তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে নাবিক হইবার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হন। তিনি একদিন নিকটস্থ এক বন্দরে গিয়া একখানি জাহাজের অধ্যক্ষের নিকট অনেক গুলি আবেদন পত্র প্রদান করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার কোন [illegible]নই গ্রাহ্য হইল না। তথাপি তিনি নিরুৎসাহ না হইয়া একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া পরবর্ত্তী নগরে যান। এই সময় তাঁহার সমস্ত টাকা কড়ি ফুরাইয়া গিয়াছিল, এবং তিনি এখানেও নাবিক হইবার কোন সুবিধা পাইলেন না। পথে গাড়িতে যাইবার সময় একটি ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি কবেটকে তাঁহার পিতার নিকট ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু কবেট দৃঢ়স্বরে বলিলেন "মহাশয় মাপ করুন, আমি কখনই বাড়ী ফিরিয়া যাইব না, আমি যদি এখন তথায় ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে সকলে আমাকে 'নির্ব্বোধ' বলিয়া ঠাট্টা করিবে; আমি যখন প্রতিজ্ঞা করিয়া বাটী হইতে আসিয়াছি তখন যাহাই ঘটুক না কেন, আমার কার্য্য শেষ না করিয়া বাটিতে ফিরিব না।" ঐ ভদ্রলোকটি তাঁহার এই অধ্যবসায় দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং নিজ বাটিতে লইয়া গিয়া তাঁহাকে এক কেরাণিগিরি পদ প্রদান করিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি সংসারে একজন গণ্য মান্য লোক হইয়াছিলেন।

রবার্ট ব্রুস ইংলণ্ডের অধীনতা হইতে স্বদেশ স্কটলণ্ডকে উদ্ধার করিতে ও সিংহাসন পাইতে ছয়বার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু ছয়বারই অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। একদিন তিনি একটা ভগ্নপ্রায় গোলাঘরে বসিয়া তাঁহার পরাজয়ের বিষয় ভাবিতেছেন, এমন সময় তিনি দেখিলেন, যে, একটা মাকড়সা ছয়বার কড়িকাষ্টে উঠিবার চেষ্টা করিল কিন্তু প্রত্যেক বারেই অকৃতকার্য্য হইল। কিন্তু সপ্তমবারে সেটা কৃতকার্য্য হইল। তখন তিনি একটা সামান্য মাকড়সার এইরূপ অধ্যবসায় দেখিয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইলেন, এবং সৈন্যসামন্ত সজ্জিত করিয়া ব্যানক্‌বার্ন যুদ্ধে জয়ী হইয়া স্কটলণ্ডকে উদ্ধার করিলেন।

একদিন শেরিডান্ পার্লামেণ্ট বক্তৃতা করিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ বক্তৃতা করিবার পর তিনি আর বলিতে পারিলেন না। তখন শ্রোতৃবর্গ নানারূপ বিদ্রূপ করাতে তিনি বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার বন্ধুগণ তৎপরে তাঁহাকে বলিলেন যে তিনি কখনও সদ্বক্তা হইতে পারিবেন না। তখন তিনি বলিলেন "আমি যে প্রকারে হউক আমার ইচ্ছা সফল করিব।" তৎপরে তিনি অধ্যবসায় গুণে সদ্বক্তা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

তোমরা বোধ হয় কেটোর নাম শুনিয়াছ। তাঁহার পিতা অতিশয় মাতাল ছিলেন বলিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন এবং তাঁহার মাতার জন্য সামান্য টাকা কড়িও রাখিয়া যান নাই। কেটোকে অগত্যা অথিতিশালায় থাকিতে হইল। কিন্তু হতভাগ্যক্রমে তাঁহার বয়ঃক্রম যখন পনর বৎসর

তখন বধির হইয়া যান। তথাপি তিনি ক্রমাগত নানা প্রকার পুস্তকাদি পাঠ করিয়া প্রভূত বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দেখিয়া কতকগুলি দয়ালু ব্যক্তি তাঁহাকে অতিথিশালা হইতে লইয়া আসিয়া এক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। এরূপে বিদ্যা-শিক্ষার উপায় প্রাপ্ত হইয়া তিনি কালক্রমে অতি-শয় বিদ্বান হইয়া উঠিলেন এবং অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

মগধদেশে পুরুবংশীয় প্রসিদ্ধ জরাসন্ধের পর ক্রমান্বয়ে ৩৭ জন রাজার রাজত্বকাল পরে প্রবল পরাক্রান্ত নন্দ মগধসিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান আপন অধীন করিয়াছিলেন। নন্দের নয় পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ চন্দ্রগুপ্ত এক ক্ষৌরকারপত্নী রাজকিঙ্করীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত জ্যেষ্ঠ ও গুণে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ হইলেও দাসী গর্ভজাত বলিয়া তাঁহার ভ্রাতা-গণ তাঁহাকে ঘৃণা করিত। রাক্ষস ও শকটার নামে রাজার দুই বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন।

একদা নন্দ কোন কারণবশতঃ শকটারের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সপরিবারে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখেন। অনাহারে শকটারের সমস্ত পরি-বার প্রাণত্যাগ করিল, কেবল তিনি জীবিত রহিলেন।

অনন্তর তিনি বুদ্ধিবলে কারামুক্ত হইয়া স্বপদ পুনরায় পাইলেন এবং রাজার উপর প্রতিহিংসা লইবার জন্য নানা উপায় দেখিতে লাগিলেন। একদিন দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে, একটি মাঠে একটি কৃষ্ণকায় ব্রাহ্মণ একমনে এক একটি কুশ উপড়াইয়া তাহাতে ঘোল ঢালিয়া দিতেছেন। তাহা দেখিয়া শকটার আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ঐ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! আপনার নাম কি? কি জন্য এই কষ্টকর কার্য্য করিতেছেন?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন "আমার নাম চানক্য শর্ম্মা। আমি কিয়ৎ দিন হইল বিবাহ করিতে এই পথে যাইতেছিলাম, পায়ে কুশ বিদ্ধ হইয়া বিবাহে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে—। এই জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে এক একটি কুশ উপড়াইয়া তাহার নিম্নে ঘোল ঢালিয়া দিব, তাহা হইলে আর তাহা বর্দ্ধিত হইতে পারিবেক না।" শকটার চাণক্যের বাক্য শুনিয়া ও তাঁহার আকার দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে ইহাঁর মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অধ্যবসায়সম্পন্ন, ও বুদ্ধিমান পণ্ডিত আর নাই। যদি কোন প্রকারে রাজার উপর ইহাঁর ক্রোধ প্রদীপ্ত করিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে নন্দবংশ ছারখার হইবে। অনন্তর তিনি ভক্তি পূর্ব্বক চাণক্যকে বলিলেন "মহাশয়! আপনি এই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নগরে আসিয়া চতুষ্পাঠী করুন আমি তাহাতে সহায়তা করিব; আর আমি অনেক লোক আনিয়া এখনই সমস্ত মাঠ কুশশূন্য করি-তেছি।" এই বলিয়া তাঁহাকে নিজ বাটিতে লইয়া আসিলেন।

এমন সময় রাজার বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইল। রাক্ষসের উপর শ্রাদ্ধোপযোগী ব্রাহ্মণ আনিবার ভার ছিল। এদিকে শকটার কাহাকেও কিছু না বলিয়া চাণক্যকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক রাজবাটিতে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে পাত্রীয় আসনে বসাইয়া দিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিলেন। কিয়ৎক্ষণপরে রাক্ষস এক সুলক্ষণা-ক্রান্ত ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া সভায় আসিলেন এবং দেখিলেন যে পাত্রীয় আসনে এক কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ বসিয়া আছে। তখন তিনি দ্রুতবেগে রাজার নিকট গিয়া বলিলেন "মহারাজ! শকটার একটা কোথাকার কদাকার ব্রাহ্মণকে আসনে বসাইয়া

গিয়াছে।" রাজা দ্রুতবেগে তথায় গিয়া চাণক্যের শিখা ধরিয়া আসন হইতে উঠাইয়া দিলেন। চাণক্য সভামধ্যে অপমানিত হইয়া ভূমে পদাঘাত করিয়া কম্পান্বিত কলেবরে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"তুই যেমন বিনা দোষে আমার শিখা ধরিয়া আকর্ষণ করিয়াছিস্ যতকাল না তোকে সবংশে বিনাশ করিব ততকাল এ শিখা বন্ধ করিব না।" এই বলিয়া দ্রুতবেগে সভা হইতে বহির্গত হইয়া শকটারের নিকট উপস্থিত হইলেন।

শকটার চাণক্যের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। তখন শকটার তাঁহাকে ক্রোধের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে চাণক্য সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিলেন। শকটারও বলিলেন যে তিনি তাঁহাকে প্রাণপণে সহায়তা করিবেন।

কিয়ৎদিন পরে চাণক্য নন্দরাজকে সবংশে বিনাশ করিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন এবং চন্দ্রগুপ্তকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন।

চানক্য, জগতে অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য ও অলৌকিকী প্রতিভাব অবতার ছিলেন। তাঁহার দৃঢ় অধ্যবসায়ের কথা আজও সকলের মনে গ্রথিত রহিয়াছে।
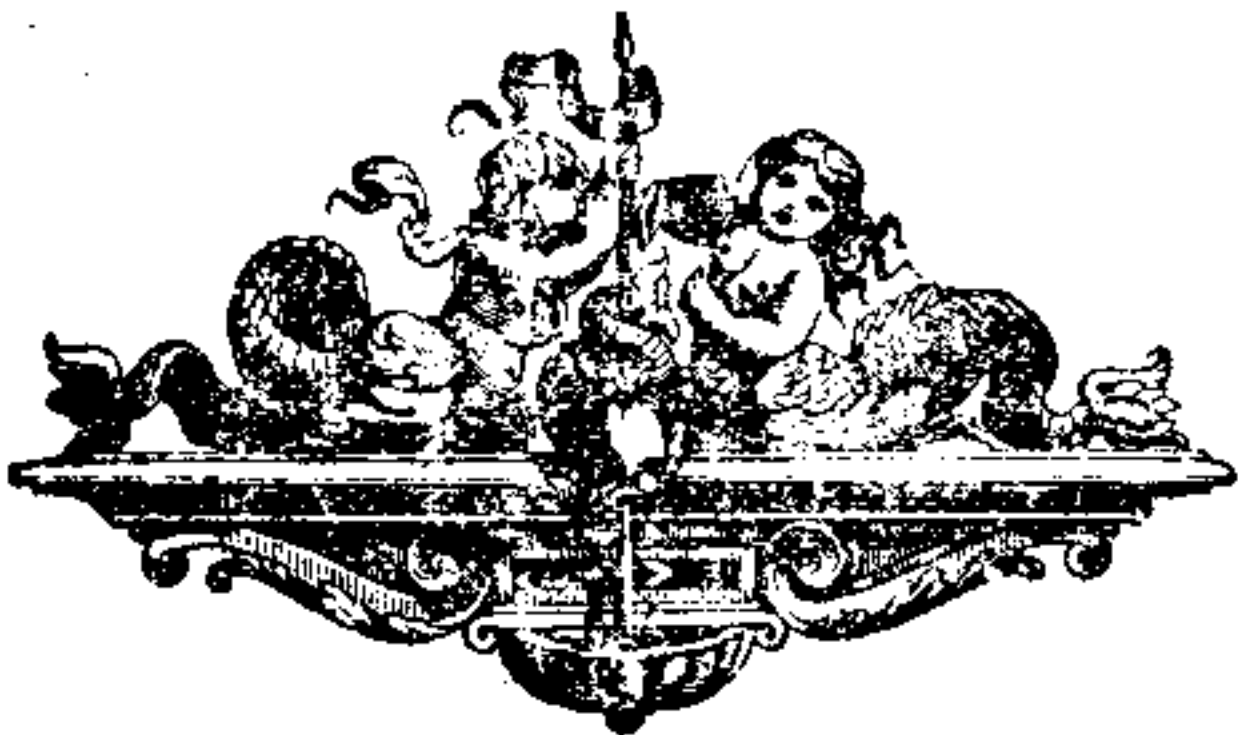
তিমি।

এক দিন সন্ধ্যার পর রাস্তা দিয়া যাইতেছি একটু অন্ধকার হওয়াতে দূরের জিনিষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছ না, এমন সময় আমার সম্মুখে কাল পর্ব্বতের মত একটা জন্তু আসিয়া ভোঁষ করিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িয়াছে, আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম, একেবারে চমকিয়া উঠিয়া একটু তফাতে সরিয়া দাঁড়াইলাম ও দেখিলাম যে, প্রকাণ্ড এক হাতী যাইতেছে। অত বড় জন্তু আমি আর কখন দেখি নাই। একটা মানুষের কাঁধের উপরে আর একটা মানুষ দাঁড়াইলে যতটা উঁচু হয় সেটা ততটা উঁচু হইবে। তাহার প্রকাণ্ড দুই দাঁত, এক একটি মাঝারি রকমের বাঁশের মত মোটা। আর তাহার শরীর এত মোটা যে, বোধ হয় ৩।৪ জন লোকের হাত একত্র করিলেও তাহা বেড়ে পাওয়া যায় না। তখন আমি চিন্তা করিলাম যে, হাতীর মত বড় জন্তু আর পৃথিবীতে নাই। বস্তুতঃ যে সকল জন্তু ভূমিতে চরিয়া বেড়ায় তাহাদের মধ্যে হস্তীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদ্‌কায়। যে জন্তুর কথা আজ তোমাদিগকে বলিব তাহা হাতীর চেয়ে ঢের বড় হয়। সেই প্রকাণ্ড ও বিষম বলশালী প্রাণীকে মনুষ্যে কি প্রকারে বধ করে ও সময়ে সময়ে এই কার্য্যে কত বিপদ হয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অদ্য বলিব।

ঐ জন্তুর নাম তিমি। ইহারা জলে থাকে এই জন্য ইহাদিগকে সাধারণতঃ তিমি মৎস্য বলা হয়। এই সংস্কার বহুদনি হইতে আছে। আমাদের দেশে তিমি মৎস্যশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও উহাকে অল্পদিন পূর্ব্বে মৎস্য বলিয়াই গণ্য করিতেন। আমাদিগের সংস্কৃত অভিধানে "অস্তিমৎস্যস্তিমির্ণাম শত যোজন

বিস্তরঃ" অর্থাৎ তিমি নামে শত যোজন বিস্তৃত এক মৎস্য আছে এই রূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক এই প্রকার বৃহদাকার তিমি কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এটি কল্পনা বলিয়া বোধ হয়।

ভূচর এবং জলচর প্রাণীদিগের মধ্যে যে সকল পার্থক্যের চিহ্ন আছে; তাহার প্রতি মনোযোগ করিলে তিমিকে মৎস্য জাতীয় মধ্যে গণ্য করা যায় না। কারণ মৎস্য জাতি শিশু সন্তানদিগকে স্তন পান করায় না, এবং তদ্রূপ কোন গঠন তাহাদিগের শরীরে নাই, কিন্তু তিমির স্তন আছে ও সন্তানদিগকে স্তন পান করায়। আর একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইহাদিগের রক্তে উষ্ণতা আছে কিন্তু মৎসের রক্তে সেরূপ উষ্ণতা নাই।

তিমির আকার সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক ভ্রান্ত সংস্কার ছিল। কোন কোন লোক বলিয়াছেন যে, ১৬০ ফুট অর্থাৎ ১০৬ হাত দীর্ঘ তিমি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ডাক্তার স্কোরস্‌বি (Dr Scoresby) বলেন যে, সাধারণত তিমি ৭০ ফুটের অধিক দীর্ঘ হয় না। তিনি নিজে ৩২২টী তিমি শিকারের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তন্মধ্যে একটিও ৫৮ ফুটের অধিক হয় নাই। তিনি আরও বলেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ যে তিমি ধরা পড়িয়াছে, তাহার দৈর্ঘ্য ৬৭ ফুট ছিল। তিমির মস্তকের নীচেই যে স্থান সেইটিই সর্ব্বাপেক্ষা মোটা সেই স্থানটীর বেড় সচরাচর ৩০ হইতে ৪০ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কি ভয়ানক জানোয়ার! ৭০ ফুট লম্বা এবং ৪০ ফুট মোটা। এই ভীম শরীরের এক তৃতীয়াংশ কেবল মস্তকটিতেই জুড়িয়া রাখিয়াছে। মাছের পিঠ অর্থাৎ ডাঁড়ার উপর যেমন ডানা থাকে তিমির তাহা নাই; কিন্তু মুখের উভয় পার্শ্ব হইতে দুই ফুট অন্তরে দুইটি ডানা আছে, তাহা ৯ ফুট অর্থাৎ ৬ হাত লম্বা এবং ৫ ফুট চওড়া। তিমির পুচ্ছ অর্থাৎ লেজটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃত, ২৪ ফুট লম্বা। পাড়াগেঁয়ে ছেলেরা গো-শাপ বাড়ীর আঁস্তাকুড়ে এলে লাঠি লইয়া তাড়া করে; সময়ে সময়ে গো-শাপ বিপন্ন হইয়া কোন বালককে এমন লেজের ঝাপটা মারে যে, তাহার হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। তিমিও তাহার লেজের সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। যখন শিকারীরা তিমিকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া উঠায় তখন সে আপন পুচ্ছের দ্বারা এমন জোরে আঘাত করে যে, বড় বড় নৌকা সহস্র খণ্ড হইয়া শূন্যমার্গে ছুটিয়া উঠে। তিমির গাত্রের রং কাল মকমলের মত কেবল মাথার নীচে ও পেটে এবং লেজের সন্ধিস্থানে একটু সাদা রকম। চক্ষু দুটি শরীরের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র—গরুর কি ঘোড়ার চক্ষুর মত, চক্ষের পাতা আছে এবং পাতার অগ্রভাগে রোম আছে। মস্তকের উপরিভাগ হইতে দুইটি অনতি বৃহৎ ছিদ্র লম্ব ভাবে ১২ ইঞ্চি নামিয়া শ্বাস-নালীর সহিত মিশ্রিত হইয়াছে; এই ছিদ্র দ্বারা তিমির নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য সম্পন্ন হয়।

তিমির মুখটি অতি ভয়ানক। একটি বড় তিমি মুখ হাঁ করিলে ১৬ ফুট লম্বা এবং ১০ ফুট চওড়া একটি গহ্বর বাহির হইয়া পড়ে। ইহার দাঁত নাই কিন্তু তালুর পার্শ্ব হইতে প্রায় তিন শত অস্থিখণ্ড দুই শ্রেণীতে সাজান আছে তদ্দ্বারা খাদ্য দ্রব্য পেষণের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। এইগুলিই তিমির অস্থি (whale bone) বলিয়া বিখ্যাত আছে, ও ইহার দ্বারা মনুষ্যের নানা প্রকার প্রয়োজন সাধিত হয়।

ইহার শরীরে আঁইস নাই। চর্ম্ম বসা ও মাংস পেশী স্তরে স্তরে কঙ্কালের উপর বিন্যস্ত রহিয়াছে।

এই প্রকাণ্ড জন্তুর তৈল ও অস্থি মনুষ্যের অনেক কাজে লাগে। এই জন্য বহুকাল হইতে

তিমি শিকার করিবার ব্যবসায় চলিয়া আসিতেছে। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার উত্তর ও পশ্চিমে যে সকল উত্তর ও প্রশান্ত মহাসমূদ্র আছে তথায় তিমি প্রচুর পরিমাণে বাস করে। যে সকল লোক এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয় তাহাদিগের সাহস ও অধ্যবসায় অত্যন্ত আশ্চর্য্য। এক বার তিমি শিকার করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিতে ৩।৪ বৎসর কাটিয়া যায়। এই দীর্ঘকাল সমুদ্র গর্ভে শীতপ্রধান স্থানে বাস করা যে কত কষ্টকর তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই সকল কষ্ট সহ্য করিয়া শিকারীরা যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া তিমি শিকার করে তাহাও পদে পদে বিপদসঙ্কুল। যে স্থানে তিমি বাস করে তাহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশে জাহাজ লইয়া, জাহাজের মাস্তলের উপর ২ জন চৌকীদার অনবরত কোথায় তিমি মাথা উঠাইল ইহাই দেখিবার জন্য চৌকী দিতে থাকে। "ঐ তিমি মাথা তুলিয়াছে" বলিয়া চৌকীদারেরা যেমন চিৎকার করে অমনি ৪।৫ খানি নৌকা জাহাজ হইতে সমুদ্রে নামাইয়া দেওয়া হয়। ও শিকারীরা তৎক্ষণাৎ ঐ সকল নৌকায় চড়িয়া দাঁড় বাহিয়া যে স্থানে তিমি ভাসিয়াছে তাহার নিকট যায়। প্রত্যেক নৌকায় বল্লমের মত এক প্রকার লৌহনির্ম্মিত তীক্ষ্ণধার অস্ত্র এবং ½ ইঞ্চি পুরু ১২০০ ফুট বা তাহার অধিক দীর্ঘ শণের দড়ী নৌকার পশ্চাদ্ভাগে এমত ভাবে গুটান থাকে যে, খোলার সময় কোন রূপে তাহা জড়াইয়া না যায় বা কাহারও কোন স্থানে না বাধে। ঐ দড়ির অগ্রভাগ উক্ত ট্যাঁটার সহিত বাঁধা থাকে। তিমিকে লক্ষ্য করিয়া ট্যাটা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ঐ দড়ি খুলিতে থাকে; এবং তিমি ট্যাঁটা বিদ্ধ হইবামাত্র অত্যন্ত বেগে ছুটিতে থাকে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক বেগে ঐ দড়ির পাক খুলিতে থাকে। এই সময়ে যদি কাহারও হাত, পা, কিম্বা শরীরের কোন অংশ দড়ীর সহিত জড়াইয়া যায় তবে তাহা তৎক্ষণাৎ শরীরের অবশিষ্টাংশ হইতে কাটিয়া দু ফাঁক হইয়া যায়। সুতরাং তিমি শিকারের মধ্যে দড়িগাছটি সতর্কতার সহিত গুটাইয়া রাখা একটি প্রধান কার্য্য।

শিকারীরা নৌকা লইয়া তিমির নিকট গেলে নৌকাধ্যক্ষ ট্যাঁটা মারিবার হুকুম দেন। তৎক্ষণাৎ দাঁড় ছাড়িয়া দিয়া আসিয়া একজন শিকারী অব্যর্থ লক্ষ্য করিয়া অসীম বল সহকারে ট্যাঁটা তিমির শরীরে নিক্ষেপ করে। এই প্রকারে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নৌকা হইতে একেবারে ২।৩টি ট্যাঁটার দ্বারা তিমি আহত হয়। তিমি তৎক্ষণাৎ ছুটিতে থাকে। যতটা দড়ী থাকে ততটা আর কোন ভয় নাই। দড়ি সম্পূর্ণ টান হইলে তখন কাজেই নৌকা ভয়ানক বেগে তিমির সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে থাকে। অনেক্ষণ এই প্রকার ছুটাছুটী করিয়া তিমি বলহীন হইয়া ভাসিয়া উঠে। যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় তিমি ছটফট করিতে থাকে তখন পুনরায় শিকারীদিগের ঘোর বিপদ উপস্থিত হয়। তাহার বিশাল শরীরের ঘর্ষণে ও লাঙ্গুলের ভীষণ তাড়নায় যে তরঙ্গরাশি উঠিতে থাকে তাহা হইতে নৌকা রক্ষা করা বড়ই কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়। অনেক শিকারী এই সময় নৌকা বাঁচাইতে না পারিয়া সমুদ্র মধ্যে প্রাণত্যাগ করে অথবা হঙ্গরাদি হিংস্র জন্তুর গ্রাসে পতিত হয়। কিছুকাল ছটফট করিয়া তিমির মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে থাকে ও পরে মরিয়া যায়। তখন অতি কষ্টে এই ভীমকায় জন্তুকে জাহাজের নিকট লইয়া গিয়া অতি সত্বর ইহার অস্থি ও বসা কাটিয়া রাখিয়া অব্যবহার্য্য অংশ দূর করিয়া দিতে হয়। অস্থি ও বসা তুলিয়া লইতে বিলম্ব হইলে হাঙ্গর ও অন্যান্য হিংস্র জলজন্তুতে অল্পকাল মধ্যে সমুদায় উদরসাৎ

করিয়া ফেলে। এই ভয়ানক ব্যবসায় করিয়া ১৮৪৯ হইতে ১৮৫৬ সাল পর্য্যন্ত ৮ বৎসরে ন্যূনাধিক ৯৭২,৪২৫ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য লাভ করা হইয়াছিল। এইক্ষণ তিমি জাতি ক্রমশঃ বিরল হইতেছে এবং পূর্ব্বের ন্যায় অধিক শিকার হয় না কিন্তু এবৎসরও তিমি শিকার উপলক্ষে একটি ভয়ানক লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়াছিল।

তিমি শিকারের জন্য 'ষ্টার অব্ দি ইষ্ট' নামক জাহাজ গত ফেব্রুয়ারী মাসে ফকল্যাণ্ড দ্বীপের নিকট গিয়াছিল। জাহাজ হইতে তিন মাইল দূরে একটী প্রকাণ্ড তিমি ভাসিয়া উঠিবা মাত্র দুই খানি নৌকা তাহার বধার্থে প্রেরিত হইল। নৌকাদ্বয় উপযুক্ত স্থানে যাইলে এক নৌকা হইতে একজন শিকারী তিমির অঙ্গে একটি টঁ্যাটা বসাইল। তিমি তৎক্ষণাৎ ঐ নৌকা টানিয়া নিয়া ছুটিল এবং এদিক ওদিক অনুমান ৫ মাইল ছুটিয়া পুনরায় যেখানে আহত হইয়াছিল তথায় আসিল। এই সময়ে দ্বিতীয় নৌকা হইতে আর একজন শিকারী তাহাকে আর একটি টঁ্যাটা মারিল। তিমি যন্ত্রণায় অধীর হইয়া কিয়ৎকাল ছট্‌ফট্ করত উভয় নৌকা টানিয়া লইয়া ৩ মাইল গেল, ও পরে জলমগ্ন হইয়া রহিল। কিছুকাল পরে দড়ী ঢিল পড়িলে শিকারীরা দড়ী গুটাইতে আরম্ভ করিল। তিমি ক্রমে ভাসিয়া উঠিয়া ভয়ানক আস্ফালন করিতে লাগিল এবং পুচ্ছের দ্বারা ভয়ানক তাড়না আরম্ভ করিল। এক নৌকা বাঁচিয়া গেল কিন্তু আর একখানি তিমির মুখের আঘাতে উপুড় হইয়া গেল ও শিকারীরা সকলেই সমুদ্রে পড়িয়া গেল। যখন তিমিকে জাহাজের পার্শ্বে আনিয়া বাঁধা হইল তখন দেখা গেল যে আর সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু জেমস্ বার্টলী (James Bartly) নামক একজন আইসে নাই। সকলেই মনে ভাবিল যে এই হতভাগা জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। কিন্তু তিমির শরীর কাটিতে কাটিতে পর দিন প্রাতে শিকারীরা দেখিল যে তাহার পাকস্থলীর মধ্যে কি যেন একটা জীবিত প্রাণী রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ পাকস্থলী দ্বিখণ্ড করা হইল এবং অজ্ঞানাবস্থায় জেমস্ বার্টলীর শরীর বাহির করা হইল। সকলেই তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল; জাহাজের ডাক্তার তাহাকে সমুদ্র জলে স্নান করাইয়া নানা প্রকার চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ২ সপ্তাহ পরে বার্টলীর চৈতন্য হইল, এবং ৩ সপ্তাহ পরে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইল। বার্টলী বলিয়াছে যে তিমির মাথার আঘাত লাগিয়া সে কিয়দ্দূর শূন্যে উঠিয়া পুনরায় জলে পড়িয়াছিল; পরে একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া ক্লেশের সহিত বিস্তৃত ও ভয়ানক অন্ধকার ও গরম একটি স্থানে প্রবেশ করিয়াছিল। তথায় তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাসের কোন কষ্ট হয় নাই। চতুর্দ্দিক হাতড়াইয়া যখন মাংসবৎ পদার্থে তাহার হাত ঠেকিতে লাগিল তখন তাহার বোধ হইল যেন সে তিমির উদর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; তখন নিজের শোচনীয় অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া অজ্ঞান হইয়াছিল, পরে আর কি হইয়াছে তাহা জানে না। পাঠক পাঠিকা তুমি যে বাতী জ্বালাইয়া পাঠ কর, যে চিরুণি দ্বারা স্বীয় সুন্দর কেশ বিন্যাস কর ও অন্যান্য বহুবিধ পদার্থ, যদ্দ্বারা তুমি আপন দেহ বা বাসগৃহ সজ্জিত কর তাহা বার্টলীর ন্যায় কর্ত্তব্য পরায়ণ ও নির্ভীক নাবিকের শ্রমলভ্য।

আয়রে সাধের ছেলেবেলা।

আয়রে সাধের ছেলেবেলা আয়রে ফিরে আয়,
তেম্‌নিতর মনের সুখে
খেল্‌তে পাব মায়ের বুকে
হুতাস প্রাণের দারুণ বিষাদ নাইক কিছু তায়।
আয়রে সাধের ছেলেবেলা আয়রে ফিরে আয়।

আয়রে সাধের ছেলেবেলা আয়রে ফিরে আয়।
ছেলেবেলার সরল হাসি
প্রাণের মতন ভালবাসি
ফুটে ওঠে কুসুমরাশি চাঁদ্‌নি হেসে যায়।
আয়রে সাধের ছেলেবেলা আয়রে ফিরে আয়।

তেম্‌নিতর বনে বনে
গাইব গীতি পাখীর সনে
বনদেবীর বীণার ধ্বনি বইবে মৃদুল বায়।
আয়রে সাধের ছেলেবেলা আয়রে ফিরে আয়।

তেম্‌নি মায়ের কোলে শুয়ে
বুকের ভিতর মাথা নিয়ে
শুন্‌ব সুখে মধুর গাথা নাচ্‌বে পরাণ তায়,
আয়রে সাধের ছেলেবেলা আয়রে ফিরে আয়।

সাতটী চাঁপা জ'য়ের কথা শুন্‌তে ভালবাসি
ভালবাসি "পারুল" দিদীর মুখে মধুর হাসি
সাতটী তারা ফুলের কলি
কুসুম বলে বস্‌তো অলি ;
মাঝখানেতে "পারুল" দিদীর দুল্‌ত কেশের রাশি।
পরী রাণী গাইত গীতি শুন্‌ত রবি শশী।

আয়রে সাধের ছেলেবেলা আয়রে ফিরে আয়।
তেম্‌নিতর সারা বেলা
শুধুই কেবল খেলা ধূলা,
সরল প্রাণের সরল খেলায় সবাই ভুলে যায় ;
আয়রে আমার ছেলেবেলা আয়রে ফিরে আয়।

আয়রে সাধের ছেলেবেলা আয়রে ফিরে আয়
ডাক্‌ছি এত যতন করে—
আস্‌বিনে কি এতেও ফিরে ?
শুধুই কিরে বিষাদ নিয়ে থাক্‌ব আমি হায় ?
শুধুই কিরে পাপের বোঝা—
শুধুই নিজের সুযোগ খোঁজা—
শুধুই কিরে আমার তরে এসেছি ধরায় ?
আমি এমন আমায় নিয়ে থাক্‌তে নারি হায়।

শুন্‌তে ভালবাসি আমি পরী রাণীর গান
দেববালার বীণার তানে জুড়ায় সরল প্রাণ।
শুনে তাদের মোহন গীতি
মেতে ওঠে স্বভাব সতী
সবাই তারা আমায় নিয়ে মধুর গীতি গায়।
শুন্‌ব সে গান ছেলেবেলা আয়রে ফিরে আয়।

প্রত্যুপকার।

কৃতজ্ঞচিত্তে উপকারীর উপকার পরিশোধ করার নাম প্রত্যুপকার। কেহ কোন উপকার করিলে, তাহা আজীবন স্মরণ রাখাই প্রকৃত মহত্ত্বের লক্ষণ। যিনি মহৎ ব্যক্তি, তিনি উপকারীর উপকার পরিশোধ করিয়া অঋণী হইবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। যিনি উপকারীর উপকার অল্প-কালের মধ্যেই বিস্মৃত হন ও তাঁহার উপকার

পরিশোধ করিবার জন্য উৎসাহী হন না, তিনি কৃতঘ্ন ও লোক-সমাজে ঘৃণার্হ। কেহ কেহ এরূপ অকৃতজ্ঞ যে, উপকারীর উপকার পরিশোধ করা দূরে থাকুক, সময়ে তাহার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেও ত্রুটি করে না। পরোপকার করিবার প্রবৃত্তি মানবের চরিত্র গঠনের এক প্রধান ভূষণ। বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, ইহার ন্যায় মহত্তর বৃত্তি আর মানবের নাই। যাঁহার চরিত্র ন্যায়, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি গুণে বিভূষিত, যাঁহার পদধূলি সকল লোকেই ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন, তাঁহার যদি পরোপকার করিবার প্রবৃত্তি না থাকে তবে তাহা বড়ই দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ মানবমণ্ডলীর খুব অল্পসংখ্যক লোকেরই মধ্যে এ গুণটী দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক সকলের সাধ্যমতে উপকারীর উপকার পরিশোধ করিতে চেষ্টা পাওয়া উচিত।

প্রত্যুপকারের আদর্শস্বরূপ একটী সত্য ঘটনার উল্লেখ এই স্থানে করিতেছি।

জয়পুরের মহারাজ রামসিং সর্ব্বগুণালঙ্কৃত নৃপতি ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে প্রজাবৃন্দ সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। একদা রামসিং মৃগয়ার্থ অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ রাজধানীর মধ্যবর্ত্তী রাজপথ দিয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। বহুক্ষণ অন্বেষণ করিয়াও একটী মৃগও পাইলেন না। অগত্যা বিষণ্ণচিত্তে গৃহ প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। মহারাজ রামসিং সূর্য্যের প্রখর কিরণে একান্ত তাপিত ও ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া দ্বারে দ্বারে কিছু আহারীয় দ্রব্য ও জল প্রার্থনা করিলেন; কিছু দুরদৃষ্ট বশতঃ কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। পরন্ত সকলেই তাঁহাকে রূঢ়বাক্যে তাড়াইয়া দিল। পরিশেষে বিফল মনোরথ হইয়া এক পর্ণকুটীরের দ্বারদেশে করাঘাত করিলেন; মুহূর্ত্ত মধ্যেই রুক্ষ রুক্ষ কেশ বিশিষ্ট এক অশীতি বর্ষ বয়স্কা বৃদ্ধা দ্বার উন্মুক্ত করিল। মহারাজ রামসিং কাতর বচনে বৃদ্ধার নিকট জল প্রার্থনা করিলেন। বৃদ্ধা এক মৃণ্ময় পাত্রে জল আনিয়া দিল। রামসিং জল পান করিয়া যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইলেন ও বৃদ্ধাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। মহারাজ রামসিং বলিলেন, তোমার আর কে আছে;—কিরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়? বৃদ্ধা গলদশ্রু নেত্রে বলিল, মহাশয়! আমি চিরদুঃখিনী,—আমার এ সংসারে আর কেহ নাই। আমার পতি অনেক পূর্ব্বেই পরলোকগত হইয়াছেন। আমার একটীমাত্র সন্তান ছিল। কোনরূপে তাহার মুখ দর্শন করিয়া সে শোক বিস্মৃত হইতাম। ভাবিয়াছিলাম এই পুত্র হইতেই আমার দুঃখের অবসান হইবে। কিন্তু বিধাতা আমার সে আশা সফল করিতে দিলেন না। কিছু দিন হইল সেই পুত্র আমাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়াছি সে নাকি রাজসংসারে সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম করিয়া থাকে। এইরূপ বলিতে বলিতে বৃদ্ধার চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় জল প্রবাহিত হইতে লাগিল, দুঃখে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। মহারাজ রামসিং বৃদ্ধার নিকট আত্মপরিচয় গোপন করিলেন ও বলিলেন যে তিনি রাজসংসারে সৈনিক বিভাগে বিধিমত তাহার পুত্রের অনুসন্ধান করিবেন। এইরূপে তিনি বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা বাক্যে বুঝাইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি রাজধানীতে আগমন করিয়াই, সৈনিক বিভাগে বৃদ্ধার পুত্রের অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বহু অন্বেষণান্তে তাহার পুত্রকে বাহির করিলেন।

পর দিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়াই তিনি বৃদ্ধার সমীপে প্রহরী প্রেরণ করিলেন। অনতি-বিলম্বে বৃদ্ধা রাজবাটীতে আনীত হইল। মহারাজ রামসিং সমাদরে বৃদ্ধাকে এক প্রকোষ্ঠে বসাইলেন। বৃদ্ধা দেখিল পূর্ব্বদিন যাহাকে মৃন্ময় পাত্রে জল খাইতে দিয়াছিল, তিনিই মহারাজ। সে ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিল, পরিশেষে সজল-নয়নে রাম সিংহের পদদ্বয় ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। মহারাজ রাম সিংহ বৃদ্ধার হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন, তোমার কোন অপরাধ নাই; বরং তুমি অসময়ে জল দান করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছ। এক্ষণে তোমার আর দুঃখ করিবার প্রয়োজন নাই। নয়ন উন্মিলন করিয়া তোমার প্রাণাধিক পুত্রের মুখদর্শন কর, সে তোমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছে। বৃদ্ধা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাহার পুত্রের মুখচন্দ্র দর্শন করিল।

অতঃপর রামসিং বৃদ্ধার কিছু মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া তাহাকে গৃহে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। এবং তাঁহার পুত্রের এরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন যে, যেন আর কখনও মাতৃ বিমুখ না হয়।

পাঠক পাঠিকাগণ! এখন একবার চিন্তা করিয়া দেখ যে, ইহা কতদূর মহৎ কার্য্য। ইহা হইতে আর অধিক কি উপকার করা যাইতে পারে? ধন্য রামসিং! ধন্য তোমার দয়া! তোমার মত যদি আমাদের দেশের লোক হইত, তাহা হইলে দেশ আনন্দের বাজার হইত। ঈশ্বর কৃপা করুন যেন আমাদের দেশের লোক রামসিংহের অনুকরণ করিতে শিখে।

ধাঁধা।

গত অক্টোবর মাসের ধাঁধার উত্তর—জীবন।

স্থানাভাব বশতঃ যাঁহাদের উত্তর ঠিক হইয়াছে তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইল না।
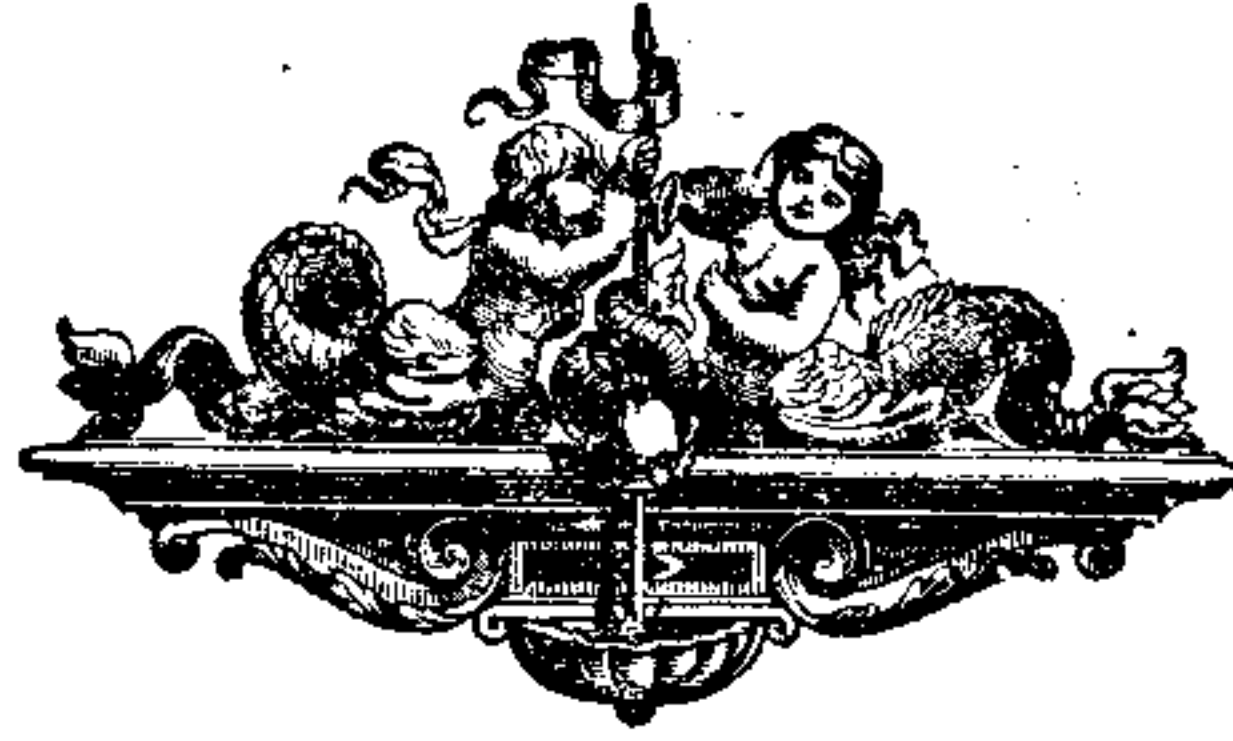
বিশেষ বিজ্ঞাপন।

১৮৯১ সালের ডিসেম্বর মাসের সখা প্রকাশিত হইল। যে সকল গ্রাহকগণ ১৮৯২ সালের সখার মূল্য এখনও প্রেরণ করেন নাই তাহাদিগকে জানান যাইতেছে যে, তাহারা অনুগ্রহ করিয়া অতি সত্বর তাহাদের দেয় স্ব স্ব সখার বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া দেন।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন,
সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ।
৩৩নং মুসলমানপাড়া লেন, কলিকাতা।

সুতরাং তুমিই কি আর আমিই কি—বাঙ্গালি মাত্রেই কি এজন্য তাঁহার নিকট ঋণী নই? আর, দেশে এরূপ প্রতিভাশালী পুরুষের সম্মান হইবে না ত হইবে কার বল দেখি? এক্ষণে আমরা তোমাদের নিকট এই মহাপুরুষের সংক্ষেপে কিছু পরিচয় দিতেছি।

১২৪৫ সালের ১৩ই আষাঢ় অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় ১৮৩৮ অব্দের ২৬এ জুন হুগলি জেলার অন্তর্গত কাঁটালপাড়া গ্রামে এই প্রতিভাশালী পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি স্বর্গীয় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। স্বর্গীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলের এক জন খ্যাতনামা ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন; তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও পৌরুষের অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

শৈশবে বঙ্কিম বাবু বড়ই রুগ্ন ছিলেন, কিন্তু ইঁহার বুদ্ধি বরাবরই বড় তীক্ষ্ণ ছিল। ইঁহার পঠদ্দশার বিবরণ শুনিলে তোমরা অবাক্ হইয়া যাইবে। তোমাদের "ক খ" শিখিতে কত কষ্ট ও সময় গিয়াছে, মনে আছে কি? যদি না থাকে, এখন যাহারা "ক খ" পড়িতেছে, তাহাদের দিকে একটু মনোযোগ করিয়া দেখিলেই উহা কতকটা বুঝিতে পারিবে। কিন্তু এই সমগ্র "ক খ"টিই বঙ্কিম বাবু এক দিনে শিখিয়াছিলেন।

শুধু "ক খ" শিখিবার বেলাই কেন, তিনি পাঠশালায় আগা গোড়াই এইরূপ মেধা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। পাঠশালার কোনও ছেলের প্রশংসা করিতে হইলে, গুরু মহাশয় বলিতেন,—"বঙ্কিম যেমন ছেলে ছিল, এও বা সেই রকম হয়!" আবার শুধু গুরু মহাশয় বলিয়াই বা বলি কেন, কোন কলেজের একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ অধ্যক্ষ এক দিন একটি ছেলের উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, "তাই ত, একে একে পঁচিশটি অঙ্ক কসিয়া ফেলিলে! তুমিও প্রায় বঙ্কিমের মত হইলে দেখিতেছি যে!" একটি বালকের পক্ষে এ সকল কম প্রশংসার কথা নয়। বাস্তবিকই ছেলে বেলা ইনি অঙ্কটি পাইতে না পাইতেই কসিয়া শিক্ষকের নিকট উহার উত্তর আনিয়া দিতেন, এবং বার তের বৎসরের সময় হইতেই অঙ্ক কসিতে তাঁহার কোথাও একটু ভুল হইত না।

খ্রিঃ ১৮৪৬ অব্দে, ইঁহার পিতা যখন মেদিনীপুরের ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন, সেই সময়, ইঁহাকে সেখানকার ইংরাজি ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। সেখানকার শিক্ষকেরা ইঁহাকে স্কুলে পাইয়া কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। বালককে পূরা এক বৎসর এক শ্রেণীতে রাখিতে হয় না—প্রতি ছয় মাস অন্তর এক এক ক্লাস্ উপরে উঠাইয়া দিতে হয়, তবুও বালক যে ক্লাসেই উঠে, সেই ক্লাসেই সবার উপর হয়! সুতরাং এইরূপে অতি উচ্চ শ্রেণীতে উঠিলে, এই বালকের মুখের দিকে চাহিয়া বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে ইঁহার উপর ক্লাসে উঠা বন্ধ করিতে হইয়াছিল।

ইহার পর, ১৮৫১ অব্দে, ইঁহার পিতা চব্বিশপরগণায় বদলি হইয়া আসিলে, বিদ্যাশিক্ষার জন্য ইনি হুগলি কলেজে প্রবেশ করিলেন। হুগলি কলেজে পড়িবার সময়ও ইনি পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিভা দেখাইয়া ইঁহার শিক্ষকবর্গকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। এখানে পড়িবার সময় কিন্তু ইনি বড়ই অমনোযোগী ছিলেন। পড়ার সময়ও হয় ত ইস্কুলের পুস্তকালয়ে গিয়া আলমারির কোণে বসিয়া নানা রকম পুস্তক পড়িতেছেন দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু পড়ার কথা জিজ্ঞাসিলেও কেহ ইঁহাকে ঠকাইতে পারিতেন না। ইনি সমস্ত বৎসর এইরূপে কাটাইয়া পরীক্ষার দিন

কয়েক আগে যত্নের সহিত পড়াগুলি দেখিয়া লই-তেন, এবং ইঁহার এমনই বুদ্ধি ছিল যে তাহাতেই ইঁহার কাজ গুছাইয়া যাইত। প্রতি বৎসরই পরীক্ষা দিয়া কেবল প্রথম হইতেন এমন নয়, সকলের অনেক উপরে থাকিতেন। সুতরাং উচ্চ পুরস্কার ও বৃত্তি লাভ করা যেন ইঁহার ইচ্ছার উপরই নির্ভর করিত। তখনকার ইংরাজ অধ্যাপক-গণের বিশ্বাস ছিল যে মাননীয় জজ্ দ্বারকানাথ মিত্র ও ইঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী ছাত্র হুগলি কলেজে আর দেখা যায় নাই। এইখানে ৬।৭ বৎসর পড়িয়া "সীনিয়র স্কলারশিপ্" (এখনকার ফার্ষ্ট্ আর্ট্স্ স্কলারশিপ্) লাভ করিয়া ইনি কলিকাতার প্রেসি-ডেন্সি কলেজে আইন পড়িতে নিযুক্ত হইলেন।

এ দেশে বি, এ, পরীক্ষার সৃষ্টি হইলে, ১৮৫৮ অব্দে বঙ্কিম বাবুই প্রথম এই পরীক্ষা দিয়া এ দেশীয়দিগের মধ্যে প্রথম বি, এ, হইলেন। কিন্তু কেমন করিয়া ইনি ভারতবর্ষের প্রথম বি, এ, হইলেন, তাহা শুনিলে, তোমরা আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে। ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়িতে নিযুক্ত হইয়া ইংরাজি সাহিত্যাদি পড়া একবারে বন্ধ করিয়াই দিয়াছিলেন, কেবল পরীক্ষার তিন মাস পূর্ব্ব হইতে পরিশ্রম করিয়া, অধ্যাপকের সাহায্য না লইয়াও এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বি, এ, পাশ হইতেই কিন্তু ইঁহার আইন পড়া বন্ধ হইয়া গেল। লেপ্টেনাণ্ট্ গবর্ণর হালিডে সাহেব এই ছাত্রের প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং বি, এ, পাশ হইবার তিন মাস পরেই ইঁহাকে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের পদে অভিষিক্ত করিলেন। বঙ্কিম বাবু ১৮৯১ অব্দে পেন্‌সন্ লইয়া এই পদ পরি-ত্যাগ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, এই কার্য্যে যেরূপ বিচারনৈপুণ্য, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন, তাহা গল্প গাথার ন্যায় বাঙ্গালার ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এজন্য বালকবালিকাদের ক্ষুদ্র পত্রে উহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া প্রস্তাব বৃদ্ধি করিতে আমরা নিরস্ত হইলাম।

১৮৫৩ অব্দে হুগলি কলেজে পড়িবার সময়ই ইনি গ্রাম্য চতুষ্পাঠীতে এক অধ্যাপকের নিকট সংস্কৃত পড়িতেও আরম্ভ করেন। ইঁহার এমনই মেধা যে এক বৎসরের মধ্যেই সমগ্র "মুগ্ধবোধ" নামক দুরূহ ব্যাকরণ ও কয়েকখানি কাব্য পড়িয়া শেষ করেন। পুরা চারি বৎসর ও ইনি চতুষ্পাঠীতে পড়েন নাই, তথাপি সংস্কৃত ভাষায় ইনি সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

যে সাহিত্যসৃষ্টির জন্য বঙ্কিম বাবুর এত যশ, হুগলি কলেজে পড়িবার সময় হইতেই ইনি সেই সাহিত্যসেবায় মনোযোগী হইয়াছিলেন। ইঁহার বয়স যখন তের বৎসর মাত্র, তখন হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদিত "সংবাদ-প্রভাকর" প্রভৃতি পত্রে রীতিমত লিখিতে আরম্ভ করেন। ভবিষ্যতে যে ইনি এক জন বড় লোক হইবেন, গুপ্ত কবি তাহা বুঝিয়াছিলেন, এবং সে জন্য তিনি ইঁহার যথেষ্ট সমাদর করিতেন।

বঙ্কিম বাবু ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতে করিতেই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থনিচয় রচনা করিয়া প্রকাশ করিতে থাকেন। এই সকল পুস্তক দেশের শিক্ষিত লোকেরাও অতিশয় আদর পূর্ব্বক পাঠ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এই সকল পুস্তকের প্রশংসা চলিতে লাগিল। ইঁহার উন্নত চিন্তা, অনুপম চরিত্রচিত্রাঙ্কন এবং অপূর্ব্ব লিপিপ্রণালী বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে এক নূতন যুগের অবতারণা করিয়া দিল।

বঙ্কিম বাবু বুঝিয়াছিলেন বাঙ্গালার ইংরাজি-শিক্ষিত কৃতবিদ্য সন্তান ও বর্ণজ্ঞানমাত্রসম্পন্ন সামান্য লোক উভয়কেই বাঙ্গালা ভাষার অনুরাগী

করিয়া এক ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান করিতে না পারিলে, দেশের প্রকৃত উন্নতি নাই। এজন্য, বহরমপুরে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের পদে কার্য্য করিবার সময়, ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাস (এপ্রিল, ১৮৭২) হইতে "বঙ্গদর্শন" নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রের প্রচার আরম্ভ করেন। বঙ্গদেশের যত বড় বড় লোকই এই পত্রে লিখিতেন—যত ভাল ভাল বিষয়ই এই কাগজে বাহির হইত। অন্যের লেখা যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও, তাঁহার নিজের লেখায় এই কাগজের জীবন ছিল। "বঙ্গদর্শন" বাহির করিবার উদ্দেশ্য সফল হইলেও, সরকারি কার্য্য নির্ব্বাহ ও "বঙ্গদর্শন" সম্পাদন এ উভয়ের জন্য গুরুতর পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যায়। এই নিমিত্ত চারি বৎসর বাহির করিয়াই "বঙ্গদর্শন" বন্ধ করিতে হয়। তথাপি এই অল্পদিনের মধ্যেই "বঙ্গদর্শন" যে কাজ করিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। যত দিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, "বঙ্গদর্শনের" নামও ততদিন কেহ ভুলিবে না।

ইহার পরও সাময়িক পত্রের সহিত ইঁহার সম্বন্ধ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয় নাই। ইঁহার মধ্যম সহোদর সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত স্বর্গীয় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকতায় "বঙ্গদর্শন" পুনর্জীবিত হয়। এই পত্রে, এবং ইঁহার সুযোগ্য জামাতা শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়ের সম্পাদিত "প্রচার" নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রে ইঁহার অনেক লেখা বাহির হইয়াছিল।

বঙ্কিম বাবুর সন্তানের মধ্যে তিন কন্যা; তন্মধ্যে দুই কন্যা ও তাঁহাদের ছোট ছোট সন্তানসন্ততিগণ বর্ত্তমান। ইঁহার বয়স এখন ৫৭ বৎসর। বঙ্কিম বাবু সুস্থদেহে দীর্ঘজীবন লাভ করেন, ঈশ্বরের নিকট দেশের লোকের এখন ইহাই প্রার্থনা।

সোণার খুকু।

আয় মা আমার সোণার খুকু
আয় মা কোলে আয়,
কোলে করে' তুল্‌লে তোরে
প্রাণ জুড়িয়ে যায়।
মুখখানি তোর দেখ্‌লে পরে
বুক ভাসে মোর সুখের সরে,
না দেখ্‌লে যে প্রাণ কি করে
বল্‌বো কি কথায়?—
আয় মা আমার সোণার খুকু আয় মা কোলে আয়!

খুকুর মত গুণের মেয়ে কে আছে রে ঘরে—
কাঁদ্‌লে খুকু মুক্তা গড়ায়, হাস্‌লে মাণিক ঝরে;
খুকু আমার যখন নাচে,
ফুল ফুটে যায় গাছে গাছে,
আঁধার ঘরে গেলে খুকু আলোক ফোটে তায়,—
আয় মা আমার সোণার খুকু, আয় মা কোলে আয়!

আজ্‌কে আমি ছিলাম না মা ঘরে অনেক ক্ষণ,
সোণার খুকু! তাই কি তোমার হ'ল অযতন,
তাতেই মাথা রেখে ভুঁয়ে
অভিমানে ছিলে শুয়ে?
তাই ত তোমায় ছেড়ে যেতে মন না আমার চায়—
আয় মা আমার সোণার খুকু, আয় মা কোলে আয়!

ঐ দেখ মা আর দেরি নাই, ফুরিয়ে আসে বেলা,
ঘাসের বনে মনের সুখে কর্‌বে চল খেলা।
একটু পরে কোলে করে'
আবার তোমায় আন্‌বো ঘরে,
ঘুম পাড়াব সোহাগ করে' নিয়ে বিছানায়—
আয় মা আমার সোণার খুকু, আয় মা কোলে আয়!

ছাগলের বুদ্ধি।

একজন ওয়েল্‌স্‌দেশীয় ভদ্রসন্তান, ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিয়া, সুরাপানে অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছিলেন। প্রতিদিন সময় বিশেষে শুঁড়ীর দোকানে গিয়া, বিলক্ষণ সুরাপান করিয়া আসিতেন।

এই ব্যক্তি একটি ছাগল পুষিয়াছিলেন। ছাগলটি, ক্রমে ক্রমে, তাঁহার অতিশয় অনুগত হইয়াছিল। তিনি যখন যেখানে যাইতেন, ছাগলটি তাঁহার সঙ্গে যাইত। সুরাপানের জন্যে, যখন তিনি শুঁড়ীর দোকানে যাইতেন, সে সময়েও ছাগলটি তাঁহার সঙ্গে যাইত। যখন তিনি সুরা লইতেন এবং সুরা লইয়া পান করিতেন, সে সময়ে সে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিত। ফলতঃ, ছাগলটি এক দিনের জন্যেও তাঁহার কাছ ছাড়া হইত না।

এক দিন তিনি কিঞ্চিৎ সুরা লইয়া ছাগলটির সম্মুখে ধরিলে, ছাগলটি আগ্রহ সহকারে পান করিল। সে অন্যান্য দিন যেমন স্বচ্ছন্দে আহার বিহার প্রভৃতি করিত, সুরাপান নিবন্ধন নেসায় অভিভূত হইয়া, সেদিন সেরূপ করিতে পারিল না।

পরদিন যখন তিনি সুরাপান করিতে যান, ছাগলটি তাঁহার সঙ্গে গেল। কিন্তু অন্যান্য দিনের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে দোকানের ভিতরে না গিয়া, কিঞ্চিৎ অন্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি বারংবার ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই দোকানের ভিতরে গেল না। অনন্তর তিনি নিজে পান করিয়া ছাগলকে পান করাইবার জন্য, কিঞ্চিৎ সুরা লইয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইবা মাত্র, সে কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তিনি অনেক চেষ্টা পাইলেন, কিছুতেই ছাগলকে সুরাপান করাইতে পারিলেন না।

এই ব্যাপার দর্শনে তাঁহার জ্ঞানের উদয় হইল। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, ছাগল একবার মাত্র সুরাপান করিয়া, সুরাপানে কত অসুখ ও কত অনিষ্ট হয়, তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, এবং তজ্জন্য এত পীড়াপীড়িতেও কোনও মতে আর সুরাপানে সম্মত হইতেছে না। আমি সুরাপানের দোষ বুঝিতে পারিয়াছি, অথচ সুরাপানে ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না। অতএব বুদ্ধি ও বিবেচনা বিষয়ে আমি পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট। পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া জীবনধারণ অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। কিয়ৎক্ষণ মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া, প্রাণান্ত ঘটে, তাহাও স্বীকার, তথাপি আর কদাচ সুরাপান করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, সেই দিন অবধি তিনি সুরাপান পরিত্যাগ করিলেন।*

ধূলি।

ধূলির মাহাত্ম্য বোধ করি তোমরা জান না। ধূলি তোমাদের কাছে একটা জঞ্জাল বলিয়াই পরিচিত। কেবল জিনিস পত্র ময়লা করে,—পরিচ্ছন্ন থাকিতে দেয় না। যখন রাস্তায় বাহির হইয়াছ, তখন হাওয়া দিলে, ধূলিতে নাক মুখ আচ্ছন্ন

* "সাহিত্য" পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় তাঁহার মাতামহ পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কতকগুলি অপ্রকাশিত রচনা সখায় প্রকাশার্থ দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। আমরা সেগুলি পাঠকপাঠিকাদিগকে ক্রমশঃ উপহার দিব। স-স।

করিয়া বিব্রত ও বিরক্ত করিয়া তুলে। ধূলির জ্বালায় সহরের রাস্তায় গ্রীষ্মকালে বাহির হওয়া সময়ে সময়ে দুর্ঘট হইয়া পড়ে। এমন কি বড় বড় সহর মাত্রে এই ধূলির উৎপাত হইতে কথঞ্চিৎ অব্যাহতি পাইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণকে অর্থ ব্যয় ও প্রয়াস স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ধূলি কেবল উৎপাত মাত্র নহে। অনেক বড় বড় কাণ্ড ধূলি দ্বারা সম্পাদিত হয়।

তোমাদের হয় ত ধারণা আছে, রাস্তার ও ময়লা জায়গাতেই কেবল ধূলি বর্ত্তমান। সে ধারণাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে। আমাদের বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণা সর্ব্বদা বর্ত্তমান। যে বায়ুরাশি পৃথিবীকে আচ্ছাদন করিয়া আছে, তাহাকেই বায়ুমণ্ডল বলিতেছি। বায়ুমণ্ডলের কুত্রাপি এমন নির্ম্মল অংশ দেখা যায় নাই, যেখানে ধূলি বর্ত্তমান নাই। কেবল যে ঝড় বাতাসের সময় বায়ু ধূলিপূর্ণ হয়, তাহা নহে। বায়ু যতই নির্ম্মল, যতই পরিচ্ছন্ন দেখাক্ না কেন, উহাতে নিয়ত ধূলিকণা বর্ত্তমান রহিয়াছে। সহর ও গ্রামের ভিতরের বায়ুর ত কথাই নাই, বিজন প্রান্তরে, বনে, সমুদ্রের উপর, উচু পাহাড়ের উপর, সর্ব্বত্রই ধূলি বর্ত্তমান। বেলুনে চড়িয়া খুব উর্দ্ধে আরোহণ করিলে সেখানকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নির্ম্মল বায়ু মধ্যেও ধূলির অস্তিত্ব দেখা যায়। তবে সকল জায়গায় ধূলির পরিমাণ সমান নহে। সহরে, মনুষ্য-বসতির নিকট, কলকারখানার কাছে, বায়ু ধূলিতে অত্যন্ত দূষিত থাকে। পাহাড়ের উপর, সমুদ্রের উপর, জনশূন্য স্থানে বায়ু অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল।

কুঠারীর ভিতর বায়ু সচরাচর বেশ নির্ম্মল দেখায়। জানালা বন্ধ থাকিলে সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া যদি সূর্য্যরশ্মি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তখন বেশ দেখা যায় রশ্মিপথে অসংখ্য ধূলিকণা ভাসিতেছে। সহজ অবস্থায় ইহাদিগকে দেখা যায় না। ঘরের মধ্যে চারিদিক আঁধার থাকিলে সূর্য্যরশ্মিতে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দীপ্তিলাভ করিয়া থাকে, তখনই তাহারা দৃষ্টিগোচর হয়। দেখিয়া থাকিবে, সেই সময় সেই আলোক-রেখার নিকট একখানা বহি কিংবা কাপড় নাড়া দিলে, এমন কি হাত নাড়া অথবা তুড়ি দিলেও ধূলিকণার সংখ্যা বাড়িয়া উঠে, এবং ধূলিকণাগুলি বেগে ইতস্ততঃ ধাবমান হয়। এইরূপ অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণা প্রায় সর্ব্বত্র বায়ুতে ভাসিতেছে। সহজ চোখে দৃষ্টির অগোচর থাকে। সহজে আমরা ইহাদের অস্তিত্ব গ্রাহ্য করি না। কিন্তু বলিতে কি, অনেক সময় আমাদের জীবন মরণ এই ধূলিকণার হাতে।

এখন এই ধূলির শক্তি ও গুণ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। অবশ্য সকল কথা তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিব না। কেন না, অনেক যত্ন, পরিশ্রম ও যুক্তি দ্বারা সম্প্রতি এই সকল সত্য বাহির হইয়াছে। সেই সকল যুক্তি তোমরা বুঝিতে পারিবে না। তবে আবিষ্কৃত ফল দুই একটা শুনিয়া বিস্মিত হইবে। জানিতে পারিবে ধূলিকণাটিও তাচ্ছল্যের সামগ্রী নহে।

প্রথম,—আকাশ নীলবর্ণ দেখায় কেন? আকাশ ত শূন্য, সেখানে কিছুই নাই। পৃথিবীর পৃষ্ঠের উপর কিছুদূর পর্য্যন্ত বায়ু আছে; তাহার উপর আর কিছুই নাই। কিন্তু বায়ু ত একেবারে বর্ণহীন! সুতরাং আকাশ যদি কিছুই নহে, তবে নীলবর্ণ দেখায় কেন? বায়ুরাশিতে ভাসমান ধূলিকণা এই নীলবর্ণের অনেকটা কারণ, তাহা সম্প্রতি নির্ণীত হইয়াছে।

দ্বিতীয় কথা,—প্রদীপের শিখা মাত্রই প্রায় পীতবর্ণ। যেখানেই প্রদীপ জ্বালান যায়, দীপশিখা ঘোরাল পীতবর্ণ ধারণ করে। ইহার কারণ

কি? এক একটা জিনিষের এক একটা বিশেষ রকম রঙ্ উৎপাদনের ক্ষমতা আছে। দ্রব্য বিশেষ পোড়াইয়া লাল আলো, সবুজ আলো উৎপাদন করা যায় বোধ হয়, সকলেই জান। আমরা যে লবণ খাই, সেই লবণে এমন একটা জিনিষ আছে, তাহাতে পীতবর্ণ উৎপাদন করে। প্রদীপের শিখায় একটু নুন গুঁড়া করিয়া ধরিলে দেখিতে পাইবে, পীত-বর্ণ আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। সেই পদার্থটা একটা ধাতু, তাহার ইংরাজী নাম সোডিয়ম্। এই ধাতু ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের এই পীত বর্ণ জন্মাইবার ক্ষমতা নাই। বায়ুরাশিতে যে সকল ধূলিকণা থাকে, তাহার অনেকগুলিতে এই পদার্থ বর্ত্তমান আছে। বায়ুরাশিতে যেন সর্ব্বদাই লবণের কণা ভাসিতেছে। প্রদীপ জ্বালিলে সেই লবণকণা শিখার সংস্পর্শে থাকিয়া শিখাকে পীতাভ করিয়া দেয়।

তৃতীয় কথা,—বায়ুতে যে সকল ধূলিকণা ভাসে, তাহাদের মধ্যে অনেকই সজীব কীটাণু অথবা উদ্ভিদণু। তাহাদের জীবন আছে। এই কথাটা বড়ই আশ্চর্য্য, কিন্তু কথাটা সত্য। তালের রস, খেজুরের রস কিছুক্ষণ রৌদ্রের উত্তাপে রাখিলে তাহা হইতে ফেনা উঠিতে থাকে; এবং তাহার মাদকগুণ জন্মে। ঐ রস হইতে মদ তৈয়ার হয়। এই কার্য্যটি এই সকল ধূলিকণা দ্বারা সম্পাদিত হয়। তাল-রস ও খেজুর-রসে চিনি আছে। বায়ু-স্থিত সজীব ধূলিকণা রসে পতিত হইয়া ঐ চিনি খাইতে আরম্ভ করে। চিনি খায়, আর তাহাদের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। দু দশটা ধূলিকণা হইতে অল্পক্ষণে দু লাক, দশ লাক, জীবন্ত ধূলিকণার উৎ-পত্তি হয়। চিনির কতক অংশ তাহারা খাইয়া ফেলে; যেটুকু থাকে, তাহা মদ্যে পরিণত হয়। এই জীবাণু ব্যতিরেকে চিনি সুরায় পরিণত হয় না।

চতুর্থ কথা,—জীব জন্তু মরিয়া গেলে কিছুক্ষণ পরে তাহাদের শরীর পচিতে আরম্ভ হয়। ইহাও এই সকল জীবন্ত ধূলি-কণার কাজ। জীবনহীন দেহ পাইলেই এই সব কীটাণু সেই দেহে বসতি আরম্ভ করে। খায় আর বাড়ে; দুই দশটা হইতে কিয়ৎ-ক্ষণে সংখ্যায় অগণ্য হইয়া পড়ে। তাহারা দলে ও সংখ্যায় পুষ্টি লাভ করে; আর সেই জীবনহীন দেহটা ক্রমশঃ বিকৃত, ক্ষীণ হইয়া শেষে লোপ পায়। তাহা হইতে নানাবিধ বাষ্প ও বায়বীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়া বায়ুতে মিশে। জীবদেহ পচিবার কারণ ও প্রণালী এই।

পঞ্চম কথা,—উপরে বলিলাম, বায়ুস্থিত ধূলি-কণার মধ্যে অনেকে জীবন্ত, এবং তাহারা মৃত দেহ খাইয়া পুষ্টি লাভ করে। কিন্তু অনেকে আবার এমন আছে, তাহারা সজীব ও সুস্থ জীব জন্তুকেও আক্রমণ করিতে ছাড়ে না। তাহারা বড় নিরীহ নহে, এমন কি মানুষের তেমন শত্রু আর নাই। ইহারা কোনও রূপে জীবন্ত জীবদেহে প্রবেশ লাভ করিলে, রক্ত মাংস মজ্জা প্রভৃতি হইতে আপন খাদ্য সংগ্রহ করে; এবং সেইখানে তাহারা দলে বলে সংখ্যায় পুষ্টি লাভ করিয়া নানাবিধ ব্যাধির উৎপত্তি করে। মনে করিও না ইহারা বড় বড় কীট—রোগীর শরীরের মধ্যে সহজেই দেখা যায়। ভাল অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা বিশেষ যত্ন ও আয়াস না করিলে ইহারা দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু শরীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিলে, ও সেখানে ইহাদের গোষ্ঠী বংশ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে, মানুষ সহজে নিস্তার পায় না।

মানুষের বড় বড় ব্যাধি এই সকল জীবন্ত ধূলিকণার দ্বারা উৎপাদিত হয়। ইহাদের আবার ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে। কেহ জ্বর উৎপাদন করে, কেহ হাম উৎপাদন করে, কেহ বা ধনুষ্টঙ্কার, কেহ বসন্ত, কেহ যক্ষ্মা, কেহ ওলাউঠা ইত্যাদি জন্মায়।

ক্রমেই প্রকাশ পাইতেছে, মানুষের বড় বড় মারাত্মক ব্যাধি অনেকই এই সকল কীটাণু হইতে উদ্ভূত। কোন না কোন উপায়ে ইহারা শরীরে প্রবেশ লাভ করিয়া শরীরের রক্ত মাংস প্রভৃতিকে বিকৃত ও বিষাক্ত করিয়া তুলে। সাপ বাঘ হইতে মানুষের যে অনিষ্ট না হয়, ইহাদের হইতে তাহা অপেক্ষা অনেকগুণ অধিক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। বিশেষ ভাবনার কথা এই, ইহারা দৃষ্টির অগোচর; কোথা আছে কোথা নাই সহজে জানা যায় না; অজ্ঞাতসারে শরীরে প্রবেশ করিয়া সুস্থ ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিরও প্রাণসংহার করে।

এই সকল জীবাণু সকলেই যে বায়ুতে থাকে তাহা নয়। অনেকে জলে থাকে। জল ও বায়ু আমাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন। অতি নির্ম্মল জল ও বায়ুতেও এই সকল প্রাণসংহারক ধূলিকণা বর্ত্তমান থাকিতে পারে। ইহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া বড়ই কঠিন। শুধু মানুষ কেন, ইতর পশু পক্ষী প্রভৃতিকেও ইহারা আক্রমণ করিয়া তাহাদের শরীরে বিশেষ বিশেষ ব্যাধির উৎপাদন করে।

(ক্রমশঃ।)

অর্থ-তৃষ্ণা।

একটি গল্প।

অ বহু দিনের, বহু সহস্র বৎসরের কথা;—বোধ হয় তখন সত্যযুগ ছিল। তখন দেবতারা পৃথিবীতে বেড়াইতে আসিতেন এবং মানবের ভ্রম-প্রমাদ দেখিলে তাহাদিগকে সদুপদেশ দিয়া সৎপথে আনিতেন।

সুবর্ণবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। তৎকালে পৃথিবীতে তাঁহার ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী আর কোনও রাজা ছিলেন না। বড় বড় রাজাদের যাহা থাকে—হাতী ঘোড়া, ধন দৌলৎ, বাড়ী গাড়ী কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না। কিন্তু এত থাকিতেও তিনি অসন্তুষ্ট। জগতে একটি জিনিসের প্রতি তাঁহার কিছু অধিক মাত্রায় লোভ ছিল; কিন্তু বিধি-বিড়ম্বনায় ঐ জিনিসটি তত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে, অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছানুরূপ পাওয়া যাইত না।

জিনিসটি কি, বোধ করি তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না। ইহা সোণা। কাঁচা হরিদ্রার ন্যায় উজ্জ্বল পীতকান্তি সুবর্ণ দেখিলে তাঁহার চক্ষু পরিতৃপ্ত হইত, অন্তরাত্মা শীতল হইত। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি অন্ন পাইলে, পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি সুশীতল জল পাইলে, পুত্রহীনা জননী পুত্রলাভ করিলে যতদূর সুখী হয়, সামান্য একটু স্বর্ণরেণু লাভ করিলে মহাবলপরাক্রান্ত কুবের সম বিভবশালী সুবর্ণবাহু তদপেক্ষা অধিক সুখী হইতেন। সুতরাং তিনি এক মনে কেবল সুবর্ণ-সংগ্রহেই ব্যস্ত ছিলেন। ভাণ্ডারে অন্য ধাতুর স্থান ছিল না। স্বর্ণরেণু, স্বর্ণখণ্ড, স্বর্ণমুদ্রা প্রভৃতি স্বর্ণ-পাত্রে স্বর্ণসিন্দুকে আবদ্ধ থাকিত। তিনি অবকাশ পাইলেই একাকী তথায় গমন করিয়া অতৃপ্তনয়নে তাহা দেখিতেন, এবং কেন বিধাতা মৃত্তিকা, বালুকা, তাম্র, লৌহ প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ সৃষ্টি না করিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড হিরণ্ময় করেন নাই, এইজন্য মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে তাঁহার নিন্দাবাদ করিতেন।

একদিন সুবর্ণবাহু এই অবস্থায় ভাণ্ডার খুলিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ বায়ুবেগে পশ্চিমদিকের জানালাটা কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত হইল। তখন অপরাহ্ণ হইয়াছিল। অস্তগমনোন্মুখ সান্ধ্য-সূর্য্য অনতিতপ্ত কিরণমালায় বৃক্ষাগ্র সকল সুবর্ণ-

মণ্ডিত করিতেছিলেন। সেই লাবণ্যময় রশ্মিজাল উন্মুক্ত গবাক্ষদ্বার দিয়া সুবর্ণবাহুর সুবর্ণরাশির উপর নিপতিত হইয়া তাহার স্বাভাবিক লাবণ্য-চ্ছটা যেন অকস্মাৎ সহস্র গুণে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এক দিব্য-লাবণ্য-পরিশোভিত তেজস্বী মূর্ত্তি সুবর্ণবাহুর সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন।

সুবর্ণবাহু চমকিয়া উঠিলেন। গবাক্ষদ্বার দিয়া জনপ্রাণীর প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং প্রথমে ভাবিলেন যে তাঁহার দৃষ্টিভ্রম হইয়াছে। দুই একবার চক্ষু নিমীলিত করিলেন, দুই এক বার চক্ষু রগড়াইলেন, তথাপি সেই মূর্ত্তি পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান। সুবর্ণবাহুর অবস্থা দেখিয়া তিনি ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, তুমি এত ধনের অধিকারী হইয়াও নিয়ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছ। যদি আপত্তি না থাকে, বল, কি করিলে তোমার তৃপ্তি জন্মিতে পারে। আমি ধনাধিপতি কুবেরের অনুচর। যদি আমা দ্বারা তোমার কোন উপকার হইতে পারে, তাহা হইলে, সন্তুষ্ট চিত্তে তাহা সম্পাদন করিব।"

সুবর্ণবাহু ভাবিলেন যে এত দিন পরে তাঁহার কপাল ফিরিয়াছে। এক্ষণে দেবতারা নিশ্চয় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আশানুরূপ স্বর্ণরাশি প্রদান করিয়া সুখী করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। এইরূপ ভাবিয়া তিনি অতি বিনীতভাবে বলিলেন,—"ভগবন্ আমি আজন্ম সুবর্ণসংগ্রহের নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছি; এই উদ্দেশ্যে ভোগবিলাস, দয়াধর্ম্ম, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছি; কিন্তু হায়, এত করিয়াও আশানুরূপ স্বর্ণ লাভ করিতে পারি নাই। বলিতে কি, ইহাই আমার অসন্তোষের একমাত্র কারণ। নচেৎ দেবতারা আমাকে অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ অনুগ্রহই দেখাইয়াছেন। আমার রাজ্য বহুদূরব্যাপী, প্রজাগণ আজ্ঞাবহ ও অনুরক্ত; একটি কন্যাসন্তান জন্মিয়াছে, সে সুশীলা, সুরূপা, স্নেহের পুত্তলিকা। ফলতঃ এক সুবর্ণের অভাবেই আমার জীবন দুঃখময় হইয়াছে।"

তখন সেই দিব্যপুরুষ মুখমণ্ডল গম্ভীর করিয়া বলিলেন,—"ভাল, যদি সুবর্ণ পাইলেই তুমি সুখী হও, তাহা হইলে আমি তোমার সেই মনোরথ পূর্ণ করিতেছি। কল্য অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তোমার এই অপূর্ব্ব ক্ষমতা জন্মিবে যে তুমি যে বস্তু স্পর্শ করিবে, সেই বস্তুই তৎক্ষণাৎ হিরণ্ময় হইয়া যাইবে। আশা করি, অতঃপর তুমি ইচ্ছামত যে কোন বস্তুকে সুবর্ণে পরিণত করিয়া প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে পারিবে।" এই বলিয়া দিব্যপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন; সুবর্ণবাহুও সুপ্তোত্থিতের ন্যায়—"এ কি স্বপ্ন, না প্রকৃত কথা" এই ভাবিতে ভাবিতে ভাণ্ডারের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাসগৃহে ফিরিয়া গেলেন।

সে রাত্রিতে সুবর্ণবাহুর নিদ্রা হইল না। একবার ভাবিলেন, "এটা একটা ভূত বা প্রেত,—মিথ্যা কথা কহিয়া আমাকে প্রতারিত করিয়াছে"। আবার ভাবিলেন, "না, কথাবার্ত্তায়, আকার প্রকারে ইঁহাকে ত দেবতা বলিয়াই বোধ হইল। আমি ইঁহার কি অনিষ্ট করিয়াছি যে বৃথা আশা দিয়া ইনি আমার যন্ত্রণা বৃদ্ধি করিবেন? যাহা হউক, রাত্রি প্রভাত হইলেই প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিব।" কিন্তু সে রাত্রি যেন শীঘ্র ফুরাইতে চায় না; সুবর্ণবাহু ভাবিতে লাগিলেন, রাত্রিটা কি দীর্ঘ,—এখনও শেষ হইল না!

(ক্রমশঃ।)

গদাধরের পরীক্ষা।
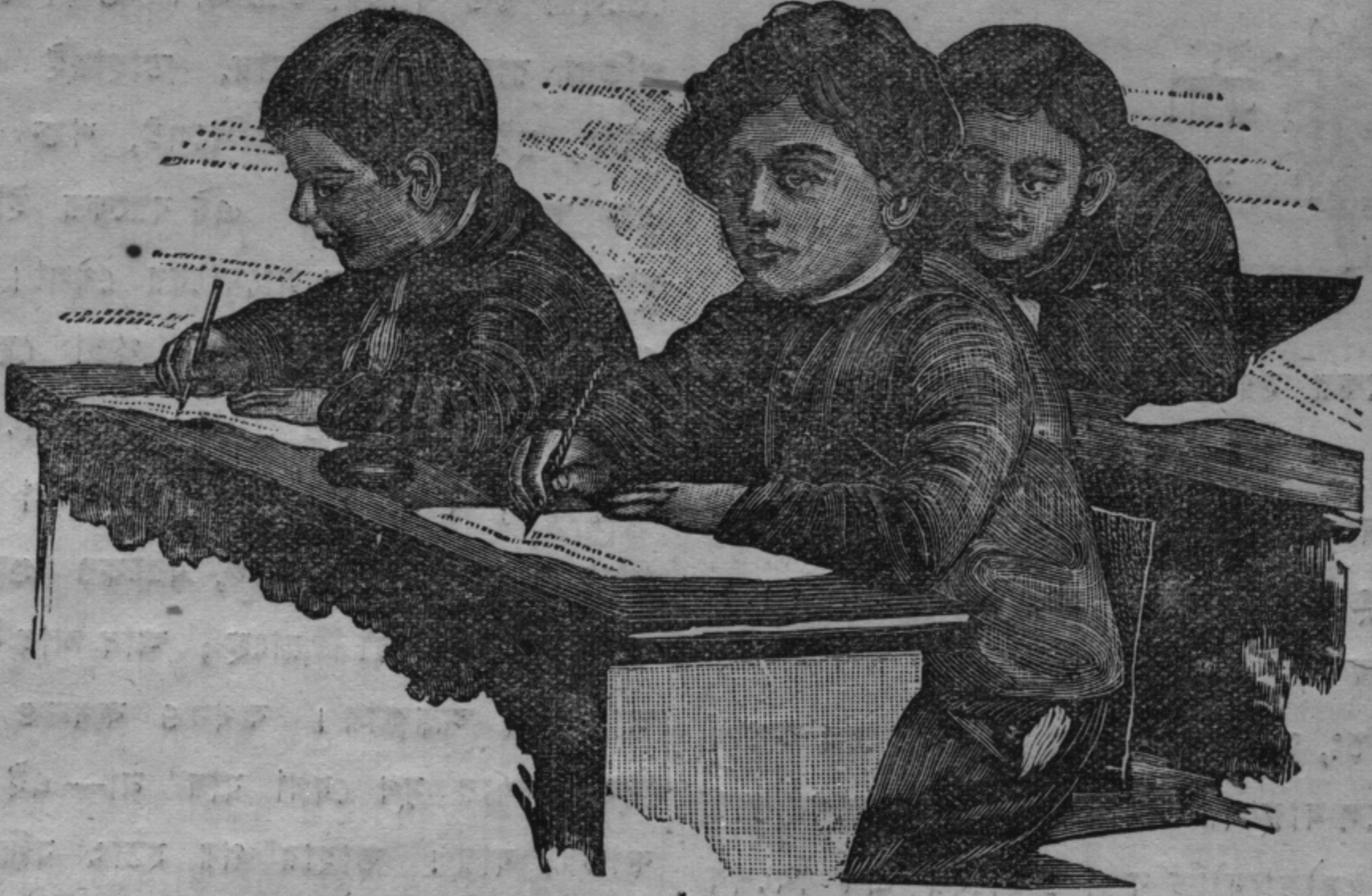
বিদ্যার মন্দিরে, বৎসর পরে আজি
বিদ্যার পরিচয় হয়,
লিখিতেছে, ভাবিতেছে, ভেবে ফের লিখিতেছে
ভাল ভাল ছেলে সমুদয়।
কাগজটি এই শাদা— এই আর শাদা নেই,
লেখায় লেখায় যায় ভরি,
সারাটি বছর সুখে খেলিয়াছে গদাধর,
ভাবিতেছে—"তাই ত কি করি!"
বিদ্যার মন্দিরে বৎসর পরে আজি
বিদ্যার পরিচয় হয়,
ভাল ভাল কত ছেলে ভাল ভাল লিখিতেছে,
তবু যেন মনে মনে ভয়।
খুব ভাল লিখিয়াও মনে ভাবে কিসে লেখা
সকলের চেয়ে ভাল করি,
গদাধর ভাবে শুধু শিক্ষক মহাশয়
একবার যান যদি সরি'।

বিদ্যার মন্দিরে, বৎসর পরে আজি
বিদ্যার পরিচয় হয়,
লিখিতেছে, ভাবিতেছে, ভেবে ফের লিখিতেছে
ভাল ভাল ছেলে সমুদয়।
একমনে রামলাল বসে' বসে' লিখিতেছে,
লিখে লিখে ভাবিতেছে হরি,
শিক্ষক নাই তাই গদাধর দেখে লয়
উকি মেরে—আ মরি মরি।
বিদ্যার মন্দিরে বৎসর পরে আজি
বিদ্যার পরিচয় হয়,
এখনও যে শিক্ষক নাই হেথা,—গদাধর
অনায়াসে দেখে দেখে লয়।
হেন কালে শিক্ষক ফিরিলেন,—দেখিলেন
গদাধর লয় কাপি করি,
কথাটি না কহিয়া বাহিরে পাঠাইলেন,
দুই হাতে দুটি কাণ ধরি!

বিলাতের কথা।

আমরা অনেকেই কলিকাতার রাস্তায় ও গড়ের মাঠে সাহেবদের ছেলে মেয়ে দেখিয়াছ। তাহাদের বিষয় জানিতে তোমাদের অনেকের হয় ত ইচ্ছা হয়। আমি এ দেশের সাহেবদের ছেলেদের কথা কিছুই জানি না, কিন্তু বিলাতে অনেক ছোট ছোট ছেলে মেয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুতা আছে। তাহাদের কথা তোমাদিগকে কিছু বলিব।

প্রথমতঃ, তাহাদের খেলা ও আমোদের কথা। কারণ ছেলে মানুষের তাহাই আগে। এদেশের ন্যায় সেখানেও দৌড়াদৌড়ি করা তাহাদের এক বিশেষ কাজ। লণ্ডনে ও অন্যান্য জায়গায়, প্রত্যেক ভদ্রলোকের বাটীতে এক একটী ছোট রকমের বাগান থাকে। কিন্তু সে দেশে এত শীত যে শীতকালে অধিকাংশ ফুলের গাছই মরিয়া যায়, তথাপি সেটি বাগান। জায়গার দাম এত বেশি যে অধিকাংশ লোকেই হাত দশ বারর বেশি জায়গা পান না। শীতকালে তাহারই মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করা, ছোট ভাই বোনদের টানা-গাড়ী করিয়া টানা, ব্যাট্ ও বল নিয়ে খেলা ও গ্রীষ্মকালে ফুলগাছে জল দেওয়ায় ছেলে মেয়েদের বড়ই আমোদ। শীতকালে যখন রাস্তা ও পুকুরে বরফ জমিয়া যায়, তখন রাস্তায় ও পুকুরে 'স্লাইড্' 'স্নো-বল্' খেলিয়া শরীর গরম রাখিতে হয়। স্লাইড্ করিতে শিখিতে হয়। অর্থাৎ রাস্তায় কি পুকুরে বরফের উপর দিয়া পা ঘস্ড়িয়া যাইতে হয়। ঠিক যাইতে পারিলেই বেশ খেলা হইল। নচেৎ ধুপ্ করিয়া পড়িয়া যাইতে হয়। মেয়েদের পক্ষে প্রায় এ খেলায় সুবিধা হয় না, কিন্তু হাজার পড়িলেও ছেলেদের ভ্রূক্ষেপ নাই। তাহার পর 'স্নো-বল্'। এটা ছোট ছোট ছেলেরা তত পারিয়া উঠে না। গুঁড়া গুঁড়া বরফ পড়িয়া রাস্তা ভরিয়া যায়, তাহারই খানিকটা লইয়া, দুই হাত দিয়া চাপিলেই, শক্ত ইটপানা এক তাল হইয়া যায়। এই বরফের ইট ছোড়াছুড়ি করা এক বিষম আমোদের খেলা। তোমাদের মধ্যে অনেকেই বরফ পড়া দেখ নাই। সে দৃশ্য দেখিতে অতি সুন্দর। যে দিকে চাও, গাছপালা, ঘর বাটী, সব শাদা হইয়া গিয়াছে; গাছে পাতা ফল কিছু নাই, বরফের গুড়ায় ডাল পালা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; আধ আধ কোয়াসা, আধ আধ অন্ধকার। কখনও কখনও দশ বার দিন সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না—এই রকমেই কাটিয়া যায়। তাহার পর হঠাৎ যদি একদিন সূর্য্যের আলো পাওয়া যায়, তখন দৃশ্যটি আরও চমৎকার। কিন্তু যে দিন বেশি বরফ পড়ে, কিম্বা এত বেশি কোয়াসা হয় যে রাস্তা দেখিতে পাওয়া যায় না, সে দিন আর বাড়ী হইতে বাহির হইবার যো থাকে না। সে দিন Nurseryতেই (বালক-বালিকাদের জন্য যে স্বতন্ত্র ঘর থাকে) সমস্ত দিনরাত আলো জ্বালিয়া, ঘরে আগুনের চারি দিকে ঘেরিয়া বসিয়া বই পড়িয়া শুনান, কি শুনা, গল্প করা, অথবা চোক বাঁধিয়া খেলা, ইত্যাদি আমোদ প্রমোদ চলিতে থাকে।

খ্রিষ্ট্মাস্ অর্থাৎ বড় দিনের সময় এখানে ছেলেদের ভারি আমোদ। এক মাস দেড় মাস থাকিতে তাহাদের আমোদে ঘুম হয় না। আমার একটী বালক বন্ধু আছেন, তিনি কেবল মাস খানেক ধরিয়া খ্রিষ্ট্মাসের কথা নিয়েই ব্যস্ত; বলেন, "এ না করে' থাক্তে পারি না যে।" গড়ের